শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

বঙ্গানুবাদ

শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৫৬

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকা

যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগে বিজ্ঞান, বিশেষ ভাবে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মূল্য বড় করে চোখে পড়ছে। যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারে ও শান্তির সময় নাগরিকদের সুখ-সুবিধার বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগের সার্থকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের জীবনদর্শনকে যদি জ্ঞান ও প্রসারতা দ্বারা মণ্ডিত করতে হয়, তাহলে মানবিকতার দিকেও ঝোঁক দিতে হয়। মানবিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ককে মোটামুটি, উদ্দেশ্য ও তার সাধনোপায়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সাধনোপায় সম্বন্ধে অত্যুৎসাহে আমরা যেন উদ্দেশ্যকে ভুলে না যাই। ন্যায়ান্যায়ের ধারণা বিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে না, অথচ মানুষের কর্তব্য ও সুখ শেষ পর্যন্ত ঐ ধারণাগুলি সম্বন্ধে মনোভাব চর্চার উপরই নির্ভর করে। সুষম সংস্কৃতিতে এই দুই অংশের সামঞ্জস্য চাই। জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা পেতে ভগবদ্গীতা থেকে মূল্যবান সহায়তা পাওয়া যায়।

ভগবদ্গীতাব অনেক সংস্করণ আছে এবং কয়েকটি ভাল ভাল ইংরাজী অনুবাদও আছে, কাজেই ইংরাজী-জানা পাঠকের জন্য যদি শুধু অনুবাদই যথেষ্ট হত,তাহলে আর একটি অনুবাদের প্রয়োজনই হত না। গীতা মূল সংস্কৃতেই পড়া যাক বা ইংরাজী অনুবাদেই পড়া যাক, তার মর্মগ্রহণ করতে হলে টীকা প্রয়োজন। প্রাচীন ভাষ্যগুলি পড়লে ভাষ্যকারের ও সমসাময়িক ধারণা সে সম্বন্ধে কি ছিল তা বোঝা যায়। প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রেরই দুই অংশ থাকে, একটি অস্থায়ী ও নশ্বর—তাতে যে দেশ-কালে তা রচিত হয়েছে, তখনকার এবং সে-দেশের লোকেদের ধ্যান-ধারণা গ্রথিত হয়ে থাকে, আর অন্য অংশ সনাতন ও অবিনশ্বর এবং সর্ব দেশ-কালে প্রযোজ্য। বৌদ্ধিক প্রকাশ ও মনস্তাত্ত্বিক বাগ্ধারা কালবশ কিন্তু সর্বকালের মানুষ যদি শুধু বুদ্ধিকে আঁকড়ে না থেকে তার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রসারিত করতে পারে তা হলেই শাশ্বত সত্যগুলির আলোক নিজ জীবনে দেখতে ও ব্যবহার করতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে যে সত্যের ব্যাখ্যা আছে, তা যুগে যুগে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমর্থন বা সংশোধন করতে পারে বলেই তাদের সজীবতা। ধর্মশাস্ত্রের সুপ্রাচীন জ্ঞানের ব্যাখ্যাতারা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথাই বলেন এবং ব্যাখ্যায় শাস্ত্রের যে নূতন আকার দেন তা তাঁদের

সমসাময়িক যুগের প্রয়োজনভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক। যুগে যুগে পুনরাবৃত্ত সকল মহৎ মতবাদই যে-যুগে পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেই যুগের ধ্যান-ধারণার দ্বারা অলঙ্কৃত ও ভাষ্যকারের ব্যক্তিত্বের দ্বারা পুষ্ট। আমাদের কাল অন্যরকম। আমাদের চিন্তাধারা, যে মানস পশ্চাৎপটে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রক্ষিপ্ত হয়, তা প্রাচীন ভাষ্যকারদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না। আমাদের যুগের মূল সমস্যা মানবসমাজের মধ্যে হৃদ্যতা স্থাপন। এই উদ্দেশ্যে গীতার বিশেষ সার্থকতা আছে, কেননা এতে ধর্মীয় চেতনার নানা বিচিত্র ও আপাতবিসংবাদী আকারের সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ধর্মের যে মূল ধারণা প্রাচীনও নয় আধুনিকও নয়, নিত্য এবং যা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমস্ত মানুষজাতির একান্ত আপন তারই উপর প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে। ইতিহাস আমাদের সামনে সমস্যা তুলে ধরে এবং আমরা যখন পুরাতন তত্ত্বকে নূতন রূপে ব্যক্ত করি, তখন তা ইচ্ছা করে করি না, না করে উপায় নেই বলেই করতে হয়। এইরকম ভাবে শাশ্বত সত্যকে কালোপযোগী ভাষায় বর্ণনা করলে তবেই মানব-ধর্মশাস্ত্র মানব-সমাজে সজীব হয়ে ওঠে। এই দিক থেকে সাধারণ পরিচিতি ও টীকাগুলি ধীমান পাঠকের উপকারে আসতে পারে। গীতার খুঁটিনাটি ব্যাখ্যার মধ্যে এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে, যেখানে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমি আমার মন্তব্যে শুধু সেগুলির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি মাত্র, কেননা এই রচনা যে সাধারণ পাঠক নিজের আধ্যাত্মিক প্রতিবেশকে প্রসারিত করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়।

মূল বিষয়কে অনুবাদে যতখানি স্বচ্ছ করা যায়, অনুবাদের সার্থকতা ততখানিই। অনুবাদ সুপাঠ্য হওয়া চাই অথচ ভাসা-ভাসা হলে চলবে না, ভাষা আধুনিক হওয়া চাই অথচ মূলের ভাবের সঙ্গে সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু গীতার কোন অনুবাদেই মূলের প্রসাদগুণ ও মহিমা সম্পূর্ণ আনা সম্ভব নয়। ওর সঙ্গীত ও ভাষার যাদু অন্য মাধ্যমে ধরা খুব কঠিন। অনুবাদক চিন্তাকে ব্যক্ত করার জন্যই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ভাবকে সম্পূর্ণ প্রকট করতে অক্ষম। যে ভঙ্গীতে ঐ চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল পাঠকের মনে তার উদ্রেক করা বা দ্রষ্টার হর্ষোন্মাদ বা যে দৃশ্য দেখেছে তার ধারণা দেওয়া অসম্ভব। ভাষার মহিমা ও বর্ণনার তীব্রতা ইংরাজীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে আমি অপারগ একথা বুঝতে পেরেই আমি

মূল শ্লোক ইংরাজী বর্ণমালায় দিয়েছি, যাতে যাঁরা সংস্কৃত জানেন তাঁরা মূল সংস্কৃত পাঠ করে গীতার অর্থ পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না তাঁরা সার এডউইন আর্ণল্ডের সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ পড়ে এর মোটামুটি সঠিক ধারণা করতে পারেন। ঐ অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল এবং যাঁরা পণ্ডিতী সঠিকতা নিয়ে মাথা ঘামান না তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

আমি অধ্যাপক এম. হিরিয়ানার কাছে টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি দেখে দেওয়ার জন্য ও অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন এডগারটনের কাছে প্রুফ দেখার জন্য ও উভয়ের কাছেই মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য ঋণী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রশস্তি

হে অষ্টাদশাধ্যায়িনি, অদ্বৈতামৃতবর্ষিণি, ভবযন্ত্রণামুক্তিদায়িনি, মাতঃ ভগবতি ভগবদ্গীতে, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ তোমাকে অর্জুনের নিকট উপদেশরূপে প্রকাশ করেছেন, এবং প্রাচীন মহর্ষি ব্যাস তোমাকে মহাভারতের মধ্যে গ্রথিত করেছেন, আমি তোমাকে প্রণিধান করি।[১]

"এই বিখ্যাত গীতাশাস্ত্র সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম-সংগ্রহ। এর শিক্ষায় মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।"[২]

"ভগবদ্গীতাতে আমি যে সান্ত্বনা পাই, সারমন অন্ দি মাউণ্টেও সব সময় তা পাই না। হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যখন একটি আলোকরেখাও নজরে পড়ে না, তখন আমি ভগবদ্গীতাকে আশ্রয় করি। এখানে ওখানে এক-আধটা শ্লোক পড়তে পড়তেই দারুণ শোকাবহ ঘটনাসমূহের (আমার জীবন শোকঘন ঘটনা দ্বারা পূর্ণ) মধ্যেও আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এবং ঐসব ঘটনা যদি আমার মনে স্থায়ী ও দৃশ্য কোন ক্ষতচিহ্ন না রেখে থাকে, শুধু ভগবদ্গীতার উপদেশেই তা সম্ভব হয়েছে।" মোঃ কঃ গান্ধী, ইয়ং ইন্ডিয়া (১৯২৫) পৃঃ ১০৭৮-৭৯।

১। ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্।

২। "সমস্ত বেদার্থ সার সংগ্রহ ভূতম্.........
সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধিম্......।"
ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্যের ভূমিকা।

পরিচিতি

১। পুস্তকটির গুরুত্ব

(ভগবদ্গীতাকে দার্শনিক সন্দর্ভ না মনে করে ধর্মশাস্ত্র রূপে দেখাই সমীচীন।) এটি বিশেষ অধিকারী লোকদের বোধগম্য গুহ্য রচনা নয়, বরং যারা "বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল জগতে ঘুরে বেড়ায়" তাদেরও পথনির্দেশ করার জন্য জনপ্রিয় কাব্য। যারা ভগবদ্লোকে পৌঁছবার অন্তর্লীন রাস্তাটি খুঁজে বেড়াচ্ছে, এমন সকল সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রীদের অভিলাষই এর মধ্যে ভাষা পেয়েছে। উন্নতিকামী লোক যেখানে সংগ্রামান্তে জয়পরাজয়ের সম্মুখীন হয় সেখানেই আমরা বাস্তবকে সবচেয়ে গভীর ভাবে স্পর্শ করতে পাই। কোটি কোটি হিন্দু[1] শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মহান্ পুস্তকের মধ্যে সান্ত্বনা

১। গীতার প্রভাব প্রাচীনকালে চীন জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, পরে পাশ্চাত্ত্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান দুই পুস্তক, "মহাযান শ্রদ্ধোৎপত্তি" ও "সদ্ধর্মপুণ্ডরীক" গীতার উপদেশের কাছে গভীর ভাবে ঋণী। এও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, বহুদিন পর্যন্ত প্রচারকরূপে ভারতনিবাসী এবং "জার্মান প্রত্যয়ে"র সরকারী ব্যাখ্যাতা সংস্কৃত জার্মান পণ্ডিত জে. এইচ হোয়ের (Hauer) গীতাকে জার্মান প্রত্যয়ের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন। তিনি এর "তোতনাকে অবিনশ্বর" বলেছেন। তিনি বলেন, "এই বইখানি পড়ে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি তা সকল প্রকার ধর্মজীবনে ও সর্বকালে সার্থকভাবে প্রযোজ্য। শুধু তাই নয় ভারত জার্মান ধর্মীয় ইতিহাসের এক সর্বাপেক্ষা সার্থক অধ্যায়ের ধ্রুপদী বিবরণ এর মধ্যে আমরা পাই... ...এ ভারত-জার্মান ধর্মের মৌলিক লক্ষণগুলিরও সারমর্মের নির্দেশ দেয়। এখানে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে সে আমাদেরই ভাবের সগোত্র।" তিনি গীতার মর্মবাণী এইভাবে প্রকাশ করেছেন, "জীবনের রহস্য ভেদ করার জন্য আগ্রহী হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের কি কর্তব্য তাই নির্ধারণ করা, ও সেই মত কাজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, কর্মের মধ্য দিয়েই জীবন রহস্য আয়ত্তে আসবে।" (হিবার্ট জর্ণালের ১৯৪০ সালের এপ্রিল সংখ্যায় ৩৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। গীতার কর্ম সংক্রান্ত বাণী কিন্তু একটা জীবনদর্শনের উপরই স্থাপিত। এর নির্দেশ জীবনের অর্থ আগে জেনে পরে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। চিন্তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে ব্যবহারিক ব্যাপারে অন্ধ আনুগত্য গীতা কোথাও শেখায় নি। আধ্যাত্মিক দর্শন থেকেই এর কর্মপ্রবৃত্তি মার্গের উৎপত্তি, "ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত কর্মযোগ শাস্ত্র"। নীতিসঙ্গত কর্ম অবিবিক্ত অনুভূতি থেকেই উদ্ভূত। শঙ্করাচার্য বার বার বলেছেন যে গীতার আসল উদ্দেশ্য আমাদের মুক্তির পথ দেখানো, শুধু কর্মে প্রবৃত্ত করা নয়, "শোকমোহাদিসংসারকর্মনিবৃত্ত্যার্থং গীতাশাস্ত্রম্, ন প্রবর্তকম্।"

পেয়েছে। আধ্যাত্মিক ধর্মের যে মূল তত্ত্বগুলি কুপ্রমাণিত তথ্য, অবৈজ্ঞানিক মতবাদ বা বিধিবহির্ভূত খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাই এই মহান্ পুস্তকে নির্ভুল ও মর্মভেদী ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। যে প্রশস্ত ও গভীর জগৎকে যুদ্ধ ও বিপ্লব স্পর্শ করতে পারে না, বহুকালের পরাশক্তির ঐতিহ্যবাহিনী এই শাস্ত্র তার জ্ঞানের গভীরতায় এখনও পর্যন্ত সেই জগতের উপর আলোকসম্পাত করছে। আধ্যাত্মিক জীবনের নবীকরণের পক্ষে অতি শক্তিশালী উপাদান যোগায় বলে পৃথিবীর মহান্ ধর্মশাস্ত্রদের মধ্যে এর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

(গীতার উপদেশ কোন বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তি বা চিন্তাশীল গোষ্ঠীর ধারণাপ্রসূত অধিবিদ্যার পদ্ধতির আকারে প্রচারিত নয়। মানবসমাজের ধর্মজীবন থেকে যে পরম্পরার উৎপত্তি হয়েছে তাকেই এতে রূপ দেওয়া হয়েছে।) যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি একে ভাষা দিয়েছেন তিনি সত্যকে নানা দিক দিয়ে দেখেছেন এবং সত্যের পাবন শক্তিতে প্রত্যয় রাখেন। হিন্দুদের কোন বিশেষ সম্প্রদায় নয়, সমগ্র হিন্দুত্বের সারমর্ম এতে প্রতিফলিত হয়েছে, শুধু হিন্দুত্বই কেন, দেশকালনিরপেক্ষ সর্বব্যাপী ধর্ম,' যা বর্বরদের স্থূল বস্তুরতি থেকে আরম্ভ করে সাধুসন্তদের সৃষ্টিধর্মী অনুভূতির স্বীকৃতি পর্যন্ত ব্যাপ্ত, মানবাত্মা দ্বারা অধ্যুষিত সেই সমগ্র ক্ষেত্র, গীতার মধ্যে সুসমঞ্জস রূপে প্রকাশ পেয়েছে।[১] সভ্যতার বহিরঙ্গের সার্বিক স্বীকৃতি দ্বারা যে পৃথিবী বাস্তব দিক দিয়ে এক হয়ে উঠেছে তাকে রক্ষা করতে হলে মন ও আত্মার যে বোঝাপড়া একান্তভাবে প্রয়োজন—অস্তিত্বের অর্থ ও মূল্য, নিত্য-বস্তু সম্বন্ধে বোধ এবং যে উপায়ে যুক্তি ও নৈতিক সংজ্ঞা দ্বারা চরম রহস্যগুলির উপর আলোকপাত করা যায় সে সম্বন্ধে গীতায় যে সমস্ত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তাদের উপরেই তার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে।

অধ্যায়ের উপসংহার অনুযায়ী ভগবদ্‌গীতা একই সঙ্গে অধিবিদ্যা ও

১। অলডুস্ হাক্‌স্‌লীর কথাই ধরা যাক :—

"সনাতন দর্শনের যে সকল সার সংগ্রহ প্রণীত হয়েছে গীতা তার মধ্যে সব থেকে প্রাঞ্জল ও সার্বিক। এই জন্যই এর মূল্য শুধু হিন্দুদের কাছে বা ভারতীয়দের কাছেই নয়, সমগ্র মানবসমাজের কাছেই স্থায়ী। ভগবদ্‌গীতা বোধ হয় সনাতন দর্শনের সবচেয়ে সুসমঞ্জস আধ্যাত্মিক বিবৃতি।" স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টোফার ইশারউড কর্তৃক ভগবদ্‌গীতার মুখবন্ধ (১৯৪৫)।

নীতিশাস্ত্র, "ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র," সত্তা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এবং সত্তার সহিত মিলনের কলাবিদ্যা। আধ্যাত্মিক সত্য তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা কঠোর সাধনা দ্বারা নিজেদের তার জন্য প্রস্তুত করেছে। পরাজ্ঞান লাভ করতে হলে মনকে সর্বপ্রকার বিক্ষেপমুক্ত করতে হবে এবং হৃদয়কে সম্পূর্ণ ভাবে নির্মল করতে হবে।[১] আবার সত্যকে প্রত্যক্ষ করলে নব জীবন লাভ করা যায়। জীবনের ক্ষেত্র আত্মার ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্করহিত নয়। মানুষকে বাহিরের বাসনা ও অন্তরের গুণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করলে মানবজীবনের অখণ্ডতা ব্যাহত হয়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভগবানের রাজপুরুষ, তাঁরা সংসারকে স্পর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত কবেন এবং অন্যকে উদ্ধার করেন।[২] প্রায়োগিক ও তুরীয়; সত্তার এই দুই অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক নিবিড। গীতার প্রারম্ভে মানুষের কর্মের সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে। পরমাত্মায় লীন থেকেও কিভাবে জগতে কাজ করে যেতে পারি? এর যে উত্তর দেওয়া হয়েছে তা হিন্দুধর্মেরই ঐতিহ্যানুসারী, কিন্তু বলার মধ্যে তাকে আরও স্ফুটতর করা হয়েছে।

রচয়িতা গীতাকে উপনিষদ আখ্যা দিয়েছেন,[৩] কেননা উপনিষদ নামে বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্রাবলী থেকেই এর মূলভাব গ্রহণ করা হয়েছে। গীতায় যদিও আমরা সত্যের এক গভীর ও মর্মস্পর্শী রূপ দেখতে পাই এবং যদিও তা মানব মনকে নূতন নূতন পথ দেখিয়েছে, তবু এতে যে সকল সিদ্ধান্ত স্বীকৃতি পেয়েছে, তা প্রাচীন ঐতিহ্যেরই অংশ এবং গীতায় ব্যবহৃত ভাষায় সেই ঐতিহ্য গ্রথিত। রচনারযুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে যে সকল চিন্তা ও অনুভূতি বিকশিত হচ্ছিল তারই সার এর মধ্যে দানা বেঁধেছে ও গাঢ় হয়েছে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করে উপনিষদের "প্রজ্ঞা পুরাণী"র ভিত্তিতেই এক আধ্যাত্মিক বাণী বিকশিত হয়েছে।[৪]

১। জ্যোতিরাত্মনি নান্যত্র সমং তৎ সর্বজন্তুষু।
স্বয়ং চ শক্যতে দ্রষ্টুং সুসমাহিত চেতসা॥
ঈশ্বরের জ্যোতি আত্মায়ই বাস করে, অন্য কোথাও নয়। সকল প্রাণীর মধ্যেই তা সমভাবে বিতরিত, নিজের মনকে সমাহিত করলেই তা গোচর হয়।

২। চতুর্থ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

৩। অধ্যায় উপসংহার দ্রষ্টব্য "ভগবদগীতাসু উপনিষৎসু"।

৪। বৈষ্ণবীয় সম্প্রদায়ের এক সুপ্রচলিত শ্লোকে বলা হয়েছে যে উপনিষদের সারমর্মই

(গীতার রচনাকালে হিন্দুধর্মতন্ত্রের মধ্যে যে সকল মূল সূত্রের দ্বন্দ্ব চলছিল, তাদের এর মধ্যে একত্র করে এক সার্বিক সমন্বয় করা হয়েছে। তার সম্পূর্ণ রূপ মুক্ত ও প্রশস্ত, গূঢ় ও গভীর। বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড, উপনিষদের তুরীয় ব্রহ্মবাদ, ভাগবতের ঈশ্বরবাদ ও সুকুমার ভক্তি, সাংখ্যের দ্বৈতবাদ এবং যৌগিক ধ্যান, এই সমস্ত বিভিন্ন চিন্তাধারাকে গীতারচয়িতা মার্জিত করে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি হিন্দু জীবন ও মননের এই সমস্ত সজীব উপাদানের সুসম্বদ্ধ মিলন ঘটিয়েছেন। কোনটিকেই বর্জন না করে তাদের প্রত্যেকটির মর্মভেদ করে দেখিয়েছেন যে কিভাবে এই ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা একই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ।)

২। রচনাকাল ও পাঠভেদ

যে মহান্ আলোড়নের ফলে প্রথম দিকের উপনিষদগুলি রচিত হয়েছিল, ভগবদ্‌গীতার রচনাকাল তার পরের কিন্তু ষড়দর্শনের বিকাশ ও তাদের সূত্রাকারে গ্রন্থন কালের আগে। অপ্রচলিত শব্দসংগঠন ও আভ্যন্তরীণ উল্লেখসমূহ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে এর রচনা নিশ্চিত খৃষ্টপূর্ব যুগের। মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা বলা যায়। অবশ্য পরে গ্রন্থের মূল বচনে কিছু কিছু অদল বদল হয়ে থাকতে পারে।[১]

গীতা-রচয়িতার নাম আমরা জানি না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রায় সকল গ্রন্থের রচয়িতাই অনামা। প্রচলিত কাহিনীতে মহাভারতের গ্রন্থনা যিনি করেছেন, সেই ব্যাসদেবের উপরই গীতার রচনা আরোপ করা হয়ে থাকে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৩ থেকে ৪০ সংখ্যক পরিচ্ছেদই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়।

কৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে সাত শ' শ্লোক শোনানো সম্ভব নয় বলে অনেকে মনে করেন। তিনি হয়ত গুটিকতক বিশেষ নির্দেশ

গীতায় পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। উপনিষদকে গাভীর সঙ্গে তুলনা করে কৃষ্ণকে দোগ্ধা বলা হয়েছে, অর্জুনকে গোবৎস, জ্ঞানীদের পানকারী ও গীতামৃতকে ক্ষীর সদৃশ দুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

১। ভারতীয় দর্শন (রাধাকৃষ্ণন) প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২২-৫।

দিয়েছিলেন যেগুলিকে গ্রন্থনাকারী পরে বিস্তৃত করে এক প্রশস্ত রচনায় পর্যবসিত করেন। গার্বের মতে ভগবদ্গীতা গোড়ায় এক সাংখ্য যোগের গ্রন্থরূপে রচিত হয়েছিল, পরে কৃষ্ণ বাসুদেব ভক্তিতত্ত্ব তার সঙ্গে মিশে যায় এবং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন করে বৈদিক ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করা হয়। আদি রচনাকাল প্রায় খৃষ্টপূর্ব ২০০, এবং কোন বৈদান্তিক তার বর্তমান রূপ দেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। গার্বের মত সাধারণ ভাবে অগ্রাহ্য হয়েছে। হপ্‌কিন্‌সের মতে "এটি একটি পুরাতন বৈষ্ণব কাব্যের কৃষ্ণীয় রূপ, আবার বৈষ্ণব কাব্যটি পূর্বে একটি সম্প্রদায়নিরপেক্ষ রচনা ছিল, সম্ভবতঃ কোন অর্বাচীন উপনিষদ।"[১] হল্‌ৎস্‌মান গীতাকে সর্বেশ্বরবাদী কাব্যের বৈষ্ণব সংস্করণ বলে মনে করেন। কীথের ধারণা এটি প্রথমে শ্বেতাশ্বতর ধরনের একটি উপনিষদ ছিল পরে কৃষ্ণভক্তদের উপযোগী করে পরিবর্তিত করা হয়েছে। বার্ণেটের মতে রচয়িতার মনে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যধারা এলোমেলো ভাবে মিশে গিয়েছিল। রুডল্‌ফ অটো বিশ্বাস করেন যে প্রাথমিক গীতা একটি চমৎকার মহাকাব্যাংশ ছিল এবং তাতে বিশিষ্ট তত্ত্বের স্থান ছিল না। মোক্ষদায়িনী কোন তুরীয় মতবাদের নির্দেশ দেওয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল না, যে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করেন, অর্জুনকে তাঁর বিশেষ সেবায় নিয়োজিত হতে উৎসাহ দেওয়াই তাঁর ইচ্ছা ছিল।[২] অটোর ধারণা সম্প্রদায়গত মতবাদগুলি প্রক্ষিপ্ত। এই ধারণায় জাকোবি তাঁর সঙ্গে একমত। তিনিও মনে করেন যে মূল রচনা পরবর্তী সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতদের দ্বারা বর্তমান আকারে প্রসারিত হয়েছে।

এই যে এতগুলি মতের উদ্ভব হয়েছে তার কারণ বোধ হয় এই যে গীতার মধ্যে বহু এবং বিচিত্র খাতে প্রবাহিত দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্মবাদের ধারা মিলিত হয়েছে। অনেক আপাতবিরোধী প্রত্যয়কে কালোপযোগী করে সরল ঐক্যসাধন করা হয়েছে। সমস্ত ধর্মীয় প্রত্যয়ের উপরই ঈশ্বরের প্রসাদ

১। ভারতের ধর্মসমূহ (Religion of India ১৯০৮) পৃঃ ৩৮৯। কার্কোয়ের লিখছেন "এটি একটি পুরানো কবিতার উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতরের পরের রচনা ও খৃষ্টজন্মের পরে কৃষ্ণভক্তদের স্বার্থে কোন কবির দ্বারা বর্তমান আকারে গ্রথিত।" ভারতীয় ধর্মসাহিত্যের রূপরেখা (Outlines of the religions of literature of India, 1920) ১৫ বিভাগ।

২। মৌলিক গীতা (The original Gita, ইংরাজী অনুবাদ ১৯৩৯) পৃঃ ১২-১৪।

আছে, এই বিশুদ্ধ হিন্দু ধারণার উপর তার ভিত্তি। বিভিন্ন চিন্তাপ্রবণতাকে গীতা সত্যসত্যই সমন্বয়ে আনতে পেরেছে কিনা, তা প্রত্যেক পাঠককে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করে নিজেকেই স্থির করতে হবে। ভারতীয় সাধক পরম্পরা বরাবরই অনুভব করে এসেছেন যে রচয়িতার মনে আপাত অসমঞ্জস মতগুলি ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে এবং তিনি যে চমৎকার সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং যার উপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করেছেন তা সত্যকার পারমার্থিক জীবনের সহায়ক, যদিও তিনি ঐ সামঞ্জস্যের সমস্ত খুঁটিনাটি অঙ্গ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নি।

শঙ্করভাষ্য এই কাব্যের প্রচলিত ভাষ্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম, এবং তিনি ভাষ্য সংকলনে যে পাঠ অনুসরণ করেছেন, তাকেই গ্রহণ করলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।[১]

৩। মুখ্য ভাষ্যকারগণ

গীতা বহু প্রাচীনকাল থেকেই নিষ্ঠাবান হিন্দুদের কাছে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে সমান ভাবে প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র বলে আদৃত হয়ে আসছে এবং এই তিন শাস্ত্রকে একত্রে প্রস্থান-ত্রয় বলা হয়। বেদান্তবাদীদের তাঁদের বিশেষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই তিন প্রামাণ্য শাস্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়েছে, কাজেই ঐ সকল শাস্ত্রের উপর ভাষ্য রচনা করে ঐ সকল শাস্ত্রের ভাষা কিভাবে তাঁদের বিশেষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে তাই দেখাতে চেয়েছেন। পরমব্রহ্মের প্রকৃতি ও জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে উপনিষদে নানাপ্রকার বিভিন্ন ইঙ্গিত আছে। ব্রহ্মসূত্র এত ভাবঘন ও অস্পষ্ট যে তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেদিক দিয়ে গীতার উপদেশ সুসঙ্গত, কাজেই ভাষ্যকারগণের পক্ষে তাকে নিজেদের বিশেষ মতবাদের সমর্থনে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া কঠিনতর হয়েছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে যাওয়ার পরে, হিন্দুধর্মের নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়, তার মধ্যে প্রধান অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। এই সকল সম্প্রদায়েব গুরুরা তাঁদের রচিত গীতার ভাষ্যে নিজ সম্প্রদায়ের

১। কাশ্মীর সংস্করণের পাঠে যে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাতে গীতার সাধারণ অর্থের তফাৎ হয় না। এফ. এ. শ্রাডের "ভগবদ্গীতার কাশ্মীর সংস্করণ (১৯৩০)" দ্রষ্টব্য।

মতবাদের সমর্থন করা যায় এবং অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদকে খণ্ডন করা যায় এমন ভাবেই গীঁতার ব্যাখ্যা করেছেন। এই সকল লেখকরা গীতার মধ্যে তাঁদের নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চিন্তা ও অধিবিদ্যার সমর্থনের প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছেন এই জন্য যে গীতার রচয়িতা নিজে এইরূপ আভাস দিয়েছেন যে নিত্যসত্যকে আমরা সবাই খুঁজি এবং যা থেকে বাকী সমস্ত সত্যের উৎপত্তি হয়েছে, তা কোন একমাত্র সূত্রে গ্রথিত করা যায় না। আবার ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও মনন দ্বারা আমরা ততখানিই সজীব সত্য ও আধ্যাত্মিক প্রভাব আয়ত্ত করতে পারি, পাওয়ার যতখানি যোগ্যতা আমাদের আছে।

যতগুলি ভাষ্য বর্তমানে প্রচলিত আছে তার মধ্যে শঙ্কর (৭৮৮-৮২০ খৃঃ) প্রণীত ভাষ্যই প্রাচীনতম। এর থেকেও প্রাচীনতর ভাষ্য ছিল, যে কথা শঙ্কর তাঁর ভাষ্যের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তারা আমাদের কালে লোপ পেয়েছে।[১] শঙ্কর জোর দিয়ে বলেছেন যে পরম সত্তা বা ব্রহ্মণ্ একমেবাদ্বিতীয়ং। সমগ্র প্রকট জগৎ ও তার বহুরূপতা, কোনটারই বাস্তব সত্তা নেই, অবিদ্যাগ্রস্ত লোকেদের কাছেই তা বাস্তব বলে মনে হয়। অবিদ্যার কবলে পড়েই আমাদের সকলের বন্ধন। সে দশা থেকে নিজের চেষ্টায় মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। কর্ম বৃথা, তাতে আমাদের আরও বেশী করে অনন্ত কার্যকারণ্ সম্বন্ধিত অবাস্তব জগৎসংসারে জড়িয়ে ফেলে। জ্ঞান দ্বারা সার্বিক সত্তা ও প্রাতিস্বিক সত্তাকে অভিন্ন বলে বুঝতে পারলে তবেই পরিত্রাণ্। এই জ্ঞানের উদয় হলে, অহম্ বিলুপ্ত হয়, বিক্ষেপের সমাপ্তি ঘটে এবং আমরা অবিমিশ্র আনন্দ দ্বারা ধন্য হই। সৎ (আছেন) শুধু এই ভাবেই ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। আর তিনি যখন সকল বিধেয়ের উর্ধ্বে এবং কর্তা, কর্ম আদি সকলপ্রকার জ্ঞানক্রিয়ার বৈশিষ্ট বর্জিত তখন তাঁকে কোন সগুণ ব্যক্তিরূপে বিবেচনা করা যায় না, কাজেই তাঁর প্রতি প্রেম বা ভক্তির প্রশ্ন ওঠে না।

(শঙ্করের মতে মনঃশুদ্ধির উপায় হিসাবে কর্ম অপরিহার্য হলেও প্রজ্ঞা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম খসে পড়ে।) জ্ঞান ও কর্ম আলোক ও অন্ধকারের

১। ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্যের টিকায় আনন্দগিরি (দ্বিতীয় সর্গ, ১০ম শ্লোক) বলেছেন, যে বৃত্তিকার ব্রহ্মসূত্রের এক বিরাট ভাষ্য রচনা করেছিলেন, তিনি গীতারও একটি বৃত্তি বা দীপ্তি লিখেছিলেন, তার সারমর্ম হল যে শুধু জ্ঞান বা শুধু কর্ম দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায় না, তাদের সম্মিলিত সাধনাতেই অভীষ্টলাভ হয়।

মত পরস্পরবিরোধী।[১] তিনি জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় মতকে অস্বীকার করেন।[২] তাঁর বিশ্বাস যারা অবিদ্যা ও কামনাগ্রস্ত শুধু তাদের জন্যই বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের বিধান।[৩] মোক্ষার্থীদের সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া বর্জন করা উচিত। শঙ্করের কাছে গীতার লক্ষ্য হল কার্যকারণ সম্বন্ধ জড়িত সকল প্রকার কর্মের ক্ষেত্র সংসারকে বিলোপ করা।[৪] যদিও তাঁর নিজ জীবন প্রজ্ঞালাভের পরও কর্মতৎপরতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শঙ্করের মতের আরও বিস্তার করেন আনন্দগিরি (সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে), শ্রীধর (১৪০০ খৃঃ) এবং মধুসূদন (ষোড়শ শতাব্দী) এবং আরও কয়েকজন। মারাঠী সন্ত তুকারাম ও জ্ঞানেশ্বর নিজেরা ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেও অধিবিদ্যায় শঙ্করের যুক্তি স্বীকার করেন।

রামানুজ (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) তাঁর ভাষ্যে জগতের অবাস্তবতাবাদ ও নিষ্কর্ম মার্গকে খণ্ডন করেছেন। গীতার্থসংগ্রহে যামুনাচার্য যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই তিনি গ্রহণ করেছেন। সর্বোচ্চ সত্তা ব্রহ্মভাব স্বরূপ কিন্তু সগুণ। তাঁর স্বজ্ঞান ও আত্মচেতনা আছে, জগৎ সৃষ্টি করায় এবং তাঁর সৃষ্ট জীবদের মোক্ষদানে সংজ্ঞাত সংকল্প আছে। তিনি সকল ভাবগত বিধেয়ের সমষ্টি, অনন্ত ও নিত্য, সমস্ত জগতের পূর্বে ও ঊর্ধ্বে, এবং অদ্বিতীয়। বৈদিক দেবতাদের তিনি তাঁর সেবকরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্ম করতে নিয়োজিত করেছেন। জগৎ মায়াও নয়, প্রবঞ্চনাও নয়, পরন্তু যথার্থ ও বাস্তব। দেহ ও আত্মা যেমন এক, জগৎ ও ঈশ্বরও তেমনি অভিন্ন। উভয় মিলে তারা সমগ্র, যদিও তাদের ভেদ অপরিবর্তনীয়। সৃষ্টির আগে, জগৎ অস্ফুট আকারে ছিল, বর্তমান ও বিচিত্ররূপে বিকশিত হয় নি। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তারা নাম ও রূপ পরিগ্রহ করেছে। জগৎকে

১। চতুর্থ, ৩৭ শ্লোক, চতুর্থ ৩৩ শ্লোক :

২। তস্মাদ্ গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ, ন কর্ম সমুচ্চিতাৎ (ভগবদ্‌গীতায় শঙ্করভাষ্যের দ্বিতীয় সর্গ ১১ শ্লোক)। যদিও কর্ম মোক্ষলাভের প্রত্যক্ষ কারণ নয়, তবু মোক্ষদায়ী জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উপায় কর্ম। শঙ্কর স্বীকার করেছেন "কর্মনিষ্ঠায়া জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বং ন স্বাতন্ত্র্যেন।"

৩। অবিদ্যা কামবত এব সর্বাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি।

৪। গীতাশাস্ত্রস্য প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সম্, সহেতুকস্য সংসারস্য অত্যন্তোপরমলক্ষণম্ (ভগবদ্‌গীতায় শঙ্করভাষ্যের মুখবন্ধ)।

ঈশ্বরের দেহরূপে প্রতিপন্ন করে এই আভাসই দেওয়া হয়েছে যে জগৎ কোন ভিন্ন প্রকৃতির অপর সত্তা নয়, ব্রহ্ম নিজের প্রকৃতিতেই তার সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর একই সঙ্গে জগতের সমবায়ী কারণ ও করণিক দেহ ও আত্মার উপমা থেকে এই বোঝায় যে দেহ যেমন আত্মার উপর একান্তনির্ভর তেমনি ঈশ্বরেই জগতের একান্ত অবলম্বন। জগৎ যে শুধু ঈশ্বরের দেহ তাই নয়, এ তাঁর অবশেষ—"ঈশ্বরস্য শেষ" এবং এই বাক্যাংশ জগতের সম্পূর্ণ অধীনতা ও নির্ভরতারই দ্যোতক।

সকল প্রকার চেতনা সম্বন্ধেই দুই পক্ষ অনুমান করতে হয়, এক যাঁর চেতনা তিনি এবং যে সম্বন্ধে চেতনা সেই বস্তু। কিন্তু রামানুজের চিৎ সংক্রান্ত ধারণা অন্যপ্রকার। তিনি তাকে নিঃসৃয়মাণ পরবশ বস্তু মনে করেন (ধর্মভূত দ্রব্য)। অহং (জীব) অবাস্তব নয় এবং তা মোক্ষ-লাভের সময় লয়প্রাপ্ত হয় না। উপনিষদের "তৎ ত্বম্ অসি" মানে "ঈশ্বর আমার নিজস্ব" যেমন আমার আত্মা আমার দেহের নিজস্ব। ঈশ্বর আত্মার ধারক ও নিয়ন্তাতত্ত্ব, যেমন আত্মা দেহের ধারকতত্ত্ব। ঈশ্বর ও আত্মা একই বস্তু, অভিন্নার্থে নয়, ঈশ্বর আত্মার অন্তর্বাসী ও অনুপ্রবিষ্ট বলে। তিনি অন্তর্যামীরূপে আত্মার গভীরে বাস করে তাকে পথ দেখান, তাই তিনি তার জীবনের সারসত্তা। কিন্তু অন্তর্লীনতা ও অভিন্নতা এক নয়। কালবশই হোক বা কালাতীতই হোক্, সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে স্বতন্ত্র থাকবে।

রামানুজের গীতাভাষ্যে এক ধরনের ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয়তার ক্রমবিকাশ দেখা যায়। মানবাত্মার গুহ্যঅংশে ঈশ্বরের বাস, কিন্তু সে অস্তিত্ব তার কাছে অজানা থেকে যায়, যতক্ষণ না জ্ঞানের আলোক তাকে চরম অজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করে। সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের সেবা করেই সে জ্ঞান আমরা অর্জন করতে পারি। দিব্যপ্রসাদ দ্বারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস সম্ভব। রামানুজ স্বীকার করেন যে গীতাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সবগুলিরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর মতে ভক্তির উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রামানুজ পাপের অসারতা, তীব্র দিব্যানুরক্তি, ঈশ্বরের সর্বজয়ী প্রেমে প্রত্যয় ও নির্ভরতাবোধ এবং দিব্য প্রসাদ দ্বারা বৈশিষ্ট্য লাভের অনুভূতি প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। (রামানুজের কাছে ব্রহ্মই বিষ্ণু। তিনিই একমাত্র পূজ্য, তাঁর দিব্য বিভূতির কোন অংশীদার নেই। বৈকুণ্ঠে ঈশ্বরের সঙ্গলাভ ও তাঁর সেবায় রত হওয়াই মোক্ষ।)

মধ্বের (১১৯৯-১২৭৬ খৃঃ) ভগবদ্‌গীতার উপর দুখানি রচনা আছে, গীতাভাষ্য ও গীতা-তাৎপর্য। তিনি গীতা থেকে দ্বৈতবাদদর্শন সমর্থক প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে পরমাত্মাকে এক ভাবে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা আর এক ভাবে পৃথক কল্পনা করা স্ববিরোধী। এই দুইকে চিরকালের জন্যই ভিন্ন বলে ভাবতে হবে এবং তাদের আংশিক বা পূর্ণ মিলন অসঙ্গত। "তৎ ত্বমসি" বাক্যাংশের তিনি এই ব্যাখ্যা দেন যে আমার ও তোমার এই পার্থক্য বোধ বর্জন করতে হবে এবং মনে করতে হবে সমস্তই ঈশ্বরাধীন।[১] মধ্বের মতে গীতাতে ভক্তিতত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

নিম্বার্ক (১১৬২ খৃঃ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে লিখেছেন ও তাঁর শিষ্য কেশবকাশ্মীরি তত্ত্বপ্রকাশিকা নামে গীতার এক ভাষ্য রচনা করেছেন। নিম্বার্কের মতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর পরস্পর থেকে ভিন্ন অথচ জীব ও জগতের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মের উপর ভক্তি নিম্বার্কের রচনাবলীর প্রধান প্রতিপাদ্য।

বল্লভ (১৪৭৯ খৃঃ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন। সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও মায়ার প্রভাবমুক্ত জীব ও পরম ব্রহ্ম অভিন্ন। অগ্নির যেমন স্ফুলিঙ্গ আত্মাও তেমনি পরমাত্মারই অংশ এবং মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্রহ্মকৃপা ছাড়া অর্জন করা যায় না। মোক্ষলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ঈশ্বর ভক্তি। ভক্তি প্রেম ও সত্যের সন্ধি।[২]

গীতার আরও কয়েকটি ভাষ্য আছে এবং সাম্প্রতিককালের প্রধান ভাষ্যকার বালগঙ্গাধর তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ। গীতা সম্বন্ধে গান্ধীর আবার নিজস্ব মতামত আছে।

ব্যাখ্যার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা থেকে উদ্ভূত। হিন্দু ঐতিহ্য এই যে বিভিন্ন মতগুলি পরস্পরের পরিপূরক। এমন কি ভারতীয় দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দর্শনেরই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পরবিরোধী নয়। ভাগবতে আছে যে ঋষিরা সার সত্যই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করেছেন।[৩] একটি প্রচলিত শ্লোক আছে "দেহের দিক

১। মদীয়ং ত্বদীয়মিতি ভেদমপহায় সর্বমীশ্বরাধীনমিতি স্থিতিঃ। ভাগবৎ তাৎপর্য।

২। প্রেমলক্ষণা শ্রদ্ধা। অমৃততরঙ্গিণী।

৩। ইতি নানা প্রসংখ্যানাং তত্ত্বানাং কবিভিঃ কৃতং।

থেকে আমি তোমার দাস, জীব বুদ্ধি থেকে আমি তোমার অংশ, আত্মার দিক থেকে আমি ও তুমি অভিন্ন, এই আমার বিশ্বাস[১] ঈশ্বরকে আমি বা তুমি রূপে দেখা চেতনার স্তরের উপর নির্ভর করে।

৪। চরম সত্তা

গীতায় অধিবিদ্যা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত আছে তার সমর্থনে কোন যুক্তি দেওয়া হয় নি। যে তর্কের ভাষা ও ভঙ্গী মানবজাতির বেশীর ভাগ লোকই বুঝতে অসমর্থ তার দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত উপলব্ধি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ তর্কদ্বন্দ্ব দিয়ে মনে স্থির বিশ্বাস জন্মানো যায় না। পরমাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে।

উপনিষদে এক ও অদ্বিতীয়, নির্গুণ ও নিরুপাধিক পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই ব্রহ্ম মানুষের অন্তরতম আত্মার সঙ্গে অভিন্ন। জ্ঞাত ও জ্ঞাতার মধ্যে যে দ্বিত্ব, তাকে যে সর্বাত্মক ঐক্য অতিক্রম করতে পারে তাকে ঘিরেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার স্থিতি। সেই অভিজ্ঞতাকে প্রচলিত ধারণাসমূহের ভাষায় বর্ণনা করার অক্ষমতার জন্যই শুদ্ধ ও সরল অভিন্নতা দিয়ে বর্ণনা দিতে হয়। সকল জটিলতাবর্জিত শুদ্ধ সারল্য ব্রহ্ম নিজেই স্বজ্ঞার বিষয় এবং সেই স্বজ্ঞায়ই তাঁর স্থিতি। তিনি শুদ্ধ প্রতিপাদ্য, তাঁর অস্তিত্ব বাহ্য বা বিষয়বস্তুর জগতে প্রক্ষেপ করা যায় না।

যথার্থভাবে বলতে গেলে ব্রহ্ম অবর্ণনীয়। কঠোর বাক্‌সংযম দ্বারাই আমাদের অপরিস্ফুট বর্ণনা এবং ত্রুটিপূর্ণ মান সকলের অপ্রতুলতা ব্যক্ত করতে পারি।[২] বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে "সবই যখন পরমাত্মায় পর্যবসিত

১। দেহবুদ্ধ্যা তু দাসোঽহম্ জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাঽহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
আনন্দগিরির শঙ্করদিগ্বিজয়ও দ্রষ্টব্য।

২। লাওৎসে বলেন "যে তাও এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় সে সত্যকার তাও নয়।" "নিরাকারের বাস্তবতা এবং যার আকার আছে তার অবাস্তবতা সকলেই জানে। যারা সিদ্ধির পথে অগ্রসর তারা এসব তর্ক গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, কিন্তু সাধারণ লোকে এই নিয়ে তর্কে রত হয়। সিদ্ধির অর্থই হল তর্কের অবসান, তর্ক মানেই অসিদ্ধি। প্রকট তাওয়ের বিষয়গত মূল্য কিছুই নেই, অতএব তর্কের থেকে নীরবতা ভাল। তাকে যখন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তখন কিছু না বলাই ভাল। একেই বলে মহাসিদ্ধি।" সুথিল (Soothile),

হয়েছে, তখন কার সম্বন্ধে আর কি দিয়েই বা চিন্তা করা যাবে? সার্বিক ...তাকে কি দিয়ে আমরা জানব?[১] বিতর্কমূলক চিন্তায় জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে যে দ্বিত্বের উদ্ভব হয় তাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। যিনি শাশ্বত তিনি এমন অসীম ভাবে সত্য যে তাঁকে আমরা এক বলতেও সাহস করি না, কেননা একত্বের ধারণাটাই ত জাগতিক অভিজ্ঞতা (ব্যবহার) প্রসূত। সেই জন্য তাঁকে আমরা অদ্বিতীয় বলি, অর্থাৎ অদ্বৈত, যাঁকে তখনই জানা যায় যখন সমস্ত দ্বিত্ব পরম অভিন্নতায় বিলুপ্ত হয়। উপনিষদকে তাই নঞর্থক ভাষার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সত্য ইহা নয়, (নেতি নেতি)[২] বিদেহী, অক্ষত, অপাপবিদ্ধ"[৩] "তমঃহীন, ছায়াহীন, বহিরন্তর ভেদ বর্জিত[৪]

"চীনের তিন ধর্ম" দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২৩) ৫৬-৭ পৃঃ। বুদ্ধকে সত্তার প্রকৃতি ও নির্বাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে, তিনি শান্ত নীরবতাকে আশ্রয় করেন। যীশুকে যখন পণ্টিয়াস পাইলেট সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তিনিও অনুরূপভাবে নীরব থাকেন।

প্লটিনাস বলেন, "কেউ যদি প্রকৃতির কাছে কৈফিয়ৎ চায় যে সে কেন উৎপাদন করে, তা হলে তার শোনার ও কথা বলার ইচ্ছা থাকলে তারই উত্তর দেবে। আমার বকা অভ্যাস নয় কাজেই আমি চুপ করে থাকি। সেই নীরবতার অর্থ যদি তুমি বুঝতে পেরে থাক ত তোমারও প্রশ্ন করা উচিত নয়।"

১। দ্বিতীয় ৪, ১২-১৪।

২। কুলার্ণব তন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্।

এই শ্লোকটির কোন কোন পাঠে "বিজানন্ত"র স্থানে "ন জানন্তি" আছে।

৩। ঈশ উপনিষদ, অষ্টম। পরম (তদেকম্) নির্গুণ ও নিরুপাধিক। "সৎও নয়, অসৎও নয়" ঋগ্বেদ, দশম, ১২৯। মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা চরম সত্তাকে শূন্য আখ্যা দেন, পাছে কোন সংজ্ঞা দিয়ে তাকে অনবধানতাবশতঃ সীমিত করে ফেলা হয়। তাঁদের কাছে তাঁকে তখনই জানা যাবে যখন সমস্ত দ্বন্দ্ব চরম অভিন্নতায় বিলুপ্ত হবে। দামাস্কাসের সন্ত জন বলেন, "ঈশ্বরের নিজ প্রকৃতি কি তা বলা অসম্ভব, বরং তাঁর কথা সঠিক ভাবে বলতে গেলে অন্য সকল বস্তুকে বাদ দিতে দিতে যেতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে নিজের অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে যাদের আর কিছু আছে তাদের কোনটাই তিনি নন্।"

৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, তৃতীয়, ৮.৮। মহাভারতে নারদকে উপদেশ দেবার সময় ভগবান বলছেন আসলে তিনি "অদৃশ্য, অঘ্রাণ্য, অস্পৃশ্য, নির্গুণ, অখণ্ড, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও নিষ্ক্রিয়", শান্তিপর্ব, ৩৩৯, ২১-৩৮। তিনি "অজ্ঞান মেঘ" অথবা এরোপাজিট যাকে বলেন "অতিভাস্বর তিমির" একহার্টের ভাষায় নিঃশব্দ দৈবী মরুভূমি,......আসলে অস্তিত্ববিহীন"।

ভগবদ্‌গীতার বহু অংশে উপনিষদের এই মতের সমর্থন আছে। ব্রহ্মকে "অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্বিকার"[১] "সৎও নন অসৎও নন"[২] ব্রহ্মে পরস্পর বিরোধী বিধেয়ের আরোপ করার অর্থই এই যে প্রায়োগিক উপাধি তাঁর ক্ষেত্রে খাটে না। "স্থাবর অথচ জঙ্গম। সুদূর অথচ নিকট"[৩] ব্রহ্মের দ্বৈত প্রকৃতি ভব ও ভবিষ্ণু, এই ধরনের বিধেয় দিয়ে বোঝানো হয়। তিনি পরা, অর্থাৎ তুরীয় আর অপরা অর্থাৎ অন্তর্লীন, জগতের বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান।"[৪]

পরমের নিরুপাধিকত্বই তাঁর সমগ্র ব্যঞ্জনা নয়। উপনিষদে ঐশী ক্রিয়ায় ও প্রকৃতিতে অংশ গ্রহণের সমর্থন আছে। উপনিষদের ঈশ্বর একান্ত অনন্ত ও কেবল মাত্র সান্তের উর্ধ্বে। যে ঔৎসুক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্লেটো আকাদমীর জ্যোতিষীদের "আপাতকে বাঁচিয়ে রাখতে" উপদেশ দিয়েছিলেন তারই প্রভাবে উপনিষদের ঋষিরাও জগৎকে সদর্থক দেখেছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায় "ব্রহ্ম থেকেই ভূতেদের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই তাদের স্থিতি, আর ব্রহ্মেই তাদের লয়"। বেদের মতে "তিনি অগ্নিতে আছেন, জলেও আছেন, সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; তিনি ওষধিতে আছেন, বৃক্ষে আছেন, তাঁকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি"।[৫] "এই পরম আনন্দ যদি স্বর্গে না থাকত, কেই বা প্রয়াসশীল হত, কেই বা বাঁচত"?[৬] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরবাদ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, "তিনি এক ও নিরাকার অথচ গূঢ় উদ্দেশ্যে তাঁর শক্তির

আঞ্জেলাস সিলেসিয়াস বলেন, "ঈশ্বর বিশুদ্ধ অবাস্তব......তাঁর এখনও নেই, এখানেও নেই।" প্লটিনাসের কথা "সকলের জনক, সেই এক কিছুরই নন্, বস্তুও নয়, গুণও নয়, বুদ্ধিও নয়, আত্মাও নয়, সচলও নয়, অচলও নয়, দেশেও নেই, কালেও নেই, তিনি নিজেই নিজের সংজ্ঞার্থ, আকারে অদ্বিতীয় অথবা নিরাকার। রূপ, গতি ও বিরাম প্রভৃতি যারা সত্তার অঙ্গ এবং যাদের জন্যই সত্তার বহুরূপতা, সে সব সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই তিনি বিদ্যমান।" এনিয়াডস্ (Enneads), ইংরাজী অনুবাদ—ম্যাক্‌কেনা—ষষ্ঠ, ৯।

১। দ্বিতীয়, ২৫

২। ত্রয়োদশ ১২, ত্রয়োদশ ১৫-১৭।

৩। ইশোপনিষদ ৫। তাছাড়া মুণ্ডক উপনিষদ, দ্বিতীয় ১, ৬-৮; কঠোপনিষদ দ্বিতীয় ১৪; বৃহদারণ্যক উপনিষদ, দ্বিতীয় ৩৭; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, তৃতীয় ১৭।

৪। বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্। ত্রয়োদশ ১৫।

৫। যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

৬। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

নানা ব্যবহার দ্বারা বহু আকারের সৃষ্টি করেন। আদিতে ও অন্ততে তাঁর মধ্যেই বিশ্ব লয় হয়। তিনিই ঈশ্বর। তিনি যেন আমাদের সৎ কর্মে মতি দেন।"[১] আবার "তুমিই নারী, তুমিই নর, তুমিই তরুণ, তুমিই তরুণী, তুমিই নবজাত আবার যষ্টি অবলম্বনকারী জড়দেহ বৃদ্ধ। তোমার বদন সর্ব দিকে।"[২] আবার "তাঁর আকার অপশ্য, চক্ষুঃ দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না। তাঁকে অন্তর্যামী রূপে যে হৃদয় ও মন দিয়ে উপলব্ধি করে সেই অমর হয়।"[৩] "তিনি সমগ্র বিশ্বের এক দেবতা, আবার তিনি নিজেই বিশ্ব, তাঁর নিজসত্তায় তিনি বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। তিনিই আমাদের ভিতরের দ্যুতি, হৃদন্তর্জ্যোতিঃ। তিনিই ব্রহ্ম, জীবন মৃত্যু যাঁর ছায়া।"[৪]

উপনিষদে পাই যে ব্রহ্ম অচিন্ত্য ও অব্যয় আবার তিনিই বিশ্বপতি। তিনি যদিও সর্বভূতের উৎপত্তিস্থল তবু নিজে তিনি চিরস্থাবর।[৫] শাশ্বত সত্তা শুধু যে অস্তিত্বকে ধারণ করেন তাই নয় তিনিই জগতের সক্রিয় শক্তি। ঈশ্বর অনধিগম্য জ্যোতির্লোক নিবাসী পরা তবু অগস্টাইনের ভাষায় "আত্মার ঘনিষ্ঠতম নিজের থেকেও আপন"। উপনিষদ উদাহরণ স্বরূপ একটি গাছে দুটি পাখীর বসে থাকার কথা বলেছে। একটি ফল ভক্ষণ করছে আর একটি শুধু তার খাওয়া দেখছে, ভোগ থেকে সরে গিয়ে নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।[৬] ব্যক্তিত্ব আরোপ বা নৈর্ব্যক্তিক রাখা মনের খেয়াল মত গড়া কল্পনা করা নয়। শাশ্বতকে দুই দিক থেকে দেখা যায়। সবার উপরে যিনি, পরম স্বাধিষ্ঠানে তিনি ব্রহ্ম, আর যখন তিনি সৃষ্টিকর্তা ও জগৎবল্লভ, তখন তিনি ঈশ্বর, নিজের মধ্যে জগৎকে ধারণ করেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। "ব্রহ্মকে সগুণই ভাবি বা নির্গুণই ভাবি, শিবকে সনাতন বলে জানতে হবে, সৃষ্টি থেকে যখন

১। চতুর্থ—১

২। চতুর্থ—৩

৩। চতুর্থ—২০।

৪। ঋগ্বেদ, দশম, ১ ১, ০। কঠোপনিষদ তৃতীয়, ১। ডিউটেরনমি (Deuteronomy) "আমিই মারি আবার আমিই বাঁচাই" দ্বাত্রিংশৎ, ৩৯ দ্রষ্টব্য।

৫। রুমি দ্রষ্টব্য "তোমার জ্যোতি সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট আবার সব থেকে পৃথক।" শাম্‌স-ই তাব্রিজ। (ইংরাজী অনুবাদক নিকলসন) নবম গীত।

৬। মুণ্ডকোপনিষদ, তৃতীয় ১, ১-৩। তথা বয়েম (Boehme), "আবার তমিস্রায় গভীরতা আলোকের নিশ্বাসের মতই বিরাট, এবং তারা এক থেকে অন্যে দূরে থাকে না, বরং পরস্পর মিশেই থাকে এবং কারুরই আদি অন্ত নেই।" তিন তত্ত্ব (Three Principles) চতুর্দশ, ৭৬।

পৃথক করে দেখি তখন তিনি নির্গুণ আর যখন তাঁকে সর্বব্যাপী করে দেখি তখন তিনি সগুণ।"[১] সৃষ্টি যে অনিয়তাকার অনিশ্চয় না হয়ে ব্রহ্মাণ্ড আকার সে ঈশ্বরের বিভ্রম। ভাগবতের মতে অখণ্ড চৈতন্যরূপ অদ্বিতীয় সত্তাকেই পরমাত্মা বা ভগবান বলে।[২] তিনিই চরম তত্ত্ব, আমাদের আসল আত্মা আবার পূজ্য ভগবান। ব্রহ্ম একাধারে তুরীয়, জাগতিক ও প্রাতিস্বিক সত্তা। তুরীয় ভাবে তিনি শুদ্ধসত্ত, কোনপ্রকার ক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার দ্বারা অনাহত, বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন। আবার সচল জাগতিক ভাবে তিনি যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডলীলার ধারক তাই নয় তার চালকও, আবার যিনি সকলের মধ্যে অথচ সকলের উর্ধ্বে আছেন সেই পরমাত্মাই সকল ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান।[৩]

ঈশ্বর অশুভের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নন, কেননা তিনি স্বেচ্ছাচারী নন, এবং জগৎ যদি সক্রিয় স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হয়, যাদের প্রভাবান্বিত করা যায় কিন্তু চালনা করা যায় না তবে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীতে স্বাধীন আত্মা আছে বলে ধরলে, অকল্যাণ সম্ভাব্য ও সম্ভবপর। একেবারে যান্ত্রিক জগতের বিকল্প হল দুর্ঘটনা ও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ জগৎ। যদি সকল প্রকার ভ্রান্তি, কুশ্রীতা ও অশুভপ্রবণতাকে বাদ দিতে হয়, তাহলে সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধানও থাকে না। সত্য, শিব ও সুন্দরের দিকে যদি সক্রিয় ঔৎসুক্য থাকে তাহলে তার বিপরীত ভ্রান্তি, অশুভ ও কুশ্রীতাকে শুধু ভাবগত সম্ভাব্যতা বলে ধরলে চলবে না, তাদের প্রতিরোধ্য বাস্তব প্রবণতা বলে মনে করতে হবে। গীতাতে দেখা যায় জগৎ শুভাশুভের সক্রিয় সংঘর্ষের ক্ষেত্র এবং ভগবান এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে গভীর ভাবে কৌতূহলী।

১। নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয় সনাতনঃ
নির্গুণঃ প্রকৃতেরণ্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।

২। বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে।

আবার উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামগতিং গতিম্
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।

৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়, ৮,১২ সম্বন্ধে শঙ্করের মন্তব্য। স্থূলভাবে বলা যায়, পরমাত্মার তুরীয় জাগতিক ও প্রাতিস্বিক ভাব খৃষ্টীয় ত্রয়ী, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমগোত্রীয়।

তিনি মানুষকে ভ্রান্তি, অসুন্দর ও অকল্যাণ প্রতিরোধ করতে আপনার সমস্ত স্নেহের ঐশ্বর্য দিয়ে সাহায্য করেন। ঈশ্বর পরিপূর্ণ শিব ও তাঁর প্রেম অসীম বলে তিনি জীবের ক্লেশ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এই অর্থে যে তাঁর শক্তির সীমা বাইরে থেকে কেউ নির্দেশ করে না। লোকের সামাজিক প্রকৃতি ভগবানের উপর আরোপিত নয়, তাঁর ইচ্ছা দ্বারা উৎপন্ন। মানুষ কিভাবে আচরণ করবে, তাদের নির্বাচনের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার কিম্বা অসদ্ব্যবহার করবে, এসব কথা সর্বজ্ঞ ভগবান আগে থাকতে জানেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু বলতে পারি যে এমন ঘটনা ঘটে না যা তিনি জানেন না। প্রবণতা যখন অনির্দিষ্ট থাকে তখনও তিনি জানেন আবার যখন তা বাস্তবে পর্যবসিত হয় তখনও জানেন। ঈশ্বরের সর্বব্যাপী ক্ষমতা কর্মতত্ত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ঋগ্বেদ যখন রচিত হয়েছিল, তখন থেকে হিন্দু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রকৃতির যৌক্তিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে খবর রাখেন। ঋত বা শৃঙ্খলা সর্বব্যাপী। বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ঈশ্বরের মন ও ইচ্ছা অনুযায়ী, তাকে তাঁর শক্তির সীমা বলে বিবেচনা করা যায় না। বিশ্বের সগুণ অধীশ্বর কালবশ, কাজেই পরিবর্তন সাপেক্ষ।

যে সগুণ ভগবান নিজ প্রকৃতিবশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, গীতায় ব্রহ্মের সেই ভাবের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি সকলের অন্তরে বাস করেন।[১] তিনি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু।[২] তিনি আমাদের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করেন এবং আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।[৩] যা কিছু মূল্যবান, তার তিনি উৎস ও ধারক। পূজা ও প্রার্থনার মধ্যে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসি।

এই সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের জন্য দায়ী।[৪] ব্রহ্মের পরা ও অপরা দুই প্রকৃতিই আছে।[৫] জীবাত্মারা উচ্চতর পরা প্রকৃতি ও জড়দেহ

১। অষ্টাদশ, ৬১

২। নবম, ২৪

৩। সপ্তম, ২২

৪। জেকব বোয়েম দ্রষ্টব্য "সৃষ্টি পিতার কীর্তি, দেহধারণ পুত্রের আর জগতের অন্ত হবে পবিত্র আত্মার ক্রিয়ায়।"

৫। সপ্তম, ৪-৫।

নিম্নতর অপরা প্রকৃতি। ভাবগত পরিকল্পনাও ঈশ্বরের, আবার যে বস্তুগত মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ভাব পরিস্ফুট হয়, ধারণাজাত বিষয় ব্রহ্মাণ্ডে রূপান্তরিত হয়, তাও তাঁর। ধারণার পরিকল্পনাকে মূর্ত করতে হলে অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা প্রয়োজন, সম্ভাব্য বস্তুর মাধ্যমকে বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার। ঈশ্বরের ভাব অস্তিত্ব খুঁজছে, আর অস্তিত্বের জগৎ পরোৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করছে। দিব্য প্রকার ও সম্ভাব্য জড়বস্তু উভয়েরই উৎপত্তি ভগবানে, তিনিই আদি, মধ্য ও অন্ত,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। সৃষ্টি ভাবগ্রস্ত ভগবান ব্রহ্মা, আর যখন তিনি সৃষ্টি রক্ষা করার জন্য অমেয় প্রীতি বর্ষণ করেন ও প্রীতির সমপরিমাণ ধৈর্য ধরে কর্ম করেন, তখন তিনি বিষ্ণু। যখন ধারণাজাত বিষয় ব্রহ্মাণ্ডের রূপ নেয়, যখন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই পরিপূর্ণতাই শিব। ঈশ্বর একাধারে ধী, প্রীতি ও পরোৎকর্ষ। এই তিন বৃত্তিকে পৃথক করা যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের ধারণা তিন প্রকারের হলেও মূলতঃ তারা এক। গীতার উদ্দেশ্য জগতের ত্রাণ তাই বিষ্ণুভাবের প্রাধান্য। ব্রহ্মের বিষ্ণুভাবের প্রতিমূর্তি কৃষ্ণ।

ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু সুপরিচিত দেবতা। বিশ্‌ ধাতু মানে ব্যাপ্ত হওয়া, কাজেই তিনি সর্বব্যাপী।[১] তিনি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ক্রমবর্ধমান পর্যায়ে সনাতন সর্বেশের পদ ও মর্যাদা নিজের মধ্যে সংগ্রহ করছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে "নারায়ণকে আমরা পূজা করি, বাসুদেবকে ধ্যান করি, আর এতে বিষ্ণু আমাদের সহায় হোন।"[২]

গীতার উপদেষ্টা কৃষ্ণ[৩] প্রাচীন সূর্যদেবতা বিষ্ণুর এবং বিশ্বজাগতিক

১। অমর বলেন, "ব্যাপকে পরমেশ্বরে" বিশ্‌ ধাতু (প্রবেশ) থেকেও এর ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছে "সৃষ্টি করে তিনি পরে তাতে প্রবেশ করলেন।" পদ্মপুরাণে বিষ্ণুকে প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত ঈশ্বর বলা হয়েছে, "স এব ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃত্যাম্ আবিবেশহ"।

২। দশম, ১, ৬। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্ নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। নারায়ণ বলেছেন, সূর্যের মত আমি সমস্ত জগতে রশ্মিপ্রপাত করি এবং আমি সকল বস্তুর ধারক, এই জন্য আমি বাসুদেব বলে আখ্যাত। মহাভারত, দ্বাদশ, ৩৪১, ৪১।

৩। কর্ষতি সর্বং কৃষ্ণঃ। যিনি সকলের ভক্তি আকর্ষণ বা উদ্রেক করেন, তিনিই কৃষ্ণ। বেদান্তরত্ন মঞ্জুষায় (৫২ পৃঃ) আছে কৃষ্ণ নাম এই জন্য যে তিনি ভক্তদের পাপ হরণ করেন পাপং কর্ষয়তি নির্মূলয়তি। কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কৃষ ধাতু (চাঁচা) থেকে, কেননা তিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত পাপ ও অমঙ্গল চেঁচে সাফ করেন। কৃষভের্বিলেখনার্থস্যরূপং ভক্তজন পাপাদিদোষ কর্ষণাৎ কৃষ্ণ। শঙ্করের ভগবদ্গীতার ভাষ্য, ষষ্ঠ, ৩৪।

ভাবের এক প্রাচীন দেবতা ও নরের আশ্রয় বা লক্ষ্য নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েছেন।

এই মহাজাগতিক প্রকটতাকে দেশকালে যিনি ধারণ করে আছেন সেই জগৎ-অতীত, সনাতন দেশ-কালোত্তর ব্রহ্মই প্রকৃত সত্য। তিনি পরমাত্মা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপ ও গতির আত্মা। সেই পরমেশ্বরই প্রাতিস্বিক আত্মা ও জঙ্গম প্রকৃতির অধীশ্বর ও জাগতিক পরিণতির বিষয়। তিনিই আবার পুরুষোত্তম, জগতের অভিব্যক্তির মধ্যে যাঁর দ্বৈত প্রকৃতি প্রকট রয়েছে। তিনি আমাদের অস্তিত্বকে পূর্ণ করেন, বোধকে প্রদীপ্ত করেন, আমাদের অন্তরের গোপন কলকাঠিকে সচল করেন।[১]

পুরুষোত্তম থেকে নীচে সকল বস্তুই অস্তি ও নাস্তির দ্বিত্বে জড়িত। ঈশ্বরের মধ্যেও নাস্তি বা মায়া আছে যদিও সেটা তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি তাঁর সক্রিয় প্রকৃতিকে (স্বাং প্রকৃতীম) প্রক্ষেপ করেন এবং যে সকল আত্মা তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ত পাপ কর্ম করে যায় তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রহ্ম পরিবর্তনশীল জগতে স্বগত শক্তির মাধ্যমে এই সব কর্মের কারণ হন, কিন্তু তাঁর আর এক ভাব আছে যাকে এ সব স্পর্শ করতে পারে না। তিনি নির্গুণ পরম আবার অন্তর্লীন সংকল্প, সকলের কারণ অথচ

১। তিনি অজ্ঞানকে জ্ঞানালোক দেন, দুর্বলকে শক্তি দেন, পাপীকে ক্ষমারূপ মুক্তি দেন, ক্লিষ্টকে করুণাময় শান্তি প্রদান করেন ও অতৃপ্তকে তৃপ্তি দেন।......জ্ঞানমজ্ঞানাম্, শক্তিরশক্তানাম্, ক্ষমা সাপবাধানাম্, কৃপা দুঃখিনাম্, বাৎসল্যং সদোষানাম্, শীলং মন্তানাম্, আর্জবং কুটিলানাম্, সৌহার্দ্য দুষ্টহৃদয়ানাম্, মার্দবং বিশ্লেষ ভীরুনাম্। আবাব,—

আনন্দামৃতরূপস্ত্বং ত্বং চ শান্তিনিকেতনম্
হরসি প্রাণিনাং দুঃখং বিদধাসি সদা সুখম্।

তুমিই আহ্লাদ ও আনন্দ, তুমি শান্তিব আধার, তুমি দুঃখী প্রাণীর দুঃখ বিনাশ কর এবং তাদের সুখ দাও।

দীনানাং শরণং ত্বং হি, পাপিনাং মুক্তিসাধনম্।

তুমি দুর্বলের আশ্রয়, পাপীদের ত্রাণকর্তা।

আবার "তুমি জ্যোতির্ময়, আমাকে জ্যোতি দাও, তুমি বীর, আমাকে বীর্য দাও, তুমি বল আমাকে বল দাও, তুমি ওজস্বী আমাকে ওজ দাও, তুমি ক্রোধী (অন্যায়ের উপর) আমাকে ক্রোধ দাও, তুমি সহনশীল, আমাকে সহগুণ দাও।" তেজোঽসি তেজোময়ি দেহি, বীর্যমসি বীর্যং ময়ি দেহি, বলমসি বলং ময়ি দেহি, ওজোঽসি ওজোময়ি দেহি, মন্যুরসি মন্যুং ময়ি দেহি, সহোঽসি সহময়ি দেহি। শুক্লযজুর্বেদ, ঊনবিংশ, ৯।

কারণাতীত, সমস্তের চালক কিন্তু নিজে অবিচল। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করেও ব্রহ্ম উভয়ের ঊর্ধ্বে। অসীম বিশ্ব অনন্ত দেশকালে তাঁর মধ্যে স্থিত কিন্তু তিনি ওর মধ্যে নেই।[১] গীতার ভগবান জাগতিক পদ্ধতির সঙ্গে অভিন্ন নন, কেননা তিনি তাদের অতিক্রম করে আছেন।[২] আবার এর মধ্যেও তিনি বিশেষ কোন কোন ভাবে বেশী প্রকট। গীতার বিরুদ্ধে নিম্ন-শ্রেণীর বহু দেবতাবাদ আরোপ করা চলে না।[৩] যদিও চরম ভাবে সম্পূর্ণ এক সত্তা আছে, তবু সকল সাকার বস্তুই সমান ভাবে সম্পূর্ণ নয়।

৫। উপদেষ্টা কৃষ্ণ

ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়নের পক্ষে, তার উপদেষ্টা কৃষ্ণের ঐতিহাসিক সত্তা ছিল কি ছিল না, সে তর্ক নিরর্থক। আসল কথা হ'ল দিব্যশক্তির শাশ্বত প্রকাশ, বিশ্ব ও মানবাত্মার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও দিব্য জীবনের চিরন্তন আবির্ভাব।

তা হলেও কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাঁকে ঘোর আঙ্গিরসের[৪] শিষ্য বলা হয়েছে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের মতে ঘোর আঙ্গিরস সূর্য উপাসক ঋষি ছিলেন।[৫] যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও যাজকদের আসল দক্ষিণা যে তপ, দান, ঋজুতা, অহিংসা ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের আচরণ এই কথা বর্ণনার পর[৬] ঐ উপনিষদে বলা হয়েছে যে "যখন দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরস এই সব কথা ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি আরও বলেন যে অন্তিম সময়ে এই তিনটি ভাবনায় আশ্রয় নেওয়া উচিত "তুমি অক্ষিত, অচ্যুত ও প্রাণস্বরূপ"[৭]। উপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশ ও গীতায় কৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে।

মহাভারতের কাহিনীতে অর্জুনসখারূপে কৃষ্ণের গুরুভূমিকা আছে। পাণিনিতে বাসুদেব ও অর্জুন উভয়কেই পূজ্য বলা হয়েছে।[৮] কৃষ্ণ যদুবংশের

১। নবম, ৬, ১০ ২। দশম, ৪১-২ ৩। দশম, ৩১-৩৭ ৪। তৃতীয়, ১৭, ৬

৫। ত্রিংশৎ, ৬ ৬। তপোদানমার্জবমহিংসা সত্যবচনম্ (ভগবদ্‌গীতা, ষোড়শ, ১-৩)।

৭। ভগবদ্‌গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১০-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। তিনি সম্ভবতঃ ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৭৪ সংখ্যক সূক্তটি রচনা করেন, কেননা, কৌষীতকি ব্রাহ্মণে তাঁকে আঙ্গিরস কৃষ্ণ বলা হয়েছে। ত্রিংশৎ, ৯।

৮। চতুর্থ, ৩, ৯৮।

প্রাচীন বৃষ্ণি বা সাত্বত শাখায় উদ্ভূত। যদুবংশের আদিনিবাস মথুরা নগরের আশেপাশে ছিল। কৃষ্ণের নামের সঙ্গে মথুরানগরের নাম ইতিহাসে, কিম্বদন্তীতে ও লোককথায় জড়িত। কৃষ্ণ বেদের যাজ্ঞিক প্রথার বিরোধী ছিলেন ও ঘোর আঙ্গিরসের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই তত্ত্বই প্রচার করেছেন। পরাজিত ইন্দ্র কৃষ্ণের কাছে নতিস্বীকার করে যে উক্তি করেন তার মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে কৃষ্ণের অভিমত স্পষ্ট হয়।[১] যে সকল লোকের কৃষ্ণের উপদেশে আপত্তি ছিল এবং যাদের তাঁর উপর বিশ্বাসের অভাব ছিল গীতায় তাদের উল্লেখ আছে।[২] কৃষ্ণের প্রাধান্য যে অবিসম্বাদী রূপে গৃহীত হয় নি, মহাভারতে তার লক্ষণ দেখা যায়। মহাভারতে কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি[৩] ও অবতার উভয় রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ সাত্বতদের সূর্য উপাসনা শিখিয়েছিলেন এবং তারা হয়ত সূর্যোপাসনার গুরুকে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখত।[৪] খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বাসুদেব পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত। পালি ধর্মশাস্ত্র অন্তর্গত বৌদ্ধ রচনা নিদ্দেশে (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) লেখক অন্যান্য সম্প্রদায় সকলের মধ্যে বাসুদেব ও বলদেবের উপাসকদের উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিস্ (খ্রীঃ পূঃ ৩২০) বলেছেন সৌরসেনীদের মধ্যে হিরাক্লিস পূজা প্রচলিত ছিল, ওদের দেশে মথুরা ও কৃষ্ণপুর নামে দুটি বড় শহর ছিল। তক্ষশীলার গ্রীক ভাগবত হেলিওডোরাস বেসনগর উৎকীর্ণলিপিতে (খ্রীঃ পূঃ ১৮০) বাসুদেবকে দেবদেব বলেছেন। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ নানাঘাট প্রস্তরলিপিতে প্রারম্ভিক শ্লোকে অন্যান্য দেবতার মধ্যে বাসুদেবের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ লোককথায় রাধা যশোদা এবং নন্দ প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদের বর্ণনা আছে। পতঞ্জলি পাণিনির মহাভাষ্যে, চতুর্থ ৩, ৯৮ শ্লোকের টীকায়

১। আমি দেবেন্দ্র কিন্তু তুমি গোদের উপর ইন্দ্রের শক্তি অর্জন করেছ, তাই তুমি লোকে গোবিন্দ নাম কীর্তিত হবে। হরিবংশ ৪০০৪।

২। তৃতীয়, ৩২, নবম, ১১, অষ্টাদশ ৬৭।

৩। তাঁর প্রথম জীবনের লোককথা ও উপকথা ভাগবত ও হরিবংশে বর্ণিত হয়েছে।

৪। ভাগবতের মতে সাত্বতরা পরমেশ্বরকে ভগবান্ ও বাসুদেব রূপে পূজা করত। (নবম, ৯, ৫০)। যামুনাচার্য তাঁর আগমপ্রামাণ্যে বলেছেন যে যারা ঈশ্বরকে শুদ্ধভাবে উপাসনা করে তাদেরই ভাগবত ও সাত্বত বলে। সত্বাদ ভগবান ভজ্যতে যৈঃ পরঃ পুমান্ তে সাত্বতা ভাগবতা ইতি উচ্যন্তে দ্বিজোত্তমৈঃ।

বাসুদেবকে ভগবত বলেছেন। ভাগবত ধর্মে কৃষ্ণ শ্রীভগবান রূপে পরিচিত বলে বইখানির নাম ভগবদ্‌গীতা। তিনি যে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন তাই ভাগবত ধর্ম। গীতায় কৃষ্ণ বলছেন যে তিনি কোন নূতন মত প্রচার করছেন না, তিনি যে কথা বিবস্বান্‌কে শিখিয়ে ছিলেন, বিবস্বান্ যা মনুকে শিখিয়ে ছিলেন এবং পরে মনু যা ইক্ষ্বাকুকে শিখিয়েছেন তারই তিনি পুনরাবৃত্তি করছেন।[১] মহাভারতেও আছে যে "ভাগবত ধর্ম বিবস্বান থেকে মনু এবং মনু থেকে ইক্ষ্বাকু এই পরম্পরায় চলে এসেছে।"[২] অনুরূপ ভাবে প্রচারিত কিম্বদন্তী নিশ্চয়ই অভিন্ন। আরও প্রমাণ আছে। নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্মের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে এই ধর্ম ঈশ্বর পূর্বে ভগবদ্‌গীতাতে বর্ণনা করেছেন।[৩] আবার ঘোষণা করা হয়েছে যে "কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের সময় যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ও অর্জুন বিষণ্ণ তখন ঈশ্বর এই ধর্মের উপদেশ দেন"[৪]। এই ধর্ম একেশ্বরবাদের ("একান্তিক")।

গীতায় কৃষ্ণকে পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরা হয়েছে। বহুধা বিশ্বজগতের অন্তরালে, সমস্ত প্রতীয়মান বস্তুর পশ্চাতের অবিচল সত্যে সকলের উর্ধ্বে ও সর্বব্যাপীরূপে এই ঐক্য বিরাজমান। তিনিই প্রকট ঈশ্বর, মরলোকের পক্ষে যাঁকে জানা সহজ। যারা অবিনশ্বর ব্রহ্মের সন্ধানী, তারাও তাঁকে পাবে কিন্তু অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে। তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়, এটা তাঁর তুরীয় অবস্থার দ্যোতক, তিনি জীবভূত অর্থাৎ সকলের জীবনসার।[৫]

কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা কিভাবে করা যায়? জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মাকে অভিন্ন ধরা হিন্দুচিন্তায় সুপরিচিত ধারা। উপনিষদে শুনি যে পূর্ণ জাগরিত আত্মা যখন পরমের সঙ্গে তার সত্যকার সম্পর্ক বুঝতে পারে তখন দেখে যে সে আসলে পরমেরই অংশ এবং সে কথা সে ঘোষণা করে। ঋগ্‌বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ২৬ সংখ্যক

১। চতুর্থ, ১, ৩।

২। শান্তিপর্ব, ৩৪৮, ৫১-২।

৩। কথিতো হরি গীতাসু। শান্তিপর্ব, ৩৪৬, ১০।

৪। সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরু পাণ্ডবয়োর্মৃধে
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ং। শান্তিপর্ব ৩৪৮, ৮।

৫। দ্বাদশ অধ্যায়, ১ ও পরবর্তী শ্লোক।

শ্লোকে কামদেব বলছেন, "আমি মনু, আমি সূর্য, আমি বিজ্ঞ ঋষি কাক্ষিবান্। আমি অর্জুনির পুত্র কুৎস ঋষিকে ভূষিত করেছি। আমিই প্রাজ্ঞ উষণা··· আমাকে দেখ।" কৌষীতকি উপনিষদে (তৃতীয়) ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলছেন, "আমি প্রাণবায়ু, আমিই চিদাত্মা, আমাকে প্রাণের মত, নিশ্বাসের মত ভজনা কর। যে আমাকে প্রাণরূপে, অমৃতরূপে ভজনা করবে, সে এই সংসারে পূর্ণ জীবন লাভ করবে, স্বর্গলোকে অমরতা ও অবিনশ্বরতা লাভ করবে।"[১] গীতা-রচয়িতা বলছেন, "তীব্র আসক্তি ভয় ও ক্রোধমুক্ত হয়ে আমাতে সমাহিত চিত্ত হয়ে ও আমাকে আশ্রয় করে যাঁরা জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন তাঁরা আমার ভাবসত্তায় সিদ্ধ হয়েছেন"[২], জীবের মধ্যে তার নিজ সত্তা ছাড়া এমন কিছু আছে যার কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে। এই সমর্পণের মধ্যেই তার রূপান্তর। মুক্ত আত্মা তার দেহকেই অনন্তের প্রকাশের বাহনরূপে ব্যবহার করে। কৃষ্ণের দেবত্ব পরমার্থের সকল অকপট সাধকেরই সাধারণ পুরস্কার। তিনি সে রকম নায়ক নন, যিনি পৃথিবীতে বাস করে, নিজের প্রিয় বান্ধব ও শিষ্যদের কাছে নিজ বক্তব্য শুনিয়ে এখন পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। পরন্তু তিনি সর্বব্যাপী ও সকলের মধ্যে বাস

১। এর উপর শঙ্করের টীকা 'অর্থাৎ ইন্দ্র নামে এক দেব শাস্ত্রসম্মত ঋষিদৃষ্টিতে নিজেকে পরম ব্রহ্মরূপে দেখে বলছেন 'আমাকে জান' যেমন কামদেব সেই একই সত্য উপলব্ধি করে বলেন 'আমি সূর্য, আমি মনু'। শ্রুতিতে (অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে) কথিত হয়েছে "সাধক ভগবানকে সার্থক উপলব্ধি করলে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়।"

২। চতুর্থ অধ্যায়, দশম শ্লোক। যীশু তাঁর জীবন নিঃসঙ্গ প্রার্থনায় ধ্যানে ও সেবায় কাটান, আমাদের প্রত্যেকের মত প্রলোভিত হন, মহান্ সাধকদের মত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং আধ্যাত্মিক ভাবের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে ঈশ্বরের উপস্থিতির জ্ঞান হারিয়ে বলে ওঠেন, "হে ভগবান, হে ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করলে কেন?" (মার্ক, পঞ্চদশ, ৩৫)। তিনি বরাবরই ঈশ্বরের উপর নিজ নির্ভরতা অনুভব করতেন। "পিতা আমা অপেক্ষা বড়" (জন, চতুর্দশ, ২৮) "আমাকে তোমরা ভাল বল কেন? ঈশ্বরই একমাত্র মঙ্গলময়।" (লিউক, অষ্টাদশ' ১৯) "কিন্তু সেই দিন ও কালের কথা কেহই জানে না, এমন কি স্বর্গের দেবদূতরা বা ঈশ্বরপুত্রও জানেন না, জানেন শুধু ঈশ্বর" (মার্ক, ত্রয়োদশ, ৩২) "পিতঃ, তোমার কাছে আমার আত্মাকে সমর্পণ করছি" (লিউক, ত্রয়োবিংশত, ৪৬)। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সত্ত্বেও যীশু ঐশী প্রেম ও প্রসাদ স্বীকার করেছিলেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেছিলেন। এবং এইভাবে নিজ ত্রুটি থেকে উদ্ধার পেয়ে ও তাঁকে আশ্রয় করে তিনি দিব্যভাবে সিদ্ধ হন। "আমি ও পিতা অভিন্ন"। (জন, দশম, ৩০)

করছেন এবং অন্যকে যখন যা বলেছেন তা আবার আমাদের প্রত্যেককে সব সময়ই বলতে প্রস্তুত। তিনি বিগত ব্যক্তি নন, অন্তর্যামী, আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার এক বিষয়।

সাধারণ অর্থে ঈশ্বর কখনও জন্মগ্রহণ করেন না। জন্মগ্রহণ ও দেহ-ধারণ মানেই সীমাবদ্ধ হওয়া, ঈশ্বরের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। যখন কোন বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ কালে ঈশ্বর আপনাকে প্রকট করেছেন এ কথা বলা হয়, তখনই তা কোন সান্ত সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এই অর্থই হয়। একাদশ অধ্যায়ে সমস্ত বিশ্বকে ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। জগতের অধ্যাত্মীয় ও বিষয়গত প্রক্রিয়াগুলি পরমেশ্বরের প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভাবের প্রকাশ তবু যা কিছু মহিমময়, সুন্দর ও প্রবল তার মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি বেশী মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। যখনই কোন প্রাতিস্বিক তাঁর সীমিত শক্তি সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক গুণের বিকাশজনিত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও করুণার অধিকারী হ'ন তখনই তিনি জগতের সমসাময়িক অবস্থা বিচার করে পারমার্থিক ও সামাজিক আলোড়নের সূত্রপাত করেন এবং আমরা তখন বলে উঠি যে সাধু লোকেদের রক্ষার জন্য, অসাধুদের বিনাশের জন্য ও ন্যায়ভিত্তিক সংসারের প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান জন্মগ্রহণ করেছেন। বিশ্বাত্মা যে কোটি কোটি আকারে নিজেকে প্রকট করেন, প্রাতিস্বিকরূপে কৃষ্ণ তাদেরই অন্যতম। গীতা রচয়িতা ও ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে ও তাঁর শিষ্য অর্জুনকে ঐ সমস্ত প্রকট আকারের অন্যতম বলে বর্ণনা করেছেন।[১] অবতাররাই মানুষের আধ্যাত্মিক সম্বল ও অন্তর্নিহিত দিব্য বিভূতির প্রমাণ। একে মানুষের সীমাবদ্ধ আকারের মধ্যে দিব্য মহিমার সংক্ষেপিত অবস্থিতি বলে ধরা ঠিক নয়, এ বরং দৈব মহিমার সহযোগে মনুষ্যপ্রকৃতির ঐশী স্তরে উন্নয়ন।

ঈশ্বরবাদীরা কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যে মনুষ্য আকারে ঈশ্বরের অবতরণ বা আবির্ভাব দেখতে পার্ন। যদিও ঈশ্বরের জন্মও নাই, পরিবর্তনও নাই তবু তিনি বহুবার জন্মগ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণ নরাকারে বিষ্ণু। তিনিই ব্রহ্ম, পৃথিবীতে দেহী ও জাত রূপে আপাত প্রতীয়মান।[২] জগৎ সৃষ্টির মতই

১। দশম, ৩৭।

২। শঙ্কর বলেছেন, "স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্য শক্তি বীর্য তেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ, ত্রিগুণ ত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূল প্রকৃতিং বশীকৃত্যা, অজো অব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবোপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব, লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব

দিব্য সত্ত্বের মনুষ্যপ্রকৃতি গ্রহণ দ্বারা দিব্য অখণ্ডতার ক্ষয়বৃদ্ধি হয় না। সৃষ্টি ও অবতরণ দুইই অভিব্যক্ত জগতের ব্যাপার, পরমাত্মাকে তা স্পর্শ করে না।[১]

অনন্ত ভগবান যখন সর্বকালেই সান্তরূপে প্রকট হচ্ছেন, তখন এক বিশেষ সময়ে এক বিশেষ মনুষ্য প্রকৃতি অবলম্বন করে যে বিশিষ্ট প্রকাশ, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, বরং যেভাবে দিব্য প্রাচুর্য সীমিত জগতের দিকে ঝুঁকে উদারভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ করেন, সেই ভাবেরই এক অবাধ পরিণতি বলে ধরা যেতে পারে। সেরকম ধরলে এক সৃষ্টি ছাড়া আর কোনও নূতন সমস্যার উৎপত্তি হয় না। মনুষ্যাকৃতি জীব যদি ভগবানের সাদৃশ্যে তৈরী হয়ে থাকে, পুনরাবৃত্ত শক্তিধারায় যদি নূতন নূতন ছাঁদকে গ্রন্থন করা সম্ভব হয়, এইসকল ভাবে যদি সনাতনকে অনুগামিতায় মূর্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে দিব্য সত্ত্বা তাঁর অস্তিত্বের পরম ভাবকে সম্পূর্ণ এক মানবীয় জীবের মধ্যে ও মাধ্যমে প্রকট করতে পারেন। ইউরোপেও মধ্যযুগের সম্প্রদায়গত ধর্মতাত্ত্বিকরা স্বীকার করেছেন যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবদের মধ্যে বিরাজমান "মর্ম দ্বারা, অবস্থিতি দ্বারা ও ক্ষমতা দ্বারা (By essence, presence, power)।" ঐহিক শৃঙ্খলায় জড়িত সান্ত মানবীয় প্রাতিস্বিকের সঙ্গে অসীম, স্বয়ম্ভব এবং অব্যয় পরমের সম্বন্ধ কল্পনাতীতভাবে নিবিড় কিন্তু যে নিবিড়তায় সংজ্ঞার্থ দেওয়া বা ব্যাখ্যা করে বোঝানো কঠিন। যে সকল মহাত্মাকে আমরা অবতার বলে থাকি, তাঁদের মধ্যে মানবের ঈশ্বরদত্ত অস্তিত্ব ও মর্যাদাকে ভগবান অত্যাশ্চর্যভাবে পুনরুজ্জীবিত

লক্ষ্যাতে, অংশেনঃ সম্বভূব। এর মানে এ নয় যে কৃষ্ণ কোন অংশ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন বা আংশিক অবতার। অংশেনঃ কথাটির আনন্দগিরির ভাষ্য হচ্ছে "স্বেচ্ছানির্মিতেন মায়াময়েন স্বরূপেন" অর্থাৎ নিজ ইচ্ছায় মায়াময় রূপগ্রহণ। খ্রীষ্টীয় অনুচরদের ধর্মসূত্রে ঈশ্বরপুত্রের মানব প্রকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, সে মতে "তিনি পূত অশরীরী আত্মার ঔরসে, কুমারী মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং পন্টিয়াস পাইলেটের অত্যাচারে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত ও সমাধিস্থ হন" কিন্তু খ্রীষ্টীয়দের নিসীয় ধর্মসূত্রে এর উপর যোগ করা হয়েছে যে তিনিই স্বর্গ থেকে নেমে রক্তমাংসের শরীর গ্রহণ করেন"। ঈশ্বরের রক্তমাংসের শরীর গ্রহণকেই "অবতরণ" বলে।

১। হুকার বলেছেন, "ঈশ্বর ও মানবের এই অত্যাশ্চর্য মিলনে সেই প্রকৃষ্ট প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের পক্ষে নির্বিকার হওয়ার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু নেই।" Ecclesiastical polity (১৮৮৮ সংস্করণ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ২৩৪।

করেন। বিশ্বজগতের সমস্ত ঘটনায়, পরম্পরার মধ্যে সনাতনের যে অনুপ্রবেশ দেখতে পাই, অবতারদের মধ্যে সেই ব্যাপারেরই গভীরতর বিকাশ হয়। ভগবান একবার আমাদের ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন বলে, আমরা নিজেদের বিনাশের ব্যবস্থা করলেও, তিনি উদাসীনভাবে সরে দাঁড়ান না। স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার দ্বারা যখনই অন্যায়ের বৃদ্ধি হয় ও সংসারের গতিপথ সঙ্কটে স্তব্ধ হয়ে আসে তখনই তিনি কলেবর গ্রহণ করে সংসারকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করে তাকে নূতন পথের সন্ধান দেন। তিনি নিজ প্রীত্যর্থে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে সৃষ্টিলীলাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নত করেন। মহাভারতের এক জায়গায় আছে যে বিশ্বজগতের পালক ব্রহ্মের চার রূপ আছে। প্রথম রূপে পৃথিবীতে বাস করে তপস্যায় রত হন, দ্বিতীয় রূপে বিপথগামী মানুষদের ক্রিয়াকর্মের উপর নজর রাখেন, তৃতীয় রূপে মনুষ্য সংসারের কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন, আর চতুর্থ রূপে সহস্র বর্ষব্যাপী যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকেন।[১] পরম নিষ্ক্রিয়তা দিব্য প্রকৃতির একমাত্র ভাব নয়। হিন্দু চিন্তাধারায় অবতার মাত্র মানব পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়। জগতে দুঃখ কষ্ট ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তার জন্য মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অবাধ্যতা দায়ী নয়। সৃষ্টির ঐশী উদ্দেশ্য ও বাস্তব জগতের অসামঞ্জস্যই তার কারণ। মানুষের "অধঃপতন" ইত্যাদি দুঃখকষ্টের হেতু হয় তবে নির্দোষ প্রকৃতিতেও যে ত্রুটি থাকে, সমস্ত জীব যে জরা ও রোগের অধীন, তার কারণ খুঁজে পাই না। "মৎস্যের শরীরে কর্কট রোগ হয় কেন?" এই ধরনের প্রশ্নকেও এড়ানো যায় না। গীতার বক্তব্য যে একজন সৃষ্টিকর্তা ভগবান আছেন, তিনি অতল পুণ্যের উপর নিজস্ব আকৃতি সকল আরোপ করেছেন। যে অনাসৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা আনা প্রয়োজন, যে রাত্রির অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করা দরকার, প্রকৃতি সেই অনাহত উপকরণ। এই দুই বৈপরীত্যের সংঘর্ষে

---

১ চতুর্মূর্তিরহং শশ্বল্লোকত্রাণার্থমুদ্যতঃ
আত্মানং প্রবিভজ্যেহ লোকানাম্ হিতমাদধে
একা মূর্তিস্তপশ্চর্যাং কুরুতে মে ভুবিস্থিতা
অপরা পশ্যতি কুর্বাণং সাধ্বসাধুনি
অপরা কুরুতে কর্ম মানুষং লোকমাশ্রিতা
সে তে চতুর্থী ত্বপরা নিদ্রাং বর্ষসহস্রিকীম্।
—দ্রোণপর্ব ঊনত্রিংশৎ, ৩২-৩৪।

যখন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন সেই অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান ও ধারণা এককালীন সৃষ্টি উন্মোচন রূপ ধারণার অনুকূল নয়। কৌলিক ঈশ্বর জগদীশ্বরে পরিণত হ'ল, জগদীশ্বর আবার এখন বিশ্বেশ্বর হয়েছেন, আবার এখন মনে হচ্ছে যে ব্রহ্মাণ্ডে এরকম বিশ্বজগৎ বোধ হয় আরও অনেক অনেক আছে। পরমেশ্বর ক্ষুদ্রতম গ্রহগণের অন্যতমের একাংশকে নিয়েই লিপ্ত আছেন এ রকম কথা ধারণায় আসে না।

অবতারবাদ অধ্যাত্মজগতের বিধানের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। ঈশ্বরকে যদি মানুষের ত্রাণকর্তারূপে স্বীকার করতে হয় তাহলে যখনই মানুষের আদর্শ অকল্যাণের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তখনই ঈশ্বরের আবির্ভাব অনিবার্য। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাবই অবতার, সিদ্ধ হলে মানুষ ঈশ্বরত্ব লাভ করে, সে স্বতন্ত্র বস্তু। অবশ্য প্রত্যেক চিন্ময় জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের অবতরণ আছে, কিন্তু সে হ'ল আচ্ছন্ন প্রকাশ। নিজ ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে আত্মসচেতন ব্যক্তির সঙ্গে মায়াবৃত চেতনাবিশিষ্ট ব্যক্তির তফাৎ আছে।

অবতারত্ব থেকেই বোঝা যায় যে ঈশ্বর পূর্ণ সজীব ও ভৌত আবির্ভাবের বিরোধী নন। আমরা জড়দেহ ধারণ করেই পরিপূর্ণ চিন্ময় সত্যের অধিকারী হতে পারি। মানব-প্রকৃতিকে শৃঙ্খল মনে করার প্রয়োজন নেই, তাকে দিব্যজীবনের যন্ত্ররূপেও কল্পনা করা যায়। আমাদের সাধারণ মানুষদের জীবন ও শরীর প্রকাশের পক্ষে অজ্ঞান, অসম্পূর্ণ ও অক্ষমযন্ত্র কিন্তু সেরকম সব সময়ই থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। দিব্যচেতনা এই যন্ত্র দিয়েই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেয়, কিন্তু মানবের বদ্ধ সংবিৎ বাস্তব, জৈব ও মানসিক শক্তিসমূহের উপর সেরকম পূর্ণ আধিপত্য লাভ করতে পারে না।

বিশেষ পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ণ জ্ঞান বজায় রেখেও ঈশ্বর অবতার-রূপ সীমাবদ্ধ আকার গ্রহণ করেন একথা গীতায় স্বীকৃত হলেও, মানুষের মধ্যেই যে ভগবান আছেন, মানুষ যে চিরন্তন অবতার, মানুষের মধ্যে যে দিব্য চেতনা সর্বদা বর্তমান সে কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই ধারণা পরস্পর অসঙ্গত নয়, একটি দিব্যের লোকোত্তর ভাব আর একটি লোকব্যাপী ভাব। মানবজাতিকে পারমার্থিক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসন

প্রয়াসী গীতার উপদেষ্টা নিজের দিব্য মূলের উপরই তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের মধ্যে যে দিব্যভাব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে, কৃষ্ণাবতারে তার পূর্ণ উন্মীলনের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাগবতে আছে[১] "মধ্যরাত্রে গভীর অন্ধকারে আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্যামী দিব্য দেবকীর মধ্যে নিজেকে উন্মোচিত করলেন কেননা, প্রত্যেকের অন্তরেই ভগবান প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন"।[২] গভীরতম তমসাচ্ছন্ন রাত্রির মধ্য থেকেই ভাস্বর জ্যোতির প্রকাশ হয়। রাত্রি রহস্যে ও উন্মীলনে ঐশ্বর্যময়ী। রাত্রি আছে বলে আলোর অস্তিত্ব কম বাস্তব নয়। বরং রাত্রি না থাকলে মানুষে আলোর ধারণাই করতে পারত না। অন্ধকার রাত্রিতে পরিত্রাণই কৃষ্ণজন্মের মর্মার্থ। দুর্দৈব ও বন্ধনের ক্ষণে জগতের পরিত্রাতা জন্মগ্রহণ করলেন।

জনশ্রুতি কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর সন্তান। আমাদের সাত্ত্বিক প্রকৃতি যখন বিশুদ্ধ হয়,[৩] আমাদের বুদ্ধির দর্পণ যখন বাসনার ধূলিমুক্ত হয়, তখনই তার মধ্যে শুদ্ধ সংবিৎ প্রতিফলিত হয়। সর্বনাশের সময় স্বর্গীয় জ্যোতি প্রকট হয়, তাতে মানুষের জীবনে যে ঐশ্বর্যলাভ হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অন্তরের আলোক হঠাৎ বিচ্ছুরিত হয়, সে আলোতে জীবন আবার সতেজ ও নূতন বলে প্রতিভাত হয়। আমাদের মধ্যে যখন দিব্য-জীবনের উৎপত্তি হয়, তখন আমাদের চক্ষু থেকে বন্ধন খসে পড়ে, কারাগারের অর্গল খুলে যায়। প্রত্যেক জীবের অন্তরেই ঈশ্বরের নিবাস এবং যখন তাঁর গুহ্য আলয়ের পর্দা সরে যায় তখনই আমরা দৈববাণী শুনতে

১। নিশীথে তমোভূতে জায়মানে জনার্দনে দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ··· বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ জনিষ্যতে। ভাগবত একাদশ ২৩।

যীশুখ্রীষ্টের দেহধারণেব সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার তুলনা কবা যাক্ "যখন সর্ববস্তু গভীর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন ছিল এবং রাত্রি দ্রুত যাত্রা'র মধ্যপথে তখন তোমার সর্বশক্তিমান বাণী তোমার স্বর্গস্থ রাজাসন থেকে লাফিয়ে পড়ল। আলেলুয়া (Alleluia)"। অবতরণবাদ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আরিউস বলেছেন যে পুত্র পিতার সমকক্ষ নন, তার সৃষ্ট জীব মাত্র। সাবেলিয়াস বলেন যে তাঁরা পৃথক নন, একেরই বিভিন্ন ভাব। প্রথম মতে পিতা ও পুত্রের স্বাতন্ত্র্যের উপর, দ্বিতীয় মতে তাদের অভিন্নতার উপর জোর। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হল যে পিতা ও পুত্র সমকক্ষ এবং উপাদানে অভিন্ন, তবে তাদের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র।

২। দশম, ২০, অষ্টাদশ, ৬১।

৩। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতম্। ভাগবৎ। দেবকী দৈবী প্রকৃতি।

পাই, আমাদের উপর দিব্য আলোকসম্পাত হয়; আমরা দিব্যশক্তিতে বলীয়ান হয়ে কাজ করতে পারি। মূর্ত মানবচেতনা অজ সনাতনের মধ্যে উন্নীত হয়।[১] কৃষ্ণের শরীরগ্রহণ ঈশ্বরকে রক্তমাংসে নিয়ে আসা ততটা নয়, যতটা মনুষ্যত্বকে দেবত্বে উন্নয়ন।

গুরু শিষ্যকে ধীরে ধীরে তার নিজ অবস্থা লাভ করার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন (মম সাধর্ম্যম্)। শিষ্য অর্জুন সাধক আত্মার প্রতীক, যে এখনও সত্যদৃষ্টিতে সিদ্ধ হয়নি। অন্ধকার, অসত্য, সসীমতা, ও মরত্ব প্রভৃতি যে সকল শক্তি তার উচ্চতর জগতে যাওয়ার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, সে তার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে। যখন তার সমগ্র সত্তা মোহগ্রস্ত, সার্থক কর্মবিধি যখন তার নজরে পড়ছে না, তখন সে জগদ্‌গুরু[২] কৃষ্ণ রূপ তার আত্মার প্রকৃষ্ট ভাবের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে জ্ঞানালোকের প্রসাদ পাবার আবেদন জানাচ্ছে। "আমি তোমার শিষ্য। আমার চেতনার উপর আলোকসম্পাত কর। আমার মধ্যে যা অন্ধকার তা দূর কর। আমি স্বচ্ছ কর্মপদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছি, আমাকে তা ফিরে দাও।" দেহরথের রথী অর্জুন কিন্তু সারথি কৃষ্ণ, তিনিই পথ দেখিয়ে রথকে চালনা করবেন। প্রত্যেক প্রাতিস্বিকই শিষ্য, পরিপূর্ণতার সাধক, ভগবৎ-সন্ধানী। সে যদি

১। আমার মতে, এই হ'ল খ্রীষ্টীয় পুনরুত্থান (Resurrection) বাদের সারমর্ম। যীশুর শরীরে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হ'ল কিনা সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হল দৈবশক্তির পুনরুজ্জীবন। মানুষের পুনর্জন্ম তার আত্মার মধ্যেই ঘটতে পারে, তাতেই বাস্তব সম্বন্ধে গভীরতর বোধ জন্মায়; মহত্তর ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রীতিই আসল পুনরুত্থান, তা থেকেই মানবজীবন তার স্বকীয় দিব্য আধেয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতায় উন্নীত হয়। ভগবান চিরন্তন সৃষ্টিতৎপরতা, অবিরাম কর্ম। তিনি মানবপুত্র, কেননা মানবের মধ্যেই ঈশ্বর পুনর্জন্ম নেন। নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে আচ্ছাদন যখন সরে যায় তখনই মানুষ ঈশ্বরের প্রদর্শিত পথে তাঁর অনুগামী হয়। তাই আঞ্জেলাস সিলেসিয়াস (Angelus Silesius) বলেছেন, খ্রীষ্ট যদি হাজারবারও বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যদি তোমার মধ্যে না জন্মান, তবে তোমার আত্মা নিরাশ্রয়ই থেকে যাবে।

গোলগোথার ক্রুশ তোমার আত্মাকে কখনও উদ্ধার করতে পারবে না, তোমার নিজের অন্তরের ক্রুশই তোমাকে সম্পূর্ণ করতে পারে।

২। "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" অজ্ঞান তিমির দ্বারা অন্ধ চক্ষুকে যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মোচিত করেছেন, সেই দিব্য গুরুকে প্রণাম করি।

আন্তরিক ও সশ্রদ্ধভাবে তাঁকে চায় তো তার লক্ষ্য ঈশ্বরই তার পথপ্রদর্শক হন। উপদেশ সার্থক কিনা সে বিচারে, উপদেষ্টা কোন ঐতিহাসিক মানব বা সাক্ষাৎ ঈশ্বর কিনা এ তথ্যের বিশেষ মূল্য নেই, কেননা ভাব-রাজ্যের সত্য হাজার বছর আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে, এবং জাতি ধর্ম ভেদে তাতে তফাৎ হয় না। আসল কথা হ'ল সত্য বা তাৎপর্য; ঐতিহাসিক ঘটনা তার প্রতিফলন মাত্র।[১]

৬। জগতের স্বরূপ ও মায়াবাদ

যদি মূলতঃ পরমেশ্বর নির্গুণ ও অচিন্ত্য হন, তা'হলে জগতের আবির্ভাবের সঙ্গে পরমের যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক বার করা যায় না। সকল জঙ্গম ও বিবর্তমানেরই মূল অব্যয়, অনন্ত ব্রহ্মে। ব্রহ্মেই তাদের স্থিতি, ব্রহ্ম ছাড়া তাদের অস্তিত্ব থাকে না, যদিও তিনি কিছুর কারণ নয়, কিছুই করেন না এবং কিছুই নির্ধারণ করেন না। জগৎ ব্রহ্মের অধীন কিন্তু ব্রহ্ম জগতের অধীন নন। এই একান্ত একপেশে নির্ভরশীলতা ও চরম সত্তার সঙ্গে জগতের যুক্তির দিক দিয়ে ধারণার অতীত সম্পর্ককেই "মায়া" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। জগৎ ব্রহ্মের মত আসল সৎ বস্তু নয় আবার শুধু অসৎও নয়। সৎ বা অসৎ কোনভাবেই এর সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করা যায় না।[২] ধর্মোপলব্ধির মাধ্যমে ভাবগত চরম সত্তা সম্বন্ধে যখন হঠাৎ আমরা সচেতন হই, তখন জগৎকে ঠিক বুঝতে পারিনি ব্যাখ্যা করতে পারিনি বলে মনে হয় না, মনে হয় সমস্তটাই অধ্যাস। মায়ার মানে এ নয় যে জগৎ সংসার

১। স্পিনোজা বলেছেন, "সশরীর খ্রীষ্টকে জানা মুক্তির পক্ষে আদৌ প্রয়োজন নেই, কিন্তু তথাকথিত ঈশ্বরের নিত্য পুত্রের কথা অর্থাৎ ঈশ্বরেব শাশ্বত জ্ঞান, যা সকল বস্তুব মধ্যে এবং প্রধানতঃ মানবমনেব মধ্যে প্রকট, বিশেষ করে যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে যা দীপ্যমান, সে ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা সে ছাড়া মানবজীবন ধন্য হতে পারে না, যেহেতু ও বস্তু লাভ না করলে সত্য ও মিথ্যা, শুভ ও অশুভের প্রভেদ বোঝা যায় না।" কাজেই দেখা যাচ্ছে স্পিনোজা ঐতিহাসিক খ্রীষ্ট ও ভাবগত খ্রীষ্টের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। খ্রীষ্টেব দেবত্বসংক্রান্ত বিশিষ্ট মতবাদ খ্রীষ্টানদের বিবেকের মধ্যে জন্মলাভ করেছে। খ্রীষ্ট সংক্রান্ত বাদ ঐতিহাসিক তথ্যের ধর্মমতীয় ব্যাখ্যা। লয়সি (Loisy) বলেন, "খ্রীষ্টের পুনরুত্থান তাঁর পার্থিব জীবনেব শেষ পাদক্ষেপ নয়, মানুষের সেবায় তাঁর শেষ নিয়োগ নয়, বরং তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাসের প্রথম সূত্র এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মের আধ্যাত্মিক বনিয়াদ। Maude Petre : Loisy (1944) পৃ ৬৫-৬৬।

২। সদসদভ্যামনির্বচনীয়ম্।

অধ্যাস এবং একান্ত অস্তিত্ববিহীন। এটা অপরিমিত ও অপরিমেয় থেকে একটা স্বাতন্ত্রীকরণ। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের অর্থ কি? প্রায়োগিক স্তরে থেকে এর কোন উত্তর নেই।

প্রত্যেক ধর্মেই পরম সত্তাকে আমাদের আদি অন্ত বিশিষ্ট, অস্থির ও পরিবর্তনশীল কালবশ সংসারের অসীম ঊর্ধ্বে বিরাজমান রূপে ধারণা করা হয়। খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বরকে অব্যয় ও একমুখী বলে বর্ণনা দেওয়া হয়। তিনি অনন্তকালে বাস করে আদি-অন্ত সবই দেখছেন। এইটুকু যদি পর্যাপ্ত হ'ত তাহলে দিব্যজীবন ও বহুধা জগৎ একেবারে পৃথক সত্তা হ'ত, তাদের মধ্যে কোন সংস্পর্শ অসম্ভব হত। পরম সত্তা যদি অদ্বিতীয় নিষ্ক্রিয় ও অনড় হন তা'হলে কাল, বিচলন বা ইতিহাসের কোন স্থানই থাকে না। পরিবর্তন ও পরম্পরাবিশিষ্ট কাল শুধু আপাত প্রতীয়মান যন্ত্র হত। কিন্তু ঈশ্বর এক সজীব ভাব, এক দহনকারী পাবক। আপাতবৈচিত্র্যের অন্তরালে অদ্বিতীয় পরম বা বহুধা জগতের মাঝে সক্রিয় ভগবান, এর কোন্‌টি সত্য এ প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন নেই। পরমেশ্বর একাধারে দুই-ই। অনন্তকালের ধারণা কালকে বা ইতিহাসকে অস্বীকার করে না। অনন্ত কালেরই রূপান্তর। কাল অনন্ত থেকেই উদ্ভূত এবং অনন্তের মাঝেই তার পরিপূর্ণতা। ভগবদ্‌গীতায় কাল ও চিরকালের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। কৃষ্ণরূপের মধ্যে সনাতন ও ঐতিহাসিকের ঐক্য দেখানো হয়েছে। অনন্তের অন্তরতম গভীরতার সঙ্গে কালবশ সচলতার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

সমস্ত দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে যিনি তাঁকেই জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে মনে হবে যে লোকোত্তর বিষয়ী লোকোত্তর বিষয়ের মুখোমুখি হয়ে দ্বৈত ভাবে বিরাজ করছেন। বিষয় ও বিষয়ী একই সত্তার দুই মেরু। তারা সম্পর্করহিত নয়। বৈষয়িক তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি, সফল অস্তিত্বের অব্যক্ত সম্ভাবনা সৃজনকারী চিন্ময় ঈশ্বরেরই আসল প্রকৃতি। নিত্য "আত্ম" আধা নিত্য অনাত্মের সম্মুখীন। নারায়ণ অসীম জলের উপর চিন্তামগ্ন। "অনাত্ম" রূপ প্রকৃতি "আত্মে"রই প্রতিফলন, কাজেই আত্মের অধীন। পরমের মধ্যে যখন নঙর্থক উপাদানের সংক্রমণ হয়, তখনই তার অন্তর্মুখিতা ভবিষ্ণু পদ্ধতিতে উন্মোচিত হয়। আদি ঐক্যই সমগ্র বিশ্বের সম্ভাবনার ফলাফল হয়ে ওঠে।

সৎ ও অসৎ, এই দুই সারতত্ত্বের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই ব্রহ্মাণ্ডীয়

আবির্ভাব। ঈশ্বরই উর্ধ্ব সীমা, তিনি অসৎকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রেখেছেন ও তার দ্বারা সব চেয়ে কম প্রভাবিত আর নিম্নসীমায় জড় বা প্রকৃতি সৎ দ্বারা সব চেয়ে কম প্রভাবিত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই প্রকৃতির উপর পরমেশ্বরের লীলা। প্রকৃতি সদর্থক সত্তা কেননা তার প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। প্রতিরোধী আকারে সে অশুভ। মাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই সে সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট ও পরাজিত। বাকী সৃষ্ট জগতে তার কোন না কোন অংশ আলোককে আড়াল করে।

গীতা দার্শনিক দ্বৈতবাদকে সমর্থন করে না; কেননা অসতের ভাব সতের ভাবসাপেক্ষ। পরমের উন্মোচনে অসৎ, বাস্তবতার এক প্রয়োজনীয় ক্ষণ। জগৎ সংসারকে যে আকারে আমরা দেখছি তা বিসংবাদের ফল। কালবশ বিকারী জগৎ সর্বদা পরোৎকর্ষ লাভে প্রয়াসী। অসৎ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দায়ী বলেই জগতের অপরিহার্য উপাদান, কেননা তারই উপর ঐশী ভাব সক্রিয় হয়।[১] পুরুষ ও প্রকৃতি একই পারমার্থিক সমগ্রতার অংশ। যখন সমগ্র জগৎ বন্ধনমুক্ত হবে, বিকারহীন হবে, সম্পূর্ণরূপে বিভাসিত হবে, তখনই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং জগৎ সকল পার্থক্যের উপরে উঠে বিশুদ্ধ সতেব উৎসে পুনঃস্থাপিত হবে।

অসৎ থাকে কেন? পরম স্থিতি থেকে হওয়ার মধ্যে অধঃপতন কেন? অন্যভাবে এ প্রশ্ন দাঁড়ায় সৎ ও অসতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব নিয়ে জগতের অস্তিত্ব কেন? পরম সত্তা অদ্বিতীয় ঈশ্বর জগতের পিছনে আছেন, তার ওপারে আছেন এবং মধ্যেও আছেন, তিনিই সজীব পরমেশ্বর, জগতে তাঁর প্রীতি, তাঁর প্রসাদ দিয়ে জগৎকে ত্রাণ করেন। তবে নানা পর্যায়ের বহু-তান্ত্রিক যে সংসারকে আমরা জানি তার প্রয়োজন কি? এর উত্তরে শুধু এই বলতে পারি যে পরমেশ্বরের স্বভাবই এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করা। জগতের অস্তিত্বের কারণ আমরা বুঝতে পারি না, শুধু তার প্রকৃতির একটা ধারণা দিতে পাবি। তা হ'ল ভবিষ্ণু অবস্থায় সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব। শুদ্ধ সৎ জগদতীত আর শুদ্ধ অসৎ নিম্নতম সত্তারও নীচে। তার নীচে গেলে একেবারে শূন্য, চরম নাস্তি। আসল ভবিষ্ণু জগতে বা সংসারে সৎ ও অসৎ ভাবের বিরোধ আছে।

১। প্রোক্লুস (Proclus)-এর মতে জড় "ঈশ্বরের সন্তান" এবং তা আত্মিক জগতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

সৎ ও অসতের প্রতিক্রিয়ার প্রথম ফল ব্রহ্মাণ্ড, যার মধ্যে সমগ্র প্রকট অস্তিত্ব বিদ্যমান। সমস্ত ভবিষ্যৎ বিকাশ তার মধ্যে অঙ্কুরাবস্থায় বর্তমান। তার মধ্যেই চরম এক্ষণের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান গ্রথিত। অর্জুন সমস্ত বিশ্বরূপ এক বিরাট আকারে দেখেন। তিনি ঈশ্বরকে দেখলেন অস্তিত্বের সীমামাত্রকেই বিদীর্ণকারী রূপে, সমগ্র আকাশ ও বিশ্বকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান রূপে, যার মধ্যে বহু জগৎ জলপ্রপাতের মত ইতস্ততঃ প্রবাহিত।

যাঁরা ব্রহ্মকে নির্গুণ ও সম্পর্করহিত মনে করেন, তাঁরা স্বপ্রকাশ শক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরের ধারণাকে অবিদ্যাপ্রসূত মনে করেন।[১] যে ভাবনা থেকে অনিত্য আকারের বোধ জন্মায়, যা নিত্য সত্তার তুলনায় অবাস্তব, সেই আপাত প্রতীয়মানকে মূর্ত করার ক্ষমতাকে অবিদ্যা বলে। কিন্তু অবিদ্যা কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। ব্রহ্মের নিজেকে নানারূপে প্রকট করার ক্ষমতাকেই অবিদ্যা বলে। ভগবান বলছেন, তিনি যদিও আসলে অজ বা জন্মরহিত তবু তিনি আত্মমায়ারূপ শক্তি[২] দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন। মায়া শব্দটি মা ধাতু (আকার দেওয়া, গঠন করা) হইতে সিদ্ধ এবং পূর্বে কথাটির অর্থ ছিল রূপ দেওয়ার ক্ষমতা। যে সৃজনী শক্তিবলে ভগবান বিশ্বজগৎ গঠন করেন তাকে যোগমায়া বলে। যে সকল আকার বা বস্তু মায়া বা মায়ী ঈশ্বরের রূপদান শক্তিপ্রসূত, তারা নিজেরা অবাস্তব-এমন কোন কথা নেই।

মায়াকে কখনও কখনও মোহের উৎস বলা হয়। "ত্রিগুণ দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে এই সমগ্র সংসার আমাকে চিনতে পারে না যে আমি তাদের

১। শঙ্কর বলেন, "আত্মার স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে পরমেশ্বরের যে সকল উপাধি ও আকার আছে বলে কল্পনা করা হয়...যারা পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলা সম্ভব নয়, তাদের শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের মায়া, শক্তি বা প্রকৃতি বলা হয়।" ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, দ্বিতীয়, ১, ১৪।

২। চতুর্থ, ৬। "পরমেশ্বর যোগশক্তিবশে লীলা করতে ইচ্ছা করলেন।" ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ। (ভাগবত দশম, ২৯, ১)। ঐশী লীলা কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, কেননা ঈশ্বর নিত্যতৃপ্ত। লীলা শব্দটি এই উদ্দেশ্যহীনতার দ্যোতক, "লোকবৎ তু লীলা কৈবল্যম্", ব্রহ্মসূত্র দ্বিতীয়, ১, ৩৩। রাধা উপনিষদ বলেন যে অদ্বিতীয় ঈশ্বর পৃথিবীর নানা প্রক্রিয়ার সঙ্গে লীলারত, "একোদেবো নিত্যলীলানুরক্ত", চতুর্থ, ৩।

অতীত ও অক্ষয়"।[১] মায়াবলে আমাদের এক বিভ্রান্তিকর আংশিক চেতনা হয়, যা বাস্তবকে ভুলে প্রপঞ্চময় জগৎ অবলম্বন করে থাকে। প্রকৃতি ও তার গুণসমূহ দ্বারা ঈশ্বরের আসল সত্তা ঢাকা পড়ে যায়। সংসারকেই প্রবঞ্চনাময় বলা হয়, কেননা ঈশ্বর নিজেকে তাঁর সৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে ফেলেন। জগৎ প্রবঞ্চনা নয়, প্রবঞ্চনার উপলক্ষ মাত্র। সকল আকারকে চূর্ণ করে যবনিকার অন্তরালে যেতে পারলে আসল বস্তুর সন্ধান পাই। জগৎ ও তার নানা বিকারের ফলে ঈশ্বরের আত্মগুপ্তি বা তিরোধান, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টি দ্বারা আবরণ। সৃষ্টিকর্তার দিকে মনসংযোগ না করে মানুষ বস্তুময় জগতের দিকে আকৃষ্ট হয়। ঈশ্বরকে মহৎ প্রবঞ্চক বলে মনে হয়, কেননা তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুময় জগৎ সৃষ্টি করে আমাদের বোধকে বহির্মুখী করেন।[২] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের বাসনাতেই আত্মপ্রবঞ্চনার প্রবণতা, ঐগুলিই মানুষকে ভগবানেব দিক থেকে বিমুখ করে। জগতের জাঁকজমক আমাদের মোহমুগ্ধ করে আর আমরা তার ঐশ্বর্যের দাস হয়ে পড়ি। জগৎ বা বিষয়ীভূত প্রকৃতি বা সংসার পতিত, দাসত্বাবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন, এবং তা ক্লেশপূর্ণ কেননা অন্তর্যামী থেকে বিচ্ছিন্নতাই ক্লেশ। "এই মদীয় ঐশী মায়াকে জয় করা কঠিন" বলে যখন বলা হয়, তার অর্থ এই যে আমরা বিশ্বজগৎ ও তাব নানা প্রক্রিয়ার আবরণ সহজে ছিন্ন করতে পারি না।[৩]

কত বিভিন্ন অর্থে "মায়া" কথাটা ব্যবহার করা হয় এবং গীতায় তার কি স্থান, এখানে তার একটি হিসাব দেওয়া যাক্। ১—পরম সত্তা যদি সংসারের ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবান্বিত না হন, তা হ'লে এসব ঘটনা কি করে ঘটে সে রহস্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। গীতা রচয়িতা সে অর্থে "মায়া" কথাটা ব্যবহার করেন নি যতই তাঁর ব্যাখ্যায় এ ধরনের কথা অনেক স্থলে

১। সপ্তম, ১৩। নারদ পঞ্চরাত্র দ্রষ্টব্য "ঈশ্বর সর্বদা একক, সকলের মধ্যে ও প্রত্যেকের মধ্যে। সর্বভূত তাঁর ক্রিয়াসঞ্জাত কিন্তু তারা তাঁর মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত" দ্বিতীয়, ১, ২২। মহাভারতে বলা হয়েছে "হে নারদ, যা তুমি দেখছ, সে আমার সৃষ্ট মায়া। সৃষ্ট জগতে যে সব গুণ দেখা যায়, আমাতে সেই সব গুণ বিদ্যমান এ কথা ভেবো না।"

মায়া হ্যেষা মায়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥ শান্তিপর্ব, ৩৩৯, ৪৪।

২। কঠ উপনিষদ, চতুর্থ-১।

৩। সপ্তম, ১৪, ঈশ উপনিষদ ১৬ ও দ্রষ্টব্য।

অন্তর্নিহিত আছে বলে ধরা যায়। জগৎসংসার প্রতীয়মান হওয়ার কারণ হিসাবে অনাদি অথচ অবাস্তব এক অবিদ্যার ধারণা, গীতা রচয়িতার মনে ছিল না। ২—কথিত আছে সগুণ ঈশ্বরের নিজের মধ্যেই সৎ ও অসৎ, ব্রহ্মের অচ্যুতি আবার ভবিষ্ণুর বিকারের মিলন।[১] মায়া সেই শক্তি যার দ্বারা তিনি বিকারী প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন। সেই ঈশ্বরের শক্তি অর্থাৎ আত্মবিভূতি বা স্বভবমানতার ক্ষমতা। এই অর্থে ঈশ্বর ও মায়া পরস্পর সাপেক্ষ এবং অনাদি[২]। ব্রহ্মের এই শক্তিকেই গীতাতে মায়া আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৩] ৩—যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বজগৎকে তাঁর সত্তার দুই উপাদান, প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও চেতনা, দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাদের ঈশ্বরের মায়া (প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট) বলা হয়।[৪] ৪—ক্রমশঃ মায়া কথাটা নিকৃষ্ট প্রকৃতিকেই বোঝাতে লাগল, কেননা বলা হল যে ঈশ্বর প্রকৃতির গর্ভে পুরুষ রূপ বীজ নিক্ষেপ করে বিশ্ব উৎপাদন করলেন। ৫—যেহেতু প্রকট জগৎ সত্যকে মর্ত্ত্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথ থেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, সেই হেতু তাকে ভ্রান্তি বলা যায়।[৫] জগৎসংসার মিথ্যা কল্পনা নয়, যদিও তাকে ঐশী সম্পর্ক-রহিত যান্ত্রিক প্রকৃতিচালিত বলে মনে করে তার দিব্য সারাংশ ধরতে পারি না। তখন সে মোহের উৎস হয়ে পড়ে। দিব্যমায়া অবিদ্যামায়া হয়ে যায়। অবশ্য তা শুধু সত্যভ্রষ্ট মর্ত্যব্যক্তিদের পক্ষেই, যে ঈশ্বর সমস্ত জানেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর কাছে তাই বিদ্যামায়া। মনে হয় ভগবান মায়ারূপ বিরাট আচ্ছাদনে আবৃত হয়েছেন।[৬] যেহেতু ঈশ্বরই কারণ এবং জগৎসংসার তার ফল এবং যেহেতু সর্বত্রই ফলের অপেক্ষা কারণই বেশী বাস্তব, সেহেতু কারণ স্বরূপ ঈশ্বরকে ফলস্বরূপ জগতের অপেক্ষা বেশী সত্য বলা হয়।

১। নবম, ১৯।

২। শাণ্ডিল্য সূত্র, দ্বিতীয়, ১৩ এবং ১৫, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ চতুর্থ, ১০ দ্রষ্টব্য।

৩। অষ্টাদশ, ৬১, চতুর্থ, ৬।

৪। চতুর্থ, ১৩।

৫। সপ্তম, ২৫ এবং ১৪।

৬। যে মায়া অবিদ্যা উৎপাদন করে না, তাকে সাত্ত্বিকী মায়া বলে। যখন তা অশুদ্ধ হয়, তখনই অজ্ঞতা বা অবিদ্যার উৎপত্তি হয়। প্রথমটিতে ব্রহ্মের প্রতিফলনই ঈশ্বর, এবং দ্বিতীয়টিতে প্রতিফলন জীব বা আত্মা। এ মত পরবর্তী বেদান্তের (পঞ্চদশী, প্রথম, ১৫-১৭), গীতায় এ মতবাদ দেখা যায় না।

ভবিষ্যতার স্ববিরোধী প্রকৃতি দ্বারাই জগতের এই অপেক্ষাকৃত অবাস্তবতা সমর্থিত হয়। অভিজ্ঞতার জগতে বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব আছে এবং সত্য সকল বৈপরীত্যের উর্ধ্বে।[১]

৭। জীবাত্মা

সত্য স্বভাবত:ই অসীম, পরম ও সবপ্রকার বন্ধনমুক্ত, তার নিজস্ব সমগ্রতা ও আনন্দ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জাগতিক প্রক্রিয়ায় দ্বিত্ব ও বৈপরীত্যের উৎপত্তি হয়, তারা অবিভক্ত অসীম সত্যকে অস্পষ্ট করে তোলে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায় জাগতিক প্রক্রিয়া পাঁচটি স্তরের পদার্থ অবলম্বন করে ঘটে, অন্ন*, প্রাণ মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দ। জীবনের সৃজনী উচ্ছ্বাসে অংশগ্রহণ করে বস্তুসকল ভিতর থেকে একটা প্রেরণা পায়। মানুষ চতুর্থ স্তরে, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি পর্যায়ে। সমস্ত কর্ম তার স্বায়ত্ত নয়। সমগ্র পরিকল্পনাটির অন্তরালে যে সার্বিক সত্য বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে সে সচেতন। সে জড়, প্রাণ ও মনের বৈশিষ্ট্য জানে। জড়জগৎকে সে অনেকখানি বশ করেছে, প্রাণময় অস্তিত্ব ও মনের অস্পষ্ট ক্রিয়াও তার অনেকখানি আয়ত্তে এনেছে, কিন্তু সে এখনও সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ চেতনার অধিকারী হয় নি। জড় থেকে যেমন জীবন, জীবন থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, তেমনিই বুদ্ধিমান মানব উচ্চতর ও দিব্যজীবনে উন্নীত হবে। প্রকৃতির ঝোঁকই হচ্ছে ক্রমাগত স্বতঃ প্রসারণের দিকে। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য বা মানবের বিশ্বজনীন নিয়তি হল এই নরদেহের মাধ্যমে অমরত্বের প্রয়াসের সাধনা, এই ভৌত কাঠামোর ও বুদ্ধিগত চেতনার মধ্যে ও মাধ্যমে দিব্য জীবনলাভ।

মানুষের অন্তরতম প্রদেশে দিব্যভাবের বাসা এবং তাকে লোপ করা যায় না। সেই অন্তর্জ্যোতি গুপ্তদ্রষ্টা, স্থায়ী এবং জন্মজন্মান্তরেও অবিনশ্বর ; মৃত্যু, জরা, ও অশুদ্ধি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। জীবের সারতত্ত্ব, মানসিক ব্যক্তিত্বই, জন্মজন্মান্তরে পরিবর্তিত হয় ও বর্ধিত হয় এবং অহং যখন দিব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমঞ্জস হয় তখন তা সেই অতীন্দ্রিয় সত্তায় উন্নীত হয়, যা তার নিয়তি এবং যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ তাকে জন্মমৃত্যুর পর্যায়ক্রমিক চক্রে ঘুরতে হয়।

১। দ্বিতীয়, ৪৫, সপ্তম, ২৮, নবম, ৩৩।

* অর্থাৎ জড় পদার্থ।

প্রত্যেকের মধ্যে সকল ভৌত আকারই দেখা যায়, কেননা মানবদেহের সুসম্বদ্ধ আকৃতির মধ্যেও জড়ত্ব, সংগঠন ও পশুত্বের রূপরেখা দেখা যায়। জগৎ যে জড় জীবন ও মন নিয়ে পূর্ণ তা আমাদের মধ্যেও আছে। বহির্জগতে যে সকল শক্তি সক্রিয় আমবাও তার অংশীদার। আমাদের ধীমান স্বভাব থেকে আত্মচেতনার উৎপত্তি হয়, পবে প্রকৃতির সঙ্গে মৌলিক সংহতি থেকে মানবিক ব্যক্তিত্বের উদয় হয়। গোষ্ঠীর প্রতি সহজাত অনুগামিতা থেকে যে নিরাপত্তা বোধ আসে, তা স্থায়ী হয় না এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তা আবার উচ্চস্তরে পুনবর্জন করতে হয়। নিজস্ব সমগ্রতা দ্বারা স্বতঃ-প্রণোদিত প্রীতি ও নিঃস্বার্থ কর্মদ্বারা জগতেব সঙ্গে ঐক্য সাধন করতে হয়। প্রারম্ভিক দৃশ্যে অর্জুন প্রাকৃতিক ও সামাজিক সংসারের সম্মুখীন হয়ে নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ মনে করলেন। সামাজিক মানের কাছে বশ্যতা দ্বারা তিনি মানসিক নিরাপত্তা সিদ্ধ করতে চাইলেন না। যতদিন পর্যন্ত তিনি মনে করেছেন যে ক্ষত্রিয় হিসাবে যুদ্ধ করা তাঁর ধর্ম, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁব পদমর্যাদা ও তৎসংক্রান্ত কর্তব্যবোধ দ্বাবা আবদ্ধ, ততদিন তিনি তাঁর নিজস্ব কর্মের পূর্ণ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অচেতন। আমাদের অধিকাংশই সমাজে নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁজে পেয়ে যেন জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং একটা নিবাপত্তাবোধ অর্জন করে সমাজে একটা নিজস্ব স্থান লাভ করে। নির্দিষ্ট সীমাব মধ্যে আমরা সাধারণতঃ জীবনোন্মেষের ক্ষেত্র পেয়ে যাই এবং সামাজিক বিধি-গুলিকে শৃঙ্খল বলে মনে হয় না। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দেখা দেয় না। সামাজিক মাধ্যমের মধ্যে ছাড়া নিজের অস্তিত্বের আর কোন ধাবণা মনে ওঠে না। সামাজিক বিধির কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে অর্জুন তাঁর অসহায়তা বোধ ও উদ্বেগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন, কিন্তু তাতে তাঁর উন্নতি ব্যাহত হত। বাহিরের কর্তৃত্বের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে যে সন্তোষ ও নিরাপত্তা অর্জন করা যায় তা নিজস্ব সমগ্রতা লাভের সম্ভাবনাকে ত্যাগ করে অর্জন করতে হয়। বর্তমান যুগের সর্বতান্ত্রিকতার ন্যায় কয়েকটি মতবাদ বলে যে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে মিশে গিয়েই নিজেকে রক্ষা করে, তারা ভুলে যায় যে মানবব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ উন্মেষের জন্যই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রয়োজন। সামাজিক অনুবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন বলেই অর্জুন নিসঃঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন এবং জগতের যে আকৃতি বিপজ্জনক ও লোককে অভিভূত করে, তারই সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিসঃঙ্গতা ও উদ্বেগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার

মানবিক উপায় বশ্যতা নয়। আমাদের অন্তর্লীন আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উন্মেষ দ্বারা সংসারের সঙ্গে যে নূতন প্রকারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যেই আমাদের মুক্তি, সেখানে আমাদের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয় না। তখন আমরা নিজেদের সক্রিয় সৃজনকারী ব্যক্তি বলে বুঝতে পারি, সে জীবন বাহিরের কর্তৃত্বের অনুগামিত্বে নয়, সত্যের প্রতি স্বাধীন অনুরাগ রূপ অন্তরের বিধি পালনই তার লক্ষণ।

জীবাত্মা বিভুরই অংশ[১] যিনি ব্রহ্মের আসল রূপ, কাল্পনিক আকার নয়। জীব ঈশ্বরের সীমিত প্রকাশ। পরমেশ্বর থেকে উদ্ভূত জীবাত্মা পরমেরই অঙ্গ, তা থেকে নির্গত কোন বস্তু নয়। জীব যে প্রকৃষ্ট ভাবকে আদর্শ বলে মনে করে, তা যেন তার জন্মদাতা পিতা। আত্মার সারসত্তা দিব্যধী থেকে উদ্ভূত এবং যে দিব্য সত্তা তার জনক ও সদাসাথি। তাকে দর্শনের কল্যাণেই জীবনে তার প্রকাশ। তদ্দ্বারা আকর্ষিত ইন্দ্রিয় ও মনের অনুবৃত্তি[২] দৈবী ধাঁচ দ্বারা তার স্বাতন্ত্র নির্ধারিত। মানসিক জৈব-ভৌতিক খোলসের সীমিত অনুবৃত্তির মধ্যে সার্বিক সত্তা আকার গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি সর্বতঃ আর এক ব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন হয় না, কোন জীবনই আর একটির পুনরাবৃত্তি নয়, অথচ সকলের মধ্যেই একই ধাঁচ। মানব ব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণ যে অহং, তার সারমর্ম একটা সৃজনী ঐক্য, আন্তরিক সংকল্প, একটা পরিকল্পনা যা ক্রমশঃ আঙ্গিক ঐক্যের আকার গ্রহণ করে। আমাদের লক্ষ্য যা, জীবনও তাই। প্রাতিস্বিক যে আকারই গ্রহণ করুক তা স্থায়ী নয় কেননা সে সর্বদা নিজেকে অতিক্রম করতে চায় এবং সেই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যত দিন না হতে থাকা হওয়াতে পর্যবসিত হয়। জীবেরা ঈশ্বরের সত্তার বিশিষ্ট জঙ্গমতা। অনাত্ম ও তার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে মিথ্যা অভিন্নতা বোধে অহং যখন বিলুপ্ত, তখন জীব বদ্ধ কিন্তু যখন যথাযুক্ত বোধোন্মেষ দ্বারা সে আত্ম ও অনাত্মের আসল প্রকৃতি বুঝতে পারে এবং অনাত্মীয় যন্ত্রগুলির উপর সম্পূর্ণ আত্মিক আলোকসম্পাতে সক্ষম হয়, তখন সে মুক্তিলাভ করে। বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহারেই সেই উপলব্ধি সম্ভব হয়।

১। পঞ্চদশ, ৭। আত্মার এই ঐশী সারমর্মের অনেক নাম, শিখর, ভিত্তি, অতল, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নি, অন্তরালোক।

২। ত্রয়োদশ, ২১।

মানুষের সমস্যা নিজ ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতায় সিদ্ধ হওয়া, দেহ ও আত্মার সমস্ত শক্তি যাতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই প্রকার দিব্য অস্তিত্বের বিকাশ সাধন করা। আত্মাই এই অখণ্ড জীবনের সৃষ্টি করতে পারে। যে দেহ মানুষকে প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করে, তার সঙ্গে আত্মার চূড়ান্ত কোন পার্থক্য নেই। দেকার্তে যে মৌলিক অর্থে এই পার্থক্যের ধারণা করেছেন, তা ঠিক নয়। আত্মিক জীবন দৈহিক জীবনে অনুপ্রবিষ্ট ও ব্যাপ্ত, যেমন আত্মা দৈহিক জীবন দ্বারা প্রভাবিত। মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে একটা সজীব ঐক্য আছে · আসল দ্বিত্ব আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে, স্বাধীনতা ও প্রয়োজনের মধ্যে। অখণ্ড ব্যক্তিত্বে আত্মা প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছে, স্বাধীনতা প্রয়োজনকে দমন করেছে। গীতা ব্রহ্মের এই দুই দিকের বিচার করে বলেছেন যে আমরা প্রকৃতির মধ্যে পরমার্থের সঞ্চরণ করতে পারি, তার মধ্যে আর এক গুণ অর্পণ করতে পারি। প্রকৃতিকে চূর্ণ বা ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই।

ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য বনাম নিয়তিবাদের সমস্যা প্রাতিস্বিক মানবের সম্বন্ধেই উঠতে পারে। পরমের সম্বন্ধে প্রশ্নটি ওঠে না, কেননা তিনি সকল বৈপরীত্যের উর্ধ্বে, আর মানবেতর জীব ও উদ্ভিদদেব সম্বন্ধেও ঐ প্রশ্নের কোন অর্থ নেই। মানুষ যদি সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে চালিত হত, তার বাসনা ও মীমাংসা যদি বংশগতি ও প্রতিবেশের ফল হ'ত, তা হ'লে তার কর্ম সম্বন্ধে নৈতিক বিচার সকলও অপ্রাসঙ্গিক হত। সিংহের হিংস্রতার জন্য আমরা তার নিন্দা করি না, আর মেষশাবকের মৃদু স্বভাবের জন্য তার প্রশংসা করি না। স্বাধীন ভাবে কর্ম করার ক্ষমতা মানুষের আছে।[১] তাই আচার্য সমস্ত জীবন দর্শন ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে নিজ ইচ্ছামত কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[২] গীতাব সমস্ত শিক্ষা মানুষকে কল্যাণের পথ বেছে নিতে বলছে এবং সচেতন প্রকাশ দ্বারা অভীষ্ট লাভ করতে বলছে। কিন্তু এই বেছে নেবার স্বাধীনতার পথে অনেক বাধা আছে।

মানবসত্তা জটিল ও বহুমাত্রিক। তার মধ্যে জড়, জীবন, চেতনা, বুদ্ধি ও দিব্য স্ফুলিঙ্গ রূপ বিভিন্ন উপাদান আছে। সে স্বাধীন যখন সে উচ্চতম

১। স্বতন্ত্রঃ কর্তা—পাণিনি।

২। অষ্টাদশ, ৬৩।

স্তর থেকে কাজ করতে পারে, এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্য উপাদানগুলিকে ব্যবহার করতে পারে। যখন সে বিষয়গত প্রকৃতির স্তর থেকে কাজ করে যখন সে অনাত্মের সঙ্গে নিজের প্রভেদ বুঝতে পারে না, তখন সে প্রকৃতির যান্ত্রিকতার দাস হয়ে পড়ে। তবু, এমন কি যখন সে ভুল করে নিজেকে বস্তুময় জগতের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে, যখন সে নিজেকে প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অধীন বলে বিবেচনা করে, তখনও তার আশা আছে কেননা একেশ্বর সত্তার সকল স্তরেই সক্রিয়। জড়বস্তুও ব্রহ্মেরই এক অভিব্যক্তি। প্রকৃতির নিম্নতম স্তরেও একটা স্বতঃস্ফূর্তি ও সৃজনশক্তি আছে, যার শুধু যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের সত্তার প্রত্যেক স্তরের নিজস্ব চেতনা আছে, বহির্স্তরের চিন্তা আছে, অনুভূতি, চিন্তা ও ক্রিয়ার অভ্যস্ত পন্থা আছে। অহং যেন তার অস্পষ্ট ও সীমাবদ্ধ চেতনা বজায় রাখার চেষ্টা না করে, কেননা সে চেতনা তার প্রকৃত স্বভাবের বিকৃতি। যখন আমরা ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনি তখন আত্মার শিখা উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে জ্বলতে থাকে "নিবাত স্থানে প্রদীপের মত"। চেতনার আলোক তার নিজ প্রকৃতিতে বিদ্যমান এবং যে বুদ্ধির মধ্যে সেই আলোক প্রতিফলিত হয়, তার দ্বারা নানা পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার স্রোত চালিত প্রায়োগজ সত্তা নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন আমরা প্রাকৃতিক লীলার ঊর্ধ্বে উঠি এবং সৃজনীশক্তির উৎস আসল আত্মাকে দেখতে পাই; ইতস্ততঃ তাড়িত বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘুচে যায় এবং আমরা আর প্রকৃতির অসহায় যন্ত্র থাকি না। আমরা নীচের জগতে থেকেও স্বাধীনভাবে উচ্চতর জগতের অংশীদার হতে পারি। প্রকৃতি নিয়তি চালিত সংস্থা বটে কিন্তু একেবারে বহিপ্রভাবমুক্ত নয়। আত্মিকশক্তি তার প্রাচীর অতিক্রম করে তার গতি পরিবর্তিত করতে পারে। আত্মের প্রত্যেক ক্রিয়া সৃজনধর্মী আর অনাত্মের প্রত্যেক কর্মই আসলে নিষ্ক্রিয়। আমাদের অন্তর্লোকে আমরা আমাদের গভীরতম সত্তায়, মৌলিক সত্যের সম্মুখীন হই। যে অনাত্মিক ক্ষেত্রে জৈবিক ও সামাজিক বংশগতি খাটে সেখানেই কর্মফলের বিধি প্রচলিত কিন্তু বিষয়ী আত্মের মধ্যে মুক্তির, প্রকৃতির নিয়তিবাদের উপর জয়ের, সংসারের বাধ্যতা অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়ী মানুষের বিষয়রূপ মানুষকে আয়ত্তে আনা উচিত। বিষয় বাহিরের নিয়তির দ্যোতক, বিষয়ী মানে মুক্তি ও নিয়তি-নিরপেক্ষতা। স্বয়ংবদ্ধ এবং মানসিক ও সামাজিকভাবে স্বয়ংক্রিয় অহং আসল

বিষয়ীর বিকৃতি। আত্মার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে কর্মফলকে অতিক্রম করা যায়। গীতায় অনেক স্থলে[১] বলা হয়েছে অতিপ্রাকৃত ও প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে মৌলিক দ্বিত্ব নেই। মানুষ যে সব জাগতিক শক্তির অধীন, সেগুলি নিকৃষ্ট প্রকৃতির অঙ্গ। কিন্তু তার আত্মা প্রকৃতির নিগড় ভেঙ্গে ফেলে দিব্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে। অপরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতাই আমাদের বন্ধন। তার উর্ধ্বে উঠতে পারলেই আমাদের স্বভাবকে আধ্যাত্মিক অবতরণের ক্ষেত্র করে তুলতে পারি। কষ্ট সহ্য করে এবং বিশেষ প্রয়াস দ্বারা কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে বেছে নেবার মানুষের যে স্বাধীনতা আছে, তা থেকে আরও প্রকৃষ্ট স্বাধীনতায় সে পৌঁছতে পারে, যার দ্বারা কল্যাণকে অবিচলিত ভাবে অবলম্বন করে থাকা যায়। আত্মমুখী আন্তরিক সত্তায় প্রত্যাবর্তনই মুক্তি, আর বিষয়গত জগৎ, প্রয়োজন ও নির্ভরশীলতার দাসত্বই বন্ধন।

প্রকৃতি বা সমাজ কেউই আমাদের সম্মতি ছাড়া আমাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে পারে না। ভগবানও মানুষের সম্বন্ধে সমীহ করে কর্মে প্রবৃত্ত হন। তিনি আমাদের সম্মতি আদায় করার চেষ্টা করেন, কখনও জবরদস্তি করেন না। মানবিক ব্যক্তিত্বের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যার দ্বারা তাব উন্মেষের সম্বন্ধে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র সীমিত। জগৎ কোন একটা পূর্ববিহিত পরিকল্পনা যান্ত্রিকভাবে সাধন করছে না। সৃষ্টির লক্ষ্য হ'ল এমন জীবাত্মার সৃষ্টি, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বেচ্ছায় পালন করবে। আমাদের মনোবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বিভ্রান্তি ও বিচলনকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, প্রাকৃতিক স্রোতের উর্ধ্বে উঠতে হবে, আমাদের আচরণকে বুদ্ধি দ্বারা চালিত করতে হবে, নচেৎ আমরা "পৃথিবীতে মানবের শত্রু কামনা"র[২] দাস হয়ে পড়ব। প্রাতিস্বিকের নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং যেভাবে সেই স্বাধীনতা আচরণে প্রকাশ পায়, গীতায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষের প্রয়াস, তার ব্যর্থতাবোধ ও আত্মাভিযোগকে মর্ত্য মনের ভ্রান্তি বা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার দশা সমূহমাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তা হলে জীবনের নৈতিক প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করা হয়। অনন্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

১। সপ্তম—৫।

২। তৃতীয়, ৩৭, ষষ্ঠ— ৫-৬।

অর্জুন যখন ভয় ও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং যখন তিনি ক্ষমা চান, তখন তিনি নাটক করছিলেন না, সত্যই তাঁর পক্ষে সে একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত।

ভবিষ্যৎ নিয়তি প্রকৃতি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। কর্ম নিয়তি নয়, একটা শর্ত মাত্র। কোন কার্যসাধনে যে পাঁচটি উৎপাদক প্রয়োজন তার অন্যতম। সে পাঁচটি হল, অবস্থান অর্থাৎ যে ভিত্তির উপর বা কেন্দ্র থেকে আমরা কাজ করি, কর্তৃ বা যিনি কাজ করেন, কারণ অর্থাৎ প্রকৃতির যন্ত্রাবলী বা সহায়, চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ ভাগ্য।[1] শেষেরটি হ'ল সেই শক্তি বা শক্তিগণ, যা মানবীয় নয়, বিশ্বজাগতিক, যা অন্তরালে থেকে কার্যকে পরিবর্তিত করে এবং ক্রিয়া ও তার পুরস্কার রূপে কর্মফল বিতরণ করে। প্রাকৃতিক গঠনে যে অংশ একেবারে অবশ্যম্ভাবী, সংযম দ্বারা যাকে নিরস্ত করা যায় না, আর যে অংশকে আয়ত্তে এনে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় করা যায়, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের জীবনে এমন উপাদান আছে যার নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলি আমাদের আয়ত্তে আনার কোন উপায় নেই। কেমন করে, কখন, কোথায় ও জীবনের কি স্তরে আমরা জন্মগ্রহণ করব, তার উপর আমাদের হাত নেই। অবশ্য পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করলে, একেও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। পূর্বেকার কর্ম দ্বারাই আমাদের কুল, বংশগতি ও প্রতিবেশ নির্ধারিত হয়। কিন্তু ইহজন্মের দিক থেকে যদি দেখি তো বুঝি যে আমাদের জাতি, কুল, পিতামাতা বা সামাজিক মর্যাদা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করা হয় না। কিন্তু এই পরিসীমার মধ্যে আমাদের বেছে নেবার স্বাধীনতা আছে। জীবন তাসের ব্রিজ খেলার মত। খেলাটা আমরা উদ্ভাবনও করি নি আর তাসের আকারপ্রকারও আমরা স্থির করি নি। নিয়মকানুনও অন্যে বেঁধে দিয়েছে, আর কার ভাগ্যে কি কি তাস পড়বে তাও খেলোয়াড়রা স্থির করতে পারে না। অথচ যে তাস আমাদের বণ্টন করে দেওয়া হয়, ভাল হোক বা মন্দ হোক তাই নিয়েই খেলতে হবে। এ পর্যন্ত খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ নিয়তির অধীন। তা সত্ত্বেও খেলার ভাল মন্দ আছে। দক্ষ খেলোয়াড় খারাপ হাত পেয়েও গেম জিততে পারে আর খারাপ খেলোয়াড় ভাল হাত পেয়েও সব

১। অষ্টাদশ, ১৪।

গোলমাল করে ফেলে। আমাদের জীবনও বাধ্যতা ও স্বাধীনতা, দৈব ও নির্বাচনের মিশ্রণ। যথোপযুক্ত নিবাচন দ্বারা আমরা সমস্ত উপাদানগুলিকে স্থিরভাবে নিয়ন্ত্রণ কবে, প্রাকৃতিক নিয়তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি। জড়পদার্থের বিচলন, উদ্ভিদসমূহের বৃদ্ধি, জীবজন্তুর আচরণ প্রায় সম্পূর্ণ পরবশ, কিন্তু মানুষেব বুদ্ধি আছে বলে সে জাগতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সচেতন সহযোগিতা কবতে পারে। কোন কোন কাজকে সে পছন্দ বা অপছন্দ করতে পারে, সম্মতি দিতেও পাবে, নাও দিতে পারে। সে যদি নিজ বুদ্ধির প্রয়োগ না করে তা হলে বুঝতে হবে যে সে তাব মানবতার বিবোধী আচরণ করছে। সে যদি অন্ধের মত নিজ প্রবৃত্তি ও আবেগচালিত হয়, তাহলে তার মানুষের থেকে পশুব সঙ্গে বেশী সাদৃশ্য। মানুষ হ'লে তাকে ন্যায়সঙ্গত কার্য করতে হবে।

আমাদের কতকগুলি কাজ নামমাত্র আমাদেব নিজস্ব। স্বতঃস্ফূর্তি শুধু আপাতদৃষ্টিতে। সংবেশিত অবস্থায় আমাদের যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়, সেগুলি আমরা অনেক সময় পালন কবে থাকি। আমাদের বিশ্বাস থাকে যে আমরা স্বেচ্ছায় চিন্তা কবছি, অনুভব করছি ও সংকল্প করছি কিন্তু আসলে আমরা সংবিষ্ট অবস্থায় যে ইঙ্গিত পেয়েছি সেগুলিকেই ব্যক্ত করছি। আমাদের অনেক ক্রিয়াই সংবিষ্ট অবস্থানির্দিষ্ট ক্রিয়ার মত, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। সবচেয়ে সাম্প্রতিক মতামতের পুনরাবৃত্তি করে ভাবি যে সেগুলি বুঝি আমাদের নিজ চিন্তাপ্রসূত। নিজ নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তার দ্বারা বাধ্য হয়ে যেসব কাজ আমরা করি তাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলা চলে না। সে হবে সামগ্রিক আত্মার মুক্ত প্রকাশ। কর্তাকে নিজের কাছে স্বচ্ছ হতে হবে, স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃজনধর্মী ক্রিয়া তখনই সম্ভব, যখন ব্যক্তির বিভিন্ন উপাদান মৌলিক অখণ্ডতা লাভ করে। যে সাত্ত্বিক প্রকৃতি বস্তুর মধ্যে সত্যের সন্ধান করে এবং ন্যায্য কার্যবিধি পালন করার চেষ্টা করে, মানুষের উচিত তাই দিয়ে তার রজঃ ও তমঃ গুণকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু সত্ত্বগুণ দ্বারা পরিচালিত হলেও আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত নই। রজঃ ও তমের ন্যায় সত্ত্বও বন্ধন। সত্য ও সাধুতার বাসনা মহত্তর। অহং বোধ তখনও সক্রিয়। অহং এর উর্ধ্বে উঠে, অহং যে পরমাত্মার অন্যতম প্রকাশ মাত্র, সেই পরমাত্মায় উন্নীত হতে হবে। যখন আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে পরমসত্তার সঙ্গে এক করে নিতে পারি তখনই সত্ত্ব, রজ, তম

গুণ-বিশিষ্ট প্রকৃতির উর্ধ্বে উঠে ত্রিগুণাতীত[১] অবস্থায় পৌছে জগতের বন্ধন থেকে মোক্ষলাভ করি।

৮। যোগশাস্ত্র

ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক পদ্ধতির চিন্তাধারাই চরম আদর্শে পৌঁছবার ব্যবহারিক রীতির নির্দেশ দিয়েছে। চিন্তা দিয়ে আমরা শুরু করি কিন্তু লক্ষ্য থাকে চিন্তার উর্ধ্বে উঠে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করা যাতে পথনির্দেশ স্পষ্ট হয়। দর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শুধু যে আমরা অধিবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলিই পাই তা নয়, পারমার্থিক মার্গে অগ্রসব হবাব উপায়ও পাই। তর্ক উঠতে পারে যে মানুষ যদি ঈশ্বরের অংশই হয় তা'হলে তাব পরিত্রাণের ত কোন দরকার নেই, শুধু তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হলেই ত চলবে। কেউ যদি মনে কবে যে পাপ করার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছে তাহলে তার এমন একটা কৌশল জানা দরকাব যাতে তার মনে পড়ে যে আসলে সে ভগবানেরই অংশ, এর বিপরীত কোন অনুভূতি ভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু এ চেতনা শুধু বুদ্ধির ক্ষেত্রে হলে চলবে না, মানুষের সমগ্র ও অখণ্ড প্রকৃতির সংস্কার প্রয়োজন। (ভগবদ্‌গীতা শুধু অধিবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) নয়, পাঠ বিনয়ও (যোগশাস্ত্র) বটে। যোগ শব্দটি যুজ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, তার মানে যোজনা করা। যোগ আমাদের মানসিক শক্তিগুলিকে সংহত করে, সামঞ্জস্য বিধান করে, তাকে উন্নত করে।[২] আমাদের অস্মিতাকে তীব্রতম ভাবে গাঢ় করে, আমাদের শক্তিকে যুক্ত ও সংহত করতে পারলে আমরা অহং-এর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ভেদ করে লোকোত্তর অস্মিতায় পৌঁছবার পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হই। আত্মা কারাবন্ধন ছিন্ন করে, তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, নিজের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছয়।

গীতায় আমরা বৃহৎ, সহজগম্য ও বহুমুখী এক ব্যাপক যোগশাস্ত্র পাই, তাতে আত্মোন্মেষের নানা দশা ও দিব্যাবস্থায় উন্নয়নের পন্থা পাওয়া যায়। যে আন্তরিক বিনয়েব প্রয়োগে আত্মার মুক্তি ঘটে ও মানবজাতির লক্ষ্য

১। চতুর্দশ, ২১।

২। কথাটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়: যুজ্যতে এতদ্‌ ইতি যোগ; যুজ্যতে অনেন ইতি যোগ;—যুজ্যতে তস্মিন্নিতি যোগঃ।

ও ঐক্যের একটা নূতন ধারণা জন্মায়, তারই বিশেষ প্রয়োগ বিভিন্ন যোগের মধ্যে পাওয়া যায়। এই সবের জন্য যা কিছু অভ্যাস প্রয়োজন তাকেই যোগ বলে, যেমন জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ।

মানবীয় স্তরে পরোৎকর্ষ লাভ করতে হলে সচেতন প্রয়াস দ্বারাই তা হতে পারে। আমাদের মধ্যে ভগবানের যে প্রতিকৃতি আছে তার ক্রিয়ায় আমাদের মধ্যে একটা অপ্রাচুর্যের বোধ জন্মায়। যে সব জিনিস পেলে মানুষ সুখী হয় তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ, তার ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা বোধ মানুষের মনে থেকেই যায়। যারা ভাসা-ভাসা জীবন যাপন করে তারা হয়ত আত্মপীড়া বা কষ্ট অনুভব করে না এবং নিজের সত্যকার কল্যাণের জন্য প্রয়াসের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তারা মানবাকারে পশু ("পুরুষ পশু") এবং জন্তুদের মতই তারা জন্মায়, বড় হয়, সঙ্গম করে, সন্তানের জন্ম দেয়, তার পর বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যারা মানবিক মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তারা বিসংবাদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং শান্তি ও সামঞ্জস্যের তত্ত্বানুসন্ধান করে।

পরোৎকর্ষ ও শান্তিকামী এই ধরনের মানবতার নিদর্শন অর্জুনের মধ্যে পাই কিন্তু গীতার প্রারম্ভিক ভাগে আমরা দেখি যে তাঁর মন অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাঁর প্রত্যয়ে অস্থিরতা এবং তাঁর সমগ্র চেতনা মোহগ্রস্ত। জীবনের উদ্বেগ-সকল তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তির একটা সময় আসে (প্রকৃতির কোন তাড়া নেই) যখন তার নিজের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়, যখন সে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যায়, যখন আলোকের একটি শিখার, দিব্যের একটি আভাসের জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। যখন অবিশ্বাস, অভক্তি, জীবনের প্রতি ঘৃণা এবং অন্ধ হতাশা দ্বারা সে আক্রান্ত হয়, তখন ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া তার পরিত্রাণের পথ নেই। যে দিব্য সত্যে সকল মানুষের অবাধ অধিকার, তা যদি অল্প কয়জনেই আয়ত্ত করতে পেরে থাকে তবে বুঝতে হবে যে অতি অল্প লোকেই তার উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত। সৃষ্টির অন্তরে যে রহস্য লুকিয়ে আছে, সেই পরোৎকর্ষের ক্রিয়াতেই অপ্রাচুর্য, অনুর্বরতা এবং আবর্জনার বোধ আসে। ভগবদ্দর্শনের অদৃশ্য আবেগ থেকে যে ব্যাকুলতার উৎপত্তি তাই থেকেই মহান ভাবতান্ত্রিকতার এবং মানবিক পরিপূর্ণতা লাভের প্রয়াসের উদ্ভব হয়। নিজেকে অতিক্রম করার যে

অনন্ত শক্তি আমাদের আছে তাতেই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি প্রকট হয়।[১]

৯। জ্ঞান বা মোক্ষদায়িনী প্রজ্ঞা

পরোৎকর্ষের লক্ষ্যে কি করে পৌঁছনো যায়? সংসার ঐতিহাসিক পরিণামিতা। এক অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থায় পরিবর্তনের ঐহিক শোভাযাত্রা। কর্মদ্বারাই সংসার গতিশীল। পৃথিবী যে শুধুই জোয়ার ভাঁটা, ক্রমাগত হওয়া, সে কর্মের ফল। মনুষ্যস্তরে কর্মের উৎস বাসনা বা কাম। কামনার মূল কারণ অবিদ্যা, অর্থাৎ বস্তুদের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর বিশ্বাস, তাকে নিত্য ও সত্য বলে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যেই বাসনার মূল। যতদিন অজ্ঞতা থাকবে ততদিন ভবিষ্ণুতার দুষ্ট চক্র থেকে পরিত্রাণ নেই। কামনাকে নূতনতর কামনা দিয়ে নিরস্ত করা যায় না, কর্মকে আরও বেশী কর্ম দ্বারা শোধন করা যায় না। নিত্যকে অনিত্য উপায়ে অর্জন করা যায় না।[২] আমাদের বাসনা ভালই হোক বা মন্দই হোক, বন্ধনের প্রশ্ন থেকেই যায়। শেকল সোনার তৈরী কি লোহার তৈরী তাতে কিছু আসে যায় না। যে অজ্ঞতা থেকে মূঢ় বাসনার উদ্ভব, যে অজ্ঞতা থেকে আমাদের বিমোহিত কর্মের উৎপত্তি, তাকে না দূর করলে আমাদের বন্ধন ঘুচবে না। অবিদ্যা-কাম-কর্ম রূপ শৃঙ্খল থেকে মুক্তির উপায় বিদ্যা বা প্রজ্ঞা।

তত্ত্বজ্ঞান বা অভ্রান্ত বিশ্বাস আর প্রজ্ঞা এক নয়, কেননা বোঝবার ভুল থেকে অজ্ঞতা আসে না। অজ্ঞতা পারমার্থিক অন্ধত্ব। তাকে দূর করতে হলে আমাদের আত্মার ময়লা সাফ করতে হবে এবং পারমার্থিক দৃষ্টি উন্মোচিত করতে হবে। প্রবৃত্তির অগ্নি ও বাসনার ঝঞ্ঝাকে দমন করতে হবে।[৩] অনিশ্চিত ও অনির্ভরযোগ্য মনকে স্থির করতে হবে যাতে পরাজ্ঞান

১। "মানুষের মনে এক পবিত্র ভাব আছে, যার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন নাম, কিন্তু সেটি ঈশ্বর থেকেই প্রসূত এবং পবিত্র। সে গভীর ও অন্তর্মুখী, সে ধর্মের কোন বিশেষ আকারে আবদ্ধ নয়, এবং কোন ধর্মেই তার অভাব নেই, তার মধ্যে অন্তর সম্পূর্ণ অকপট। যাদের মধ্যেই সেই ভাব অঙ্কুরিত হয়, এবং বাড়ে, তারা যে ভাবেই হোক, তারা সর্বোত্তম অর্থে, পরস্পরের ভ্রাতা।" জন উলম্যান, আমেরিকান কোয়েকার সাধু।

২। কঠোপনিষদ, দ্বিতীয়, ১০। ৩। চতুর্থ, ৩৯।

তাতে প্রতিফলিত হতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে, বুদ্ধিজাত সন্দেহ দ্বারা অবিচলিত এমন দৃঢ় শ্রদ্ধার অধিকারী হতে হবে এবং বুদ্ধিকে উপযুক্ত রূপে প্রয়োগের শিক্ষা দিতে হবে।[১]

প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসে। তাকে আরব্ধ করার প্রতিবন্ধক যখনই দূর হয় তখনই সে অভিজ্ঞতা আপনি ঘটে। সাধকের প্রয়াস হবে সেই সব প্রতিবন্ধক, অবিদ্যাজনিত অস্পষ্টতাকে দূর করা। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এই প্রজ্ঞা সর্বদাই আছে, তাকে আহরণ করতে হয় না শুধু উন্মোচন করতে হয়। আমাদের ইচ্ছা ও কুসংস্কার সমর্থিত আকস্মিক মর্মভেদ দ্বারা সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করা যায় না। মন ও সংকল্পকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ও অহংকে বহিষ্কৃত করলে তবেই জ্ঞানালোকের সম্পাত হয়, যাতে আমরা সত্যকার অস্তিত্বে উপনীত হতে পারি। সেই হল অনন্ত জীবন, আমাদের জ্ঞান ও প্রেমশক্তির সম্পূর্ণ সিদ্ধি, বোয়েটিউসের (Boethius) ভাষায় "এক মুহূর্তে অসীম জীবনকে এক সঙ্গে ও সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনা।"

জ্ঞান ও অজ্ঞান, আলোক ও অন্ধকারের মতই পরস্পরবিরোধী।[২] জ্ঞানের উদয় হলেই অজ্ঞতার বিনাশ আর অকল্যাণের মূলোৎপাটন। মুক্ত আত্মা জগৎকে বশ করে। জয় করার বা সৃজন কবার কিছু থাকে না। কর্ম আর বাঁধতে পারে না। এই জ্ঞান লাভ করলে আমরা ব্রহ্মে লীন হই।[৩] এ সংবিৎ ভাবাত্মক নয়। এ তাই "যা দিয়ে তুমি সমস্ত সত্তাকে নিজের মধ্যে, পরে আমার মধ্যে দেখতে পাবে।" খাঁটি মানুষ প্রিয়া রমণীকে যে অনুরাগ অর্পণ করে সেই রূপ অনুরাগের সঙ্গেই পরোৎকর্ষের আদর্শের অনুসরণ করে।[৪]

১০। জ্ঞানমার্গ

পরোৎকর্ষের লক্ষ্য মোক্ষদায়ী সত্যে পৌঁছবার তিন বিভিন্ন পথ আছে: সত্যকে জেনে (জ্ঞান) বা পরমপুরুষের উপর অনুরাগ ও প্রেম (ভক্তি)

১। দ্বিতীয়, ৪৪।

২। স্বরূপজ্ঞান বা সত্য সম্বন্ধে চেতনা সর্বদাই আছে। অদ্বৈত বেদান্তমতে তার নিত্য উপস্থিতি দ্বারা অজ্ঞান দূর হয় না। বরং তা প্রকট হয়ে পড়ে। সাক্ষাৎকার রূপ প্রজ্ঞা একটা বৃত্তি এবং অন্য অন্য জ্ঞানের ন্যায়ই এক পরিণতি।

৩। পঞ্চম, ২০। ৪। মুক্তিকান্তা।

দ্বারা অথবা দিব্যোদ্দেশ্যে নিজের সংকল্পকে নিয়োজিত করে (কর্ম)। তাত্ত্বিক, ভাবাবেগযুক্ত ও ব্যবহারিক দিকের উপর প্রাধান্য এই তিনটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়, কেউ চিন্তাশীল, কেউ হৃদয়াবেগ বশীভূত, কেউ কর্মচঞ্চল, কিন্তু কোন মানুষের মধ্যে একটির প্রাধান্য থাকলে, অন্য দুটি একেবারেই থাকবে না, এমন নয়। অন্তিমে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম মিশে যায়। ঈশ্বর নিজে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। জ্ঞানান্বেষীর কাছে তিনি শাশ্বত জ্যোতি, মধ্যদিনের সূর্যের মত নির্মল ও ভাস্বর, ছায়ালেশহীন, সদ্‌-গুণাভিলাষীর কাছে তিনি সনাতন ন্যায়নিষ্ঠা, অবিচল ও অপক্ষপাত, ভাববিলাসীর কাছে তিনি অনন্ত প্রেম এবং পবিত্রসুন্দর। ঈশ্বরের মধ্যে যেমন এই বিভিন্ন গুণের সম্মেলন, তেমনি মানুষও নানামুখী আত্মিক জীবনে অখণ্ডতা চায়। জ্ঞান, সংকল্প ও অনুভূতিকে যুক্তি দ্বারা পৃথকভাবে ধারণা করা যায় কিন্তু বাস্তব জীবনে ও মনের ঐক্যে তাদের আলাদা করা যায় না। তারা আত্মার একই প্রেরণার বিভিন্ন দৃশ্য।[১]

পরোৎকর্ষলাভের বুদ্ধিচালিত পথরূপ যে জ্ঞান তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাসংক্রান্ত জ্ঞানের পার্থক্য আছে। সত্যের আত্মিক মর্মগ্রহণ সেবাও নয়, ভক্তিও নয়, এমন কি জ্ঞানও নয় যদিও ওগুলি অগ্রসর হওয়াতে আমাদের সহায়তা করে। জ্ঞান কথাটা উৎকর্ষের লক্ষ্য ও তার পথ, সত্যের উপলব্ধি

১। প্রটিনাস বলছেন,'ভিন্ন ভিন্ন পথে একই লক্ষ্যে (আধ্যাত্মিক মর্মগ্রহণ) পৌঁছানো যায়; সৌন্দর্যপ্রীতি যা কবিদের অনুপ্রাণিত করে, এককের প্রতি অনুরাগ এবং বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বগতি যা দার্শনিকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়; সেই ভক্তি ও প্রার্থনা যার দ্বারা কোন ভক্ত ও উৎসাহী আত্মা আত্মোৎকর্ষের উদ্দেশ্যে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করে। বাস্তবতা ও তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে, যেখানে আমরা অসীমের সাক্ষাৎ ভাবে সম্মুখীন হই, যে অসীম আত্মার গভীর প্রদেশ থেকে আলোকসম্পাত করে, সেখানে পৌঁছবার এইগুলি মহাপথ।" ফ্লাক্‌সাসের কাছে পত্রাবলী (Letter to Flaccus)।

মধুসূদনের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরলাভের জন্য বেদের তিন কাণ্ড আছে, তাদের বিষয় যথাক্রমে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান; গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও এই তিন বিভাগ আছে।

সচ্চিদানন্দরূপং তৎপূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্,
যৎ প্রাপ্তয়ে সমারব্ধা বেদাঃ কাণ্ডত্রয়াত্মিকাঃ'
কর্মোপাস্তিস্তথা জ্ঞানমিতি কাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ,
তদ্রূপাষ্টাদশাধ্যায়ৈর্গীতা কাণ্ডত্রয়াত্মিকা।

এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞালাভের পরিকল্পনা, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন অন্য পথের চেয়ে বুদ্ধির পথ উৎকৃষ্ট।

শুদ্ধ ও লোকাতীত জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক বিদ্যা পৃথক পদার্থ যদিও পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। যে উচ্চতর অব্যয় সত্যের প্রত্যেক বাস্তব সত্তা অংশীদার তারই প্রতিফলন বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বিশেষ বস্তুশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক বা বিশ্লেষণী জ্ঞান আমাদের গভীরতর জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করে। বিজ্ঞানের আংশিক সত্য পারমার্থিক সমগ্র সত্য থেকে পৃথক। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, সে মনের পীড়াদায়ক অন্ধকার দূর করে, তার নিজস্ব জগতের অসম্পূর্ণতা ব্যক্ত করে এবং মনকে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের অস্তিত্বের জন্য প্রস্তুত করে। সত্যকে জানতে হলে আত্মার পরিবর্তন প্রয়োজন, পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ দরকার। অর্জুন খালি চোখে সত্যের সন্ধান পাচ্ছিলেন না বলে, তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিতে হ'ল।

জিজ্ঞাসা বা নিঃস্বার্থ জ্ঞানানুসন্ধিৎসা দ্বারা উচ্চতর আত্মার খোঁজে নিজেকে উৎসর্গ করে, সত্তার প্রকৃষ্ট স্তরে ওঠা যায়। তার দ্বারা মানুষ তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে অস্তিত্বের সার্বিক তত্ত্বগুলি অনুধাবন করতে করতে নিজের কথা ভুলে যায়। শক্তি বা যশোলোভে জ্ঞানচর্চায় বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সত্যের সন্ধানই তার আসল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

গীতায় যে পরাতাত্ত্বিক সূত্র স্বীকৃতি পেয়েছে তা সাংখ্যদর্শনই, যদিও কিছু মৌলিক পরিবর্তন করা হয়েছে। ঈশ্বরের উপর গভীর শ্রদ্ধা এবং মোক্ষলাভের উপর বিশ্বাস রাখতে হলে তিনটি সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়, যে আত্মা মুক্তি চায়, যে নিগড়ে সে বদ্ধ আছে এবং যার উন্মোচন প্রয়োজন, ও ঈশ্বর, যিনি আমাদের বন্ধন উন্মোচন করতে পারেন। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ (আত্ম) ও প্রকৃতি (অনাত্ম) সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু গীতাতে উভয়কেই ঈশ্বরের অধীন বলে দেখানো হয়েছে। আত্মা বহু এবং চিরকালই স্বতন্ত্র থাকবে। সচেতন জীবনের নানা বিকারের অন্তরালে যে শাশ্বত সত্তা তাই আত্ম। এ প্রচলিত অর্থে আত্মা নয়, এ হল শুদ্ধ নিষ্ক্রিয়, স্বতঃউদ্ভাসিত ভাব যা জগৎ থেকে উদ্ভূতও নয়, জগতের সাপেক্ষও নয়, জগৎ দ্বারা নির্ণীতও নয়। সে অদ্বিতীয় ও অখণ্ড। মানুষ আত্ম নয়, তার আত্ম আছে এবং যে আত্ম হতে পারে। প্রকৃতি বা অনাত্ম আর একটি

চরম তত্ত্ব। তাকে ধারণা করা হয়েছে আদি বিভেদবিহীন জড়বস্তুরূপে, যার সমস্ত উপাদানের মধ্যে সাম্য আছে। অতএব সে অব্যক্ত বা অপ্রকট। প্রকৃতিব অভিব্যক্তি থেকেই যাবতীয় মানসিক ও বাস্তব প্রপঞ্চের উৎপত্তি। রজ্জুব তিনটি তারের মত এব তিন গুণ আছে। এর নানা অনুপাতে মিশ্রণ থেকেই বাস্তব জগতের বৈচিত্র্যের উদ্ভব। (জড়বস্তু সম্বন্ধে তার সত্ত্ব (লঘু), রজঃ (গতি) ও তমঃ (স্থূল) এই তিনরূপে ক্রিয়া। মানসিক জগতে সাধুতা, আবেগ ও নির্বুদ্ধিরূপে দেখা যায়। আত্ম বা পুরুষ যখন বুঝতে পারে যে প্রকৃতি থেকে সে সকল সংস্পর্শরহিত হয়েছে তখনই সে মোক্ষলাভ করে। গীতা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে, কিন্তু একটি মৌলিক পবিবর্তন করে, তার মতে সাংখ্যেব দ্বিত্ব, পুরুষ ও প্রকৃতি পরমতত্ত্ব ঈশ্বরেরই একান্ত স্বভাব।

গুণের বশ্যতা থেকেই অশুভের উৎপত্তি, জীবনের বীজ বা ভাব জড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে গুণদ্বারা বদ্ধ হয়ে পড়ে। আত্মা উঠবে কি পড়বে নির্ভর করে, কোন্ গুণের প্রাধান্য আছে। সগুণ প্রকৃতি থেকে নিজেকে যখন পৃথক বলে ধরতে পাবি তখনই আমাদের মুক্তি। যোগ বা তপশ্চর্যা দ্বারা পরাজ্ঞান[১] পরম উপলব্ধি[২]-তে রূপান্তরিত হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই কতকগুলি বিশেষ আচরণ ও অভিজ্ঞতাকে যোগ বলা হয়। এইগুলি পরে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের চর্চায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাবের উপযোগী করে নেওয়া হয়। প্রত্যেকটিব মধ্যেই ধ্যানযোগের ব্যবহার আছে। পাণিনির মতে যোগ মানে মানসিকক্রিয়া রুদ্ধ করা।[৩] মৈত্রী উপনিষদে বলে, "অগ্নিকুণ্ডে যেমন দাহ্যের অভাবে অগ্নি নির্বাপিত হয়, তেমনি মানসিক ক্রিয়া রোধ করলে (বৃত্তিক্ষয়াৎ) চিত্ত তার নিজ আসনে থেকেই বিলুপ্ত হয়।[৪] সংকল্পকে সুদৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করেই আমরা নানা ভাবের কোলাহল ও বাসনার অসংবৃত আক্রমণকে দমন করতে পারি। অবিরাম কর্ম দ্বারাই যোগীরা তাদের বশে আনেন।[৫]

১। পবোক্ষজ্ঞান।

২। অপরোক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।

৩। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ

৪। ষষ্ঠ, ৩৪, চিত্তং স্বয়ণৌ উপশাম্যতে।

৫। নির্বিকারেণ কর্মণা। হরিবংশ, একাদশ, ৭৩৬।

মানুষ তার সত্তার অংশমাত্র, তার মানসতার উপরতলের খবরটুকুই রাখে। তার নীচের তলায় অনেক বস্তু আছে যার খবর সে না জানলেও, তার আচরণের উপব তাদের প্রভাব পড়ে। অনেক সময় আমবা অনৈচ্ছিক ও সহজ প্রবৃত্তিসঞ্জাত আবেগদ্বারা সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি, যখন সজ্ঞান যুক্তির বিধিগুলি আর খাটানো যায় না। উন্মাদেরা সম্পূর্ণ অভিভূত অবস্থায়ই থেকে যায়, কিন্তু আমাদেব অনেকেই এইরূপ অবস্থায় পডতে পাবে, যদিও সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই প্রভাব স্থায়ী নয়। অনুরাগ বা ঘৃণায় প্রবৃত্ত আবেগের বশে আমবা এমন কথা বলি বা এমন কাজ করে ফেলি, নিজেকে আয়ত্তে আনার পর যার জন্য অনুতাপ হয়। আমরা যে বলি "তিনি আত্মহারা হয়ে পডলেন" "তিনি আত্মবিস্মৃত হলেন" "তাঁর জ্ঞান ছিল না", তা থেকেই এই সত্যের আভাস পাওয়া যায়, যে মানুষ যখন তীব্র ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে, তখন তাকে ভূতে পায়।[১] প্রবল ভাবাবেগগ্রস্ত মন ক্রমশ: অধিকমাত্রায় পরমতগ্রাহী হয়ে পডে ও যত রকম আজগুবী ধারণা মনে বাসা বাঁধে। সাধারণত: আমাদের অবচেতনা আমাদেব চেতনাব সঙ্গে সহযোগিতা করে, এবং অবচেতন মনের অস্তিত্ব সন্দেহ করার কারণ থাকে না, কিন্তু যখন আমরা আদিম সহজাত ধাঁচের পথ থেকে ভ্রষ্ট হই, তখন আমরা অবচেতনের পূর্ণ শক্তি উপলব্ধি করি। আত্মসচেতনতা পূর্ণ না হলে কোন মানুষ তার জীবনকে আয়ত্তে আনতে পারে না। তা ছাড়া, দেহ জীবন ও মনেরও সংহতি প্রয়োজন। আত্মসচেতন সত্তা হিসাবে মানুষ তার আভ্যন্তরীণ বিসঙ্গতি সম্বন্ধে সজাগ। সে সাধারণত: গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করে এবং অনিশ্চিত জীবনযাপন করে। কিন্তু যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়, তার বহুমুখী সম্ভাবনায় যতক্ষণ না আঙ্গিক সাম্য সাধিত হয়, ততক্ষণ তার আত্মজয় সম্পূর্ণ নয়। অর্জুনের মত প্রলোভনের পাত্র হলে, অখণ্ডতা লাভের পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয় না। উন্মেষশালী অস্মিতার জন্য অবিরাম সতর্কতা ও পোষণ প্রয়োজন। সাধু সংকল্প প্রবল হলে, পার্থিব বস্তুর উপর অন্ধ অনুরাগ নষ্ট হয়, তাতে মন শান্ত হয়, তা থেকে

১। "সম্মোহন, যাদু করা, আত্মবিক্রয়, ভূতে পাওয়া ইত্যাদি স্পষ্টই সজ্ঞানকে নির্জ্ঞান বস্তুদ্বারা বিচ্ছিন্নতা, নিরোধ ও অবদমন থেকে আসে" Jung. The Integration of Personality, ইংরাজী অনুবাদ (১৯৪০), পৃ ১২।

আবার যে আন্তরিক স্তব্ধতার উৎপত্তি হয়, তার মধ্যে আত্মা যে নিত্য বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার সঙ্গে সংস্পর্শ স্থাপন করতে শুরু করে। এবং অন্তর্যামী ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। পার্থিব সংঘর্ষ থেকে আত্মার বিশ্রাম নিস্তব্ধতার মধ্যে, তাতেই অন্তর্দৃষ্টি জন্মায়, মানুষ নিজেকে ফিরে পায়।

আমাদেব চেতনা দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে বহির্মুখী হয় কেননা ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জগৎ নিয়ন্ত্রণেব কাজে তাকে সিদ্ধ হতে হবে। তার বাহ্য ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে বোঝবাব জন্য কতকগুলি ধারণার আশ্রয় নিতে হয়। যে সব কার্য সাক্ষাৎ ভাবে বোধগম্য এই অর্থে যে বোধায়ত্ত বস্তু-গুলির বোধেব জন্য অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না, তারই দ্বারা মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে সাধাবণতঃ অনুমানের সাহায্যে আত্মবোধে সক্ষম হয়। এসব থেকে অবশ্য আত্ম আসলে কি তা বোঝা যায় না। তার ব্যাপারটা বুঝি কিন্তু তাকে জানতে পারি না। আত্মেব আবস্থানিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে যে সমস্ত ভিতরের ও বাহিবের বহু বিচিত্র বস্তু আত্মের সারাংশের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিলাভে বাধা দিয়ে বিবোধিতা করছে সেগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে। সাধারণতঃ বাহিবের ও ভিতরের প্রপঞ্চের আধেয় দিয়ে মঞ্চ অধিকৃত থাকে, আত্মের আসল স্বরূপ নজরে আসে না। চিন্তা বা অন্তর্মুখিতা দ্বারা মানসিক ভাবে যতই আমরা নিজেদের অস্পষ্ট করে তুলি, ততই আমবা আত্মের প্রাপঞ্চিক প্রকাশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসি। অন্তর্যামী পরমাত্মাব সাক্ষাৎ পেতে হলে আমাদের ভিন্ন প্রকাবেব বিনয় অভ্যাস করতে হবে। প্রপঞ্চ পরম্পরাকে সরিয়ে দিয়ে, আমাদের স্বভাবের অভ্যন্ত গতির প্রতিকূলে গিয়ে, নিজেদের নগ্ন করে প্রতীয়মান অহং থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিশুদ্ধ আত্মমুখিতার অতলে গিয়ে পরমাত্মাকে পেতে হবে।

ভগবদ্গীতা বর্ণনা করছে কিভাবে সাধক সর্বপ্রকার দৈহিক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আতিশয্য বর্জন করেন। কিভাবে বহির্জগতের বিক্ষেপ বর্জিত স্থানে সুখাসন স্থাপন করেন, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করেন, মনকে একাগ্র করেন ও এইভাবে সুসমঞ্জস (যুক্ত) ও ফলাসক্তি বিহীন হন। এই প্রকার আন্তরিক ঐক্য সাধিত হলে, তিনি স্বতঃই সকল প্রাণীকে সহমর্মিতা ও প্রীতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন, সেটা তখন আর কর্তব্যের বোঝা হয় না। পৃথিবীর মহত্তম জ্ঞানী গৌতম বুদ্ধ মানবপ্রীতিবশে চল্লিশ বৎসর ধরে

মানবের সেবা করেছিলেন। সত্যকে জানা মানেই আমাদের অন্তরকে সর্বেশ্বরের দিকে তুলে ধরা ও তাঁর উপাসনা করা। প্রাজ্ঞও একজন ভক্ত ও সর্বোত্তম ভক্ত।[১]

রীতিমত যোগাভ্যাস দ্বারা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় কিন্তু মাত্র ঐ প্রকার ক্ষমতালাভের জন্য যোগাভ্যাস বৃথা ও নিরর্থক। অনেক সময় তার ফল হয় ব্যর্থতা ও উন্মাদ রোগ। আধ্যাত্মিক জীবনাভিলাষীকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার আকর্ষণের বিরুদ্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়। তাদের দ্বারা হয়ত ঐহিক উন্নতি হয় কিন্তু সাধুত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। ভাবতত্ত্বে তারা অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন। প্রেত নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, অতিভৌত জগতের কিছু নজরে আসে বলে তাঁদের কতকগুলি অগোচর ক্ষমতার উন্মেষ হয়, যেমন আদিম কৃষিজীবীদের থেকে যারা বর্তমান প্রয়োগকৌশল জানে তারা ক্ষমতায় বেশী সমৃদ্ধ। কিন্তু এ অগ্রগতি বহির্মুখী, আত্মার অন্তরায়নের দিকে নয়। একমাত্র বাস্তব সত্তার সংস্পর্শে আসার জন্য, সত্যকে জানার জন্য যোগাভ্যাস করতে হয়। কৃষ্ণকে যোগেশ্বর[২] বলা হয়, তিনি আমাদের পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করেন। তিনি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় পরম গুরু, যখন মানুষ দেহের যবনিকা অতিক্রম করে, তখন তিনিই স্বর্গীয় মহিমময় মুহূর্তগুলি অর্পণ করেন এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাদের সত্যকার সম্বন্ধ নির্দেশ করেন।

১১। ভক্তিমার্গ

(এক সগুণ ভগবানের সঙ্গে প্রেম ও বিশ্বাসের সম্পর্কই ভক্তি।) সাধারণ মানুষের পক্ষে বিমূর্ত বস্তুর উপাসনা (অব্যক্তোপাসনা) কঠিন, যদিও কোনও কোনও মহান্ অদ্বৈতবাদী নির্গুণ সত্তাকে ভাবাবেগ দ্বারা ভূষিত করতে পেরেছিলেন।[৩] সগুণ ভগবানের অর্চনা, কি দুর্বল, কি অনুন্নত, কি নিরক্ষর,

---

১। সপ্তম, ১৭।

২। অষ্টাদশ, ৭৮।

৩। অদ্বৈতবাদীদের জ্ঞানের উপর নির্ভরতাকে ভক্তেরা নিন্দনীয় ধর্মদ্রোহিতা বা আত্মার বিনাশকারী ভ্রম বলে মনে করে, যদিও শঙ্কর ক্রমবিহিত মোক্ষের প্রস্তুতি হিসাবে ভক্তির মূল্য স্বীকার করেছেন।

কি মূর্খ, সকলের পক্ষেই সহজ পন্থা বলে বিধান দেওয়া হয়।[১] নিজের সংকল্পকে সম্পূর্ণরূপে দিব্য লক্ষ্যের অনুগামী করা বা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বা চিন্তার গভীর প্রয়াস যত কঠিন প্রেমার্পণ তত কঠিন নয়।

ভক্তিমার্গের উৎপত্তি সুদূর অতীতের কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন। ঋগ্‌বেদের প্রশংসা ও প্রার্থনা, উপনিষদের উপাসনা, ভাগবত ধর্মের ঐকান্তিক ধর্মপরায়ণতার প্রভাব গীতা রচয়িতার উপর পড়েছে। উপনিষদে যে দিকগুলি অবাধে ও দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত হয় নি, উপনিষদের সেই ধর্মীয় ধারণাগুলির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনার জন্য তিনি অত্যন্ত প্রয়াস করেছেন। প্রপীড়িত আত্মা যখন অবলম্বনের জন্য অসহায় ক্রন্দন করে, তখন পরমেশ্বর প্রশান্ত ঔদাসীন্যে নিদ্রাচ্ছন্ন থাকেন না, তিনি পরিত্রাতা, প্রেমের ভগবান, ভক্তদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁর উপলব্ধি হয়। যারা তাঁর ভক্ত তাদের তিনি মোক্ষ দেন, তিনি ঘোষণা করছেন, "আমি পণ করছি, যে আমাতে রত, সে বিনষ্ট হবে না।"[২]

১। নবম, ৩২। একাদশ ৫৩-৪ এবং দ্বাদশ ১-৫ও দ্রষ্টব্য।

"ব্যাধের সদাচরণ কি কি ছিল? ধ্রুবর কত বয়স? গজেন্দ্র কি বিদ্যালাভ করেছিল? বিদুরের কি জাতি ছিল? উগ্রসেনের কি ক্ষমতা ছিল? কুব্জার কি রূপ ছিল? সুদামের কি ঐশ্বর্য ছিল? ভগবানের ভক্তই প্রিয়, তিনি ভক্তিদ্বারাই তুষ্ট, অন্য গুণ নিয়ে মাথা ঘামান না।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো, বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কা জাতির্বিদুরস্য, যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্,
কুব্জায়াঃ কমনীয়রূপমধিকং কিম তৎ সুদাম্নো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন তু গুণৈঃ ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।

শঙ্কর রচিত বলে কথিত এক শ্লোকে আছে, "জন্মে মানুষই হোক, দেবদূত হোক বা পাহাড় পর্বতের পশু হোক, মশক, গোমহিষ বা পতঙ্গ, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী হোক, অন্তর যদি ইহজীবনে পরমানন্দ লহরীর উৎস তোমার পাদপদ্মধ্যানে সর্বদা মগ্ন থাকে তাহলে কোন্ যোনিতে জন্ম, তাতে কি এসে যায়?

নরত্বং দেবত্বং নগবনমৃগত্বং মশকতা পশুত্বং কীটত্বং
ভবতু বিহগত্বাদি জননম্
সদা ত্বৎপাদাব্জস্মরণপরমানন্দলহরীবিহারাসক্তং
চেদ্ হৃদয়মিহ কিং তেন বপুষা।

ভক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে এখানে একটু অতিবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

২। নবম, ৩১।

(ভক্তি শব্দটি ভজ্ ধাতু (অর্থাৎ সেবা) থেকে নিষ্পন্ন। এখানে সেবা মানে ঈশ্বরের সেবা। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগপূর্ণ আসক্তি। নারদ এর সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন ঈশ্বরের প্রতি তীব্র প্রেম।[১] শাণ্ডিল্যের ভাষায়, ঈশ্বরের জন্য প্রবল বাসনা[২]; অহেতুক[৩]। ঈশ্বরেব প্রসাদলাভের জন্য সনির্ভর আত্ম-সমর্পণ। যোগসূত্রে একে "ঈশ্বর প্রণিধান" বলা হয়েছে। ভোজের মতে "এ প্রেমে ইন্দ্রিয়সুখাদি ফলের বাসনা থাকে না, সমস্ত কর্ম গুরুর গুরুকে সমর্পণ করা হয়।"[৪] ভক্তি এক গভীর অভিজ্ঞতা, যা সমস্ত কামনাকে প্রত্যাখ্যান করে ও অন্তরকে ঈশ্বরানুরাগে পরিপূর্ণ করে।[৫]) ভক্তিমার্গ যাঁরা অবলম্বন করেন তাঁরা অতিপার্থিব মোক্ষে ততটা আগ্রহী নন, যতটা ঈশ্বরের শাশ্বত ইচ্ছার কাছে চরম সমর্পণে। ভগবানের শক্তি, জ্ঞান ও শুভেচ্ছার ধ্যান দ্বারা, ভক্তিপূর্ণ অন্তরে সর্বদা স্মরণ দ্বাবা, অপরের সঙ্গে তাঁর গুণকীর্তন দ্বারা, সহচরদের সঙ্গে তাঁর প্রশংসা সঙ্গীতে প্রকাশ দ্বারা, সমস্ত কর্ম তাঁর সেবায় নিয়োগ দ্বারা মানবাত্মা দিব্যাত্মার সান্নিধ্যলাভ করতে পারে।[৬] ভক্ত

১। পরম প্রেমরূপা।

২। সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। প্রথম, ১, ২।

৩। নির্হেতুক। তুলনা করুন, ভাগবত: অহেতুকব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। ভগবদ্‌গীতা, দ্বাদশ, ৫; নবম, ১৭-১৮ও দ্রষ্টব্য।

চৈতন্য বলছেন, "হে ঈশ্বর, আমি ধন, জন, সুন্দরী নারী, কবিপ্রতিভা কিছুই চাই না, জন্মে জন্মে পরমেশ্বরে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিই আমার কাম্য।"

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি-জন্মনীশ্বরে ভবতাদভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি। শিক্ষাষ্টক, ৪।

৪। প্রথম, ২৩। এ হ'ল মহাবস্তুর বৃদ্ধানুস্মৃতি।

৫। নারদ: ভক্তিসূত্র ৫৪: গুণরহিতং, কামনারহিতং, প্রতিক্ষণবর্ধমানং, অবিচ্ছিন্নং, সূক্ষ্মতরং, অনুভবরূপম।

৬। নারদসূত্র ১৬-১৮। ভাগবতে ভক্তির নয়টি স্তরের বর্ণনা আছে।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ, স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চনং, বন্দনং, দাস্যং, সখ্যং, আত্মনিবেদনম্।

আবার "আমি স্বর্গেও বাস করি না, যোগীদের অন্তরেও বাস করি না; যেখানে আমার ভক্তেরা আমার মহিমা কীর্তন করে সেইখানেই আমার নিবাস।"

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

তার সমস্ত অস্তিত্ব ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করেন। (সভক্তি উপাসনা ধর্মের সারবস্তু। উপাসক ও উপাসিতের দ্বিত্ব এর অঙ্গ। কোন ব্যাপিতামার্গী দর্শনের যদি এমন ব্যাখ্যা করা যায় যাতে মানুষ যে সৃষ্ট জীব সে বোধ বা ঈশ্বর যে সর্বাতীত এ ধারণা নষ্ট হয়ে যায় তা হলে তাতে ভক্তি ও অর্চনার কোন স্থান থাকে না। ভক্তিমার্গীয় ধর্মমাত্রের তত্ত্বীয় ভিত্তি সৃষ্ট ও স্রষ্টার পার্থক্যের মধ্যে। ভগবদ্গীতায় শাশ্বত পুরুষকে দার্শনিক তর্কের বিষয় রূপে ঈশ্বরকে ততটা দেখানো হয় নি যতটা প্রসন্ন ভগবান রূপে কল্পনা করা হয়েছে, অন্তরাত্মা যাঁকে চায় ও যাঁর প্রয়োজন অনুভব করে, যিনি ব্যক্তিগত বিশ্বাস, প্রেম, শ্রদ্ধার পাত্র ও যাঁর কাছে সানুগত্য আত্মসমর্পণ করা চলে। "জ্ঞানোদয়ের আগে দ্বৈতবোধ ভ্রান্তির কারণ কিন্তু প্রবুদ্ধ হলে আমরা দেখতে পাই, দ্বৈত এমন কি অদ্বৈতের অপেক্ষাও সুন্দর এবং পূজার্চনার জন্য কল্পিত।"[১] আবার "অদ্বৈত সত্য; কিন্তু উপাসনার জন্য দ্বৈত, এই উপাসনা মোক্ষের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়।"[২]

গীতার ভক্তি ধ্যান ও চিন্তাসঞ্জাত মস্তিষ্কপ্রধান ভালবাসা নয়। এ জ্ঞানাশ্রয়ী, কিন্তু জ্ঞান নয়। এর জন্য যৌগিক প্রক্রিয়াও প্রয়োজন নেই, দিব্য সম্বন্ধে দূরকল্পী জ্ঞানের অভিলাষও দরকার নেই। শাণ্ডিল্যের যুক্তি যে গোপীদের মত এর দ্বারা পারমার্থিক শান্তি পাওয়া যায়, জ্ঞান ব্যতিরেকেই[৩] ভক্তের চরম দৈন্যবোধ থাকে। ভক্তির পাত্রের কাছে সে বোধ করে যে সে কিছুই নয়। ঈশ্বর দৈন্য বা একান্ত আত্মসমর্পণ[৪] পছন্দ করেন।

যেসব গুণের সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ যেমন, প্রেম ও অনুরাগ, করুণা ও স্নেহ, সেগুলি পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের মধ্যে সাধারণতঃ বেশী থাকে। ভক্তিতত্ত্বে দীনতা, বাধ্যতা, সেবাপরায়ণতা, করুণা ও শান্ত অনুরাগের

১। দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাগ্ জাতে বোধে মনীষয়া
ভক্ত্যার্থং কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্।

২। পারমার্থিকমদ্বৈতং দ্বৈতং ভজনহেতবে
তাদৃশী যদি ভক্তিঃ স্যাৎ সা তু মুক্তিশতাধিকা।

৩। অতএব তদভাবাদ বল্লবীনাম্।

৪। দৈন্যপ্রিয়ত্বম্। নারদ সূত্র, ২৭

প্রাধান্য, কেননা ভক্ত নিজেকে সমর্পণ করতে চায়, নিজস্ব ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে ভোগবৃত্তি উপলব্ধি করতে চায়, এই জন্য ভক্তিকে স্ত্রীধর্মী বলা হয়। নারীরা প্রত্যাশা রাখে, কষ্ট সহ্য করে, আশা করে ও গ্রহণ করে। তারা কৃপা, করুণা, ও শান্তির অভিলাষী। সকলের মধ্যেই নারীত্ব ভাব আছে। ভাগবতে আছে যে মেয়েরা কাত্যায়নী দেবীর কাছে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিল।[১] নারীত্বের পরাকাষ্ঠায় নারী সর্বস্ব দিতে পারে, ফিরে কিছুই চায় না। শুধু ভালবাসা পেতে ও দিতে চায়। রাধা সেই প্রেমময়ীর নিদর্শন। ঈশ্বর সম্পর্কে ভক্তেরা নারীর ন্যায়। "পরমেশ্বরই এক মাত্র পুরুষ, ব্রহ্মাদি আর সকলে নারীর ন্যায় (যারা তাঁর মিলনাভিলাষী)।"[২]

আত্মা যখন ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন তিনি আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও ভ্রান্তি গ্রহণ করেন, আমাদের সকল প্রকার অভাব দূর করে তাঁর অনন্ত জ্যোতি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পবিত্রতায় সকলকে রূপান্তরিত করেন। "ভক্তি শুধু একের কাছে আর একের পলায়ন" নয়, শুধু জগৎ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ ও ভগবানে সংযোজন নয়। ভক্তি হল ভগবানের উপর সক্রিয় প্রেম, যে ভগবান এক্ষেত্রে জগৎকে ত্রাণ করার জন্য জগতে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

ঈশ্বরের প্রসন্নতা আমরা নিজেদের চেষ্টায় অর্জন করতে পারি না এই রকম ধারণা থেকেই তীব্র ভাবাবেগবিশিষ্ট ধর্মাচরণের উৎপত্তি। ভক্তির জন্য শ্রদ্ধা ও প্রেম মাত্র প্রয়োজন কিন্তু প্রপত্তিতে আমরা শুধু নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করি, তিনি তাঁর ইচ্ছামত আমাদের নিয়ে যা খুশী করবেন বলে! এতে প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ ও দীন ভঙ্গী দ্বারা সমর্পণ সম্বন্ধে সরল ও নিরলঙ্কার বিশুদ্ধতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। ভক্তিযোগের তীব্রতা থেকে সমর্পণের সম্পূর্ণতাই আসল ধার্মিকতার মূল, প্রপত্তিতে এই ধারণা জন্মায়। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবোধশূন্য করলেই ঈশ্বর আমাদের অধিকার

১। কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। দশম, ২২, ৪।

২। স এব বাসুদেবহসৌ সাক্ষাৎ পুরুষ উচ্যতে
স্ত্রীপ্রায়মিতরৎ সর্বং জগদ্ ব্রহ্মপুরঃসরম্।

করবেন। এই প্রকার ঈশ্বরাধিকারের বাধা হল, আমাদের নিজ সদ্গুণ, অহঙ্কার, বিদ্যা, আমাদের সূক্ষ্ম দাবীসকল ও আমাদের অজ্ঞানজাত অনুমান ও কুসংস্কার। আমাদের সমস্ত বাসনা বর্জন করে পরম সত্তার উপর বিশ্বাস রেখে অপেক্ষা করতে হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অনুগামী হতে হলে আমাদের সমস্ত দাবীদাওয়া বিসর্জন দিতে হবে।[১] ভক্তি ও প্রপত্তির তফাৎ বোঝাবার জন্য পশুদের আচবণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। একটি বানরোপম (মর্কট কিশোর ন্যায়) অপরটি বিড়ালোপম (মার্জার কিশোর ন্যায়)। বানরশিশু মাকে দৃঢভাবে আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচায়। শিশুর অতি সামান্য প্রয়াসই প্রয়োজন হয়। বিড়ালশিশুকে মা মুখে করে ধরে নিয়ে যায়, বিড়ালশিশু সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকে, নিজের নিরাপত্তার জন্য কোন চেষ্টাই করে না। ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রসাদের জন্য সামান্য প্রয়াস করতে হয়, প্রপত্তিতে তা উদারভাবে বর্ষিত হয়। শেষোক্তের মধ্যে আমাদের নিজেদের যোগ্যতা বা সেবার পরিমাণের কোন প্রশ্ন নেই।[২] এই মতের সমর্থন প্রাচীন শাস্ত্রেও পাওয়া যায়, "এই আত্ম যখন নিজে চায় তখনই তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়, তার কাছেই পরমাত্মা তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।"[৩] অর্জুনকে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরপ্রসাদে তার কাছে দিব্যমূর্তি প্রকট হয়েছে।[৪] আবার বলা হয়েছে "আমা হতেই স্মৃতিশক্তি ও বিদ্যার উৎপত্তি এবং আমাতেই তার বিলয়।"[৫] এমন কি শঙ্করও স্বীকার করেছেন

১। অষ্টাদশ ৬৬।

২। প্রপত্তির এই সব প্রকবণ আছে: সকলেব প্রতি শুভেচ্ছা (আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ); অনিষ্ট ইচ্ছা বর্জন (প্রতিকূল্যস্য বর্জনম্); ঈশ্বব বক্ষা করবেন এই বিশ্বাস (রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ); ত্রাণকর্তা রূপে তাঁর আশ্রয় পাওয়া (গোপ্তৃত্ববরণম্); সম্পূর্ণ অসহায়তা বোধ (কার্পণ্যম্); সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ (আত্মনিক্ষেপঃ)। শেষেরটিই প্রপত্তিব পবিণতি ও লক্ষ্য যদিও লোকপবম্পরায় ওকেই প্রপত্তির সঙ্গে একার্থক বলে ধরা হয়। ওকে অঙ্গী বলা হয়, বাকী পাঁচটিকে অঙ্গ বলা হয়। "ষড়বিধা শরণাগতিঃ" কথাটি তুলনীয়। অষ্টাঙ্গযোগের উপমা দিয়ে ওব ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে সমাধি আসল লক্ষ্য, অন্য সাত প্রকরণ তার সহায় মাত্র।

৩। কঠ উপনিষদ, দ্বিতীয়, ২৩।

৪। একাদশ, ৫৭।

৫। পঞ্চদশ, ১৫।

ব্রহ্মই মোক্ষদায়িনী জ্ঞান দিতে পারেন।[১] প্রপত্তি ও ভক্তির পার্থক্য খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারার এক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই অগস্টাইন ও পেলাজিউসের আমল থেকে এই তর্ক চলে আসছে যে পতিত জীব হিসাবে মানুষ ভগবানের প্রসাদেই মুক্তি পেতে পারে অথবা সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিজের প্রয়াসেই পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে।

পেলাজিউস ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন ও তাঁর আদি পাপের তত্ত্বে সন্দেহ ছিল। তিনি বলতেন যে মানুষ তার নিজস্ব নৈতিক প্রয়াসে কর্ম করে যায়। অগস্টাইন পেলাজিউসের মতের বিরোধিতা করেন, তাঁর মতে পতনের পূর্বে আদমের ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য থাকলেও, তিনি ও ইভ আপেল খাওয়ার পর তাদের মধ্যে দোষ ঢুকল, এবং তাদের সব বংশধরের মধ্যে তা সংক্রামিত হল। নিজ চেষ্টায় আমাদের পাপাচরণ থেকে বিরত থাকার উপায়ই নেই। মাত্র ঈশ্বরানুগ্রহেই আমরা সদ্‌গুণের অধিকারী হতে পারি। আমরা সকলেই যখন আদমের পাপের ভাগী, তখন আমরা সকলেই তাঁর প্রতি অভিশাপের অংশীদার। তবু ঈশ্বরের উদার প্রসাদে আমাদের কেউ কেউ স্বর্গের জন্য নির্বাচিত হই, আমরা তার যোগ্য বলে নয় বা আমরা সৎ বলে নয়, শুধু ঈশ্বরপ্রসাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে বলে। কেউ পরিত্রাণ পেল আর কেউ অভিশপ্ত রয়ে গেল, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যবিহীন নির্বাচন ছাড়া এর আর কোনও কারণ দেখানো যায় না। আমরা সকলেই দুষ্ট, কাজেই এ অভিশাপ ঈশ্বরের সুবিচারেরই নিদর্শন। সর্বজনীন অপরাধের তত্ত্ব, রোমকদের প্রতি পত্রাবলীতে সেণ্ট পল, সেণ্ট অগস্টাইন এবং ক্যালভিন গ্রহণ করেছেন। এ সত্ত্বেও আমরা যে কেউ কেউ পরিত্রাণ পাই, তাতে শুধু ঈশ্বরের করুণা সূচিত হয়। পাপ ও মুক্তি দুই থেকেই ঈশ্বরের সৎপ্রকৃতি, করুণা ও সুবিচার বোঝা যায়। গীতা পেলাজিউসের অনুরূপ মতের পক্ষপাতী।

১। তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি। ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করভাষ্য। অবধূত গীতার প্রথম শ্লোকটির এইরূপ পাঠ।

ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা
মহদ্ভয়পরিত্রাণাৎ বিপ্রাণামুপজায়তে॥

"ঈশ্বরপ্রসাদেই মাত্র মানুষ অদ্বৈত অভিজ্ঞতা রূপ জ্ঞানান্বেষী হয়ে জন্মায়, তাতে তারা মহা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়", দ্বিতীয় পদটির আর এক পাঠ এইরূপ "মহাভয় পরিত্রাণা বিপ্রাণামুপজায়তে।"

ব্রহ্মের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণের মধ্যে মানুষের প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। বিনা চেষ্টায় বা বিনা সংকল্পে তা হওয়ার উপায় নেই। ঈশ্বরের প্রসন্নতাকে একটা বিশেষ নির্ধারণ রূপে ব্যাখ্যা করা চলবে না, কেননা গীতার সাধারণ মতবাদ যে পরমেশ্বরের "চোখে সকলেই সমান"[১] এই ধারণার বিরোধী।

ভক্তির ভিত্তি শ্রদ্ধা। যে সব দেবতার উপর লোকের শ্রদ্ধা আছে, তাকেই তারা মানে। একেবারে কোন অনুরাগ না থাকার চেয়ে কিছু অনুরাগ থাকা ভাল, কেননা অনুরাগ বিনা আমরা সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকি। তা ছাড়া, অপর দেবতাদেরও এক ব্রহ্মের বিভিন্ন আকার বলে ধরা হয়।[২] এ কথা জোর করেই বলা হয় যে অন্য দেবতাদের ভক্তরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যেও পৌঁছায়, কিন্তু ব্রহ্মভক্তরাই অনন্ত আনন্দের স্বাদ পায়।[৩] নিষ্ঠার সঙ্গে উপাসনা করলে অন্তর পবিত্র হয় ও উচ্চতর সংজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রত্যেকেই ভগবানকে আপনার বাসনার আলোকে আকৃতি দেয়। মুমূর্ষুর কাছে তিনি শাশ্বত জীবন, অন্ধকারে যারা হাতড়াচ্ছে তাদের কাছে তিনি আলোক।[৪] আমরা যতই কেন না উঁচুতে উঠি, দিক্‌চক্রবাল যেমন আমাদের চোখের সমতলেই থেকে যায় তেমনি ঈশ্বরের প্রকৃতিও আমাদের চেতনার স্তরের ওপরে উঠতে পারে না। নিম্নস্তরে আমরা আয়ু ও ধন কামনা করি, ভগবানকেও আমরা ঐহিক অভাব নিরসনের যন্ত্র বলে মনে করি। পরে আমরা মনন দ্বারা ঈশ্বরের সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজেদের উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করতে পারি। উৎকৃষ্ট স্তরে ঈশ্বরই চরম তৃপ্তি, সেই অপর যা দিয়ে মানবাত্মা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়। মধুসূদন ভক্তির সংজ্ঞার নির্দেশ করেছেন যে মানসিক অবস্থাতে প্রেমের দিব্যোন্মাদ দ্বারা চালিত মন ঈশ্বরের স্বরূপ হয়।[৫] ঈশ্বরভক্তি যখন ভাবোন্মত্ততায় পরিণত হয় তখন ভক্ত নিজেকে ভুলে ঈশ্বরে বিলীন হয়।[৬]

১। নবম, ২৯; যোগবাশিষ্ঠ, দ্বিতীয় ৬, ২৭ তুলনীয়। ২। নবম, ২৩।

৩। সপ্তম, ২১, মধ্বের টীকা "অন্তোব্রহ্মাদি ভক্তানাং মদ্‌ভক্তানাং অনন্ততা।"

৪। "রুজাসু নাথঃ পরমং হি ভেষজং তমঃ প্রদীপো বিষমেষু সংক্রমঃ
ভয়েষু রক্ষা ব্যসনেষু বান্ধবো ভবত্যগাধে বিষয়ান্তংরী প্লব।" তুলনীয়।

৫। দ্রবীভাবপূর্বিকা হি মনসো ভগবদাকারতা সবিকল্পক বৃত্তিরূপা ভক্তিঃ।

৬। "বৃষ্ণিরা......কৃষ্ণ চিন্তায় তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন।"

ভক্তিরত্নাবলী, ১৩।

প্রহ্লাদের মধ্যে ঈশ্বরের দিকে সম্পূর্ণ একাগ্রতায় আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখতে পাই। তিনি পরমপুরুষের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা ব্যক্ত করে দেন। এই আত্মবিস্মৃত দিব্যোন্মাদময় অভিজ্ঞতাকে অদ্বৈত অধিবিদ্যায় সমর্থন বলে ধরা যায় না। অপরোক্ষানুভবে অর্থাৎ যে চরম অবস্থায় প্রাতিস্বিক পরমে বিলীন হয়, যেখানে প্রাতিস্বিকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে না।

ভক্তি থেকে জ্ঞানের উদয় হয়। রামানুজের কাছে, ভক্তি স্মৃতিসন্তান। এমন কি প্রপত্তিও এক প্রকার জ্ঞান। ভক্তি যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন অন্তর্যামী প্রভু নিজ প্রসাদে ভক্তকে জ্ঞানালোক অর্পণ করেন। ভক্ত পরমেশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হবার অভিজ্ঞতা অনুভব করে, সে অনুভূতিতে পরমেশ্বরের মধ্যে সকল বিরোধের অবসান এই বোধ হয়। সে নিজেকে ভগবানের মধ্যে এবং ভগবানকে নিজের মধ্যে দেখে। প্রহ্লাদ বলেছেন, মানুষের চরম লক্ষ্য ভগবানে পরমা ভক্তি এবং সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা।[১] 'প্রেমিকার পক্ষে, প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় সে প্রিয়ের হৃদয়লগ্ন হয়ে বিহার করছে বা তার পদসেবা করছে এ দুই ই সমান। সেইরূপ জ্ঞানীর কাছে নির্বিকল্প সমাধিগ্রস্ত অবস্থায় থাকুক বা উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের সেবারত থাকুক দুই-ই এক বস্তু। ভক্তের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের মধ্যে প্রকৃষ্ট মুক্তি।[৩] জগতে ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত সকল ভক্তের কর্তব্য।[৪] "যারা সমস্ত কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে শুধু ভগবানের নাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, জপ করে তারা ঈশ্বরের শত্রু এবং পাপী কেননা ঈশ্বর নিজে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন"[৫] ভক্ত যখন সম্পূর্ণরূপে নিজেকে

১। একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্। ভাগবত, সপ্তম, ৭, ৫৫।

২। প্রিয়তমহৃদয়ে বা খেলতু প্রেমরীত্যা
পদযুগপরিচর্যাং প্রেয়সী বা বিধত্তাং
বিহরতু বিদিতার্থো নির্বিকল্প সমাধৌ
ননু ভজনবিধৌ বা তুল্যং এতদ্ দ্বয়ং অস্যাৎ।

৩। লীনতা হরিপাদাব্জে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে।

৪। মজ্‌ঝিম নিকায় দ্রষ্টব্য: "যো মাং পস্‌সতি স ধম্মং পস্‌সতি।" যে আমাকে দেখে সে ধর্মকেই দেখে।

৫। স্বধর্মকর্মবিমুখাঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতিবাদিনাঃ।
তে হরেদ্বেষিণো মূঢাঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ হরেঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ।

উৎসর্গ করে, তখন ভগবানই মনের তীব্রতম আবেগের পাত্র হন এবং ভক্ত যা করে ভগবানের মহিমার জন্যই করে। ভগবদ্গীতায় ভক্তি সর্বাতীতের কাছে একান্ত আত্মোৎসর্গ। ঈশ্বরে বিশ্বাস, অনুরাগ, আনুগত্য ও তাতে বিলীন হওয়াই ভক্তি। ভক্তি নিজেই নিজের পুরস্কার। এই রকম ভক্ত নিজের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানের আধেয় ও পরিপূর্ণ মানবতার শক্তি লাভ করেন।[১]

১২। কর্মমার্গ

কোন রচনা কি উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, তা বুঝতে হলে তার শুরুতে কি প্রশ্ন তোলা হয়েছে (উপক্রম) আর কি মীমাংসায় শেষে উপনীত হয়েছে (উপসংহার) এই দুইটি দেখতে হবে। গীতায় আরম্ভেই এক সমস্যা দেখতে পাই। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছেন না ও নানা অসুবিধার কথা বলছেন। তিনি কর্মনিবৃত্তি এবং সংসার পরিত্যাগ করার সপক্ষে এক রকম যুক্তি দেখাচ্ছেন। গীতা যখন রচিত হয় সেই যুগে এই সংসার পরিত্যাগ অনেক সম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল। গীতার উদ্দেশ্য অর্জুনের এই বৈরাগ্যের নিরসন করা। কাজেই গীতার কর্ম বা কর্মবর্জন কোনটা ভাল এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং উপসংহার করা হয়েছে এই বলে যে কর্মই শ্রেয়তর। অর্জুন সমস্ত শুনে বললেন যে তাঁর মোহ দূর হয়েছে এবং তিনি যুদ্ধ করার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। গীতায় আগাগোড়াই কর্মপ্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।[২] গীতার উপদেষ্টা সমস্যার যে

১। ভগবদগীতা নবম, ৩০ দ্রষ্টব্য। বাইবেলের প্রথম জন, দ্বিতীয় ৯-১১, চতুর্থ :৮-২০। "যারাই খ্রীষ্টকে প্রভু বলে ডাকে তারা নয়, তাদের মধ্যে মাত্র যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে।" তুলনীয়।

ভাগবত বলেছেন, "ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তি থেকেই প্রবৃত্তি জয় করা যায় ও সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় যাতে ব্রহ্মদর্শন হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্।

তেমনি "বিমলমতির্বিমৎসরঃ প্রশান্তঃ সুচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো বসতি সদা হৃদি যস্য বাসুদেবঃ। বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয়, ৭।

২। দ্বিতীয়, ৮,৩৭ ; তৃতীয়, ১৯ ; চতুর্থ, ১৫ ; অষ্টম, ৭ ; একাদশ, ৩৩ ; ষোড়শ, ২৪ ; অষ্টাদশ ৬, ৭২।

সমাধানে জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে বা কর্মকে ফাঁদ বলে ধরা হয়, সে সমাধান গ্রহণ করেন নি। তাঁর উপদেশ এই যে মানুষ সংসারে সম্পূর্ণ সক্রিয় জীবন কাটাক, কিন্তু অন্তর্জীবন শাশ্বত পুরুষে লগ্ন থাক। অতএব গীতা কর্মপ্রবৃত্তির নির্দেশ। মানুষের সামাজিক জীবনে কি করা কর্তব্য তাই যে শুধু এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাই নয়, পারমার্থিক নিয়তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবেও মানুষকে চিত্রিত করা হয়েছে। সংসার-ত্যাগের প্রবৃত্তি ও আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের কথা গীতায় উভয়েরই ন্যায্য আলোচনা করা হয়েছে, এবং তার নীতি সূত্রের মধ্যে গ্রথিত করা হয়েছে।[১] সাংখ্যে (গীতায় জ্ঞানের যা অপর নাম) আমাদের কর্ম থেকে নিবৃত্ত হবার উপদেশ দিয়েছে। এক সুপ্রচলিত মতবাদ আছে, যাতে বলে যে জীবের কর্মই নিগড় আর জ্ঞান দ্বারা তার মোচন হয়।[২] ভালই হোক বা মন্দই হোক, প্রত্যেক কর্মের ফল আছে, এবং সেই ফল ভোগের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, অতএব মোক্ষলাভের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কর্মেই কর্তার অহংজ্ঞান ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সমর্থন লাভ করে, এবং কর্মফলের এক নূতন পর্যায়ের উদ্ভব হয়। অতএব যুক্তি হল যে সকল কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হও। শঙ্কর জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় বলে মনে করতেন, তাই তাঁর মতে অর্জুন মধ্যমাধিকারী কাজেই তাঁর পক্ষে নিবৃত্তিমার্গ বিপজ্জনক, অতএব তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত করা হল। কিন্তু গীতায় ভাগবত ধর্মের তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এর দ্বারা আমরা কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও সম্পূর্ণ মোক্ষলাভ করতে পারি।[৩] ব্যাস শুককে দুবার বলেছেন যে ব্রাহ্মণদের প্রাচীনতম প্রথা ছিল জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ করা ও সংসারে

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩৪৮,৫৩।

যতিনাং চাপি যো ধর্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধি কল্পিতঃ॥

২। কর্মনা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।
মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪০,৭।

৩। নারায়ণপরো ধর্মঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্মো নারায়ণাত্মকঃ। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪৭,৮০-১।

আবার প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং ঋষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ।
মহাভারত, শান্তিপর্ব ২১৭, ২।

কর্মে প্রবৃত্ত থাকা।'[১] ঈশ উপনিষদেও অনুরূপ মত সমর্থিত। হিন্দু চিন্তাধারায় শুধু অলভ্যের উপরই অতিমাত্রায় ঝোঁক দেওয়া হয়েছে এবং জগতের সমস্যা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য রূপ অপরাধে সে অপরাধী এবকম ভাবা ভুল। যখন নগ্ন ও ক্ষুধার্ত দরিদ্রেরা আমাদের দোরের সামনে মরছে তখন আমরা নিশ্চিন্ত অন্তরে ধর্মাচরণ কবতে পারি না। গীতা আমাদেব পৃথিবীর জীবনে অংশগ্রহণ করে তাকে বাঁচাতে উপদেশ দেয়।

কর্মকাণ্ডে যে সূক্ষ্ম জটিলতা আছে গীতার উপদেষ্টা তাব আলোচনা করেছেন, "গহনা কর্মণো গতিঃ"[২] কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়ামগ্ন এবং আমরা যদি ভাবি তাকে শুদ্ধ করা যায় তাহলে সে মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া কর্মত্যাগ বাঞ্ছনীয়ও নয়। জাড্য স্বাধীনতা নয়। আবাব কর্মের বন্ধনধর্ম শুধু ক্রিয়া থেকে জন্মায় না, কর্মেব উদ্দেশ্য ও বাসনা কিরূপ, তাই থেকে তার উৎপত্তি। ত্যাগের কথা ক্রিয়াকে নিয়ে নয়, ক্রিয়ার পশ্চাতে যে মানসিক প্রেরণা আছে তার সম্বন্ধেই সে কথা ওঠে। বাসনারাহিত্যই আসল ত্যাগ। ভ্রান্ত ধারণা উদ্ভূত যে কর্ম তাই জীবাত্মাকে বন্ধন করে। অজ্ঞ জীবের আচরণ যতই পরার্থে অনুপ্রাণিত হোক, তা বন্ধনের কারণ হয়। তাই গীতার উপদেশ আসক্তি বর্জন করা, কর্ম ত্যাগ নয়।[৩]

কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বলেছেন বলে তিনি যুদ্ধের সার্থকতা স্বীকাব করছেন এরকম যুক্তি ঠিক নয়। যুদ্ধকে উপলক্ষ মাত্র করে যুদ্ধ সমেত আমাদের সমস্ত কর্তব্য কিভাবে নির্বাহ করতে হবে তারই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্জুন শান্তিবাদীদের ভঙ্গী গ্রহণ করে সত্য ও ন্যায়ের জন্যও যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি ব্যাপারটাকে মানব দৃষ্টিতে দেখে

১। এষা পূর্বতরা বৃত্তির্ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে
মানবানেব কর্মানি কুর্বণ সর্বত্র সিদ্ধ্যতি।

মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৩৭, ১ ; ২৩৪, ২৯। ঈশ উপনিষদ ২ ও বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ, ৬, ১২ দ্রষ্টব্য।

২। চতুর্থ, ১৭।

৩। অর্জুন বলছেন—অসক্তঃ সক্তবৎ গচ্ছন্ নিঃসঙ্গো মুক্তবন্ধনঃ
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ স বৈ মুক্তো মহীপতে।

মহাভারত, দ্বাদশ, ১৮,৩১।

চরম অহিংসাবাদ অবলম্বন করে ছিলেন। বললেন যে আমার আত্মীয়রা যদি আমাকে আঘাত করতে চান ত আমি নিরস্ত্র হয়ে আমার বুক পেতে দেব, আঘাতের উত্তর আঘাত দিয়ে দেব না।[১] যুদ্ধ ন্যায় কি অন্যায় সে প্রশ্ন অর্জুন তোলেন নি। তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন, অনেক শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন। বান্ধব ও স্বজনদের বিনাশ করতে হবে বলেই তিনি যুদ্ধ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভীষিকার বিরোধী। হিংসা বা অহিংসার প্রশ্ন এখানে ছিল না, যে বন্ধুরা এখন শত্রু হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হিংসা করার কথা। আর রণবিমুখতা আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি বা সত্ত্বগুণাধিক্য সঞ্জাত নয়, অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি উদ্ভূত।[৩] অর্জুন স্বীকার করেছেন যে তিনি মোহ ও দুর্বলতা দ্বারা অভিভূত।[৪] আদর্শ হিসাবে গীতা যে অহিংসারই নির্দেশ দিয়েছে তা সপ্তম অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ মন দেহ ও বাক্যের লক্ষণগুলির যে বর্ণনা আছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের চিত্তের যে লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায়। কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের সময় প্রবৃত্তি, অসদিচ্ছা, ক্রোধ ও আসক্তি বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন, আমাদের মনকে যদি এই ভাবে তৈরী করতে পারি ত হিংসা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতেই হবে কিন্তু তাতে যদি মনে ঘৃণা প্রশ্রয় পায় ত আমাদের আধ্যাত্মিক পরাজয় ঘটবে। সম্পূর্ণ সমাহিত চিত্তে বা ভগবৎপদে একান্ত সমর্পিত চিত্তে মানুষকে হত্যা করা সম্ভব নয়। যুদ্ধকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেওয়া হয়েছে। পীড়াদায়ক কাজ করতে আমরা বাধ্য হতে পারি কিন্তু তা এমন ভাবে করতে হবে যে স্বতন্ত্র অহংবোধ না জাগ্রত হয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে করতেও পরোৎকর্ষ লাভ করা যায়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ও ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত থেকে কাজ করলেই পরোৎকর্ষের দিকে এগুনো যায়। আমাদের কর্ম আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া চাই। অর্জুন ক্ষত্রিয় গৃহস্থ হয়ে সন্ন্যাসীর মত কথা বলছিলেন, সম্পূর্ণ বৈরাগ্যে সিদ্ধ হয়েছেন বা মানব প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলছেন বলে নয়, বরং মিথ্যা করুণার দ্বারা অভিভূত হয়েছেন বলে। প্রত্যেককেই যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকেই উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা

১। প্রথম ৪৬, এডউইন আর্ণল্ডের ইংরাজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

২। প্রথম, ৩১, ২৭, ৩৭, ৪৫। ৩। অষ্টাদশ ৭, ৮। ৪। দ্বিতীয়, ৭

করতে হবে। গীতায় লোকসংগ্রহের (বিশ্বসংহতি) দিকে যে জোর দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমাদের সমগ্র জীবন দর্শনের পরিবর্তনের প্রয়োজন বোঝা যায়। আমরা হয়ত দয়ালু, শিষ্ট মানুষ, একটা কুকুর আহত হলে আমরা ক্ষুব্ধ ও অভিভূত হই, ক্রন্দনরত শিশু বা নিপীড়িত স্ত্রীলোকের রক্ষার্থে ছুটে যাই, কিন্তু বৃহৎ মাত্রায় কোটি কোটি শিশু ও নারীর উপর অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে থাকি এই নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ে যে তা করে আমরা পরিবার, নগর বা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করছি। গীতা আমাদের মানব-সৌভ্রাত্রের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছে। শঙ্কর দেখিয়ে দিয়েছেন যে যেখানেই যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে তা বিধি হিসাবে দেওয়া হয় নি, প্রচলিত প্রথা হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১] গীতা যে যুগে লেখা তখন মানবসমাজে এক আলোড়নের যুগ। মানবসমাজে এরকম আলোড়ন মধ্যে মধ্যেই ঘটে যখন মানুষের বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সত্তার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, এবং সেগুলির যথোপযুক্ত সমন্বয় সাধন না করলে হিংস্র বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। কল্যাণের স্বয়ংস্বীকৃত বিধি ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থার সংঘর্ষে শক্তিপ্রয়োগ অনিবার্য হয়ে ওঠে, না হলে কল্যাণমূলক বিধিগুলি মনস্তাত্ত্বিক তথ্য ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হবার সুযোগই পায় না। জগৎ যে অবস্থায় আছে তাই নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে উন্নত করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়। জীবনের কাছে যখন আমরা সর্ব-নিকৃষ্ট ব্যবহার পাই, যখন আমরা সর্বপ্রকার ক্ষতি, শোক, ও অপমান দ্বারা জর্জরিত হই, তখনও যেন জীবনের উপর আমাদের বিতৃষ্ণা না আসে। আমরা যদি গীতা-প্রদর্শিত পথে নিরাসক্ত ও উৎসর্গীকৃত ভাবে কর্মে রত হই এবং শত্রুর প্রতিও প্রীতি বজায় রাখি তা হলে পৃথিবীতে যুদ্ধ থাকবে না।[২]

আমরা যদি ফলে নিরাসক্তি ও ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের ভাব মনে আনতে পারি, ত কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারি। এইভাবে যে কাজ করে

১। তস্মাদ্ যুদ্ধস্বেত্যনুবাদমাত্রং ন বিধিঃ ; ন হ্যত্র যুদ্ধকর্তব্যতা বিধীয়তে।

ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্য, দ্বিতীয় ১৮।

২। বৈদিক প্রার্থনা : যদ্ ইহ ঘোরং, যদ্ ইহ ক্রূরং, যদ্ ইহ পাপম্

তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ।

যা কিছু নিন্দনীয়, নিষ্ঠুর ও পাপ, তা শান্ত হোক, শিব হোক, শুভ ও শান্তিপূর্ণ হোক।

সে চির সন্ন্যাসী।[১] যা পাওয়া যায় তাকেই সে গ্রহণ করে, এবং প্রয়োজন হলে বিনা খেদে তাকে পরিত্যাগ করে।

কর্মবাদ সম্বন্ধে বিরোধিতা আছে, তা ঠিক কর্ম সম্বন্ধে নয়, কর্মই মোক্ষের পথ এই প্রকার মতবাদের বিরুদ্ধে। অবিদ্যাই যদি অশুভের মূল হয়, তবে জ্ঞানই তার সর্বোত্তম প্রতিকার। প্রজ্ঞালাভ কালবশ বস্তু নয়। প্রজ্ঞা সর্বদা শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ এবং সে কোন কর্মের ফল হতে পারে না। ক্ষণস্থায়ী কালবশ কার্যদ্বারা চিরস্থায়ী অব্যয় ফললাভ করা যায় না। কিন্তু কর্ম প্রজ্ঞা-লাভের জন্য লোককে প্রস্তুত করে। "সনৎসুজাতীয়"র উপর ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন, "জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু অন্তব পবিত্র না হলে জ্ঞানোদয় হয় না। অতএব, অন্তর শুদ্ধ করার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত সমস্ত কর্ম কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরে নিবেদন কবে করা উচিত।"[২] এইভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হলে, তা যজ্ঞের সমান হয়। যজ্ঞ মানে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র হওয়া। সে ত্যাগও নয়, আত্মবলিদানও নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ; যে মহত্তর চেতনার আমরা সীমায়িত অংশ তার কাছে সমর্পণ। এই প্রকার আত্মসমর্পণ দ্বারা মনের মালিন্য দূর হয়, এবং সমর্পণকারী ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের অংশ লাভ করে। যজ্ঞের ভাব নিয়ে যে কর্ম করা যায়, তা বন্ধনের কারণ হয় না।

ভগবদ্‌গীতাতে যে ধর্ম আমরা পাই, তাতে স্বাভাবিক কার্যকারণবিশিষ্ট কর্মবিধিকে অতিক্রম করতে পারি। প্রাকৃতিক বিধি-শৃঙ্খলার মধ্যে খেয়াল-খুশী বা লোকোত্তর উদ্দেশ্যে বিধি-বহির্ভূত হস্তক্ষেপের স্থান নেই। গীতার উপদেষ্টা একটা বাস্তব ক্ষেত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন যেখানে কর্মপদ্ধতি খাটে না, এবং তার সঙ্গে যদি আমরা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তাহ'লে আমাদের অন্তরতম প্রদেশে আমরা মুক্ত হই। প্রায়োগিক জগতের মধ্যে থেকেও এখনই কর্মবন্ধন ছিন্ন করা যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নিরাসক্তি অভ্যাস দ্বারা আমরা কর্মকে জয় করতে পারি।

১। পঞ্চম, ৩। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও, যেখানে সন্ন্যাসীর লক্ষণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে গৃহস্থও যদি জ্ঞানান্বেষী হয় ও সত্যবাদী হয়, তাহলে সন্ন্যাস না নিয়েও মোক্ষলাভ করবে। তৃতীয়, ২০৪-৫।

২। জ্ঞানেনৈব মোক্ষঃ সিদ্ধ্যতি কিন্তু তদেব জ্ঞানং সত্ত্বশুদ্ধিং বিনা নোৎপদ্যতে……তস্মাৎ সত্ত্বশুদ্ধ্যার্থং সর্বেশ্বরমুদ্দিশ্য সর্বাণি বাঙ্‌মনঃকায়লক্ষণানি শ্রৌতস্মার্তানি কর্মাণি সমাচরেৎ।

পরমে লীন তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁদের কিছু করার থাকে না, তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।[১] সত্যদ্রষ্টার কিছু করার বা করে সফল হবার অভিলাষ থাকে না। সকল বাসনায় নিবৃত্তি হলে, কর্ম সম্ভব নয়। উত্তর গীতায় এই আপত্তির কথা এই ভাবে বলা হয়েছে, "যে যোগী জ্ঞানামৃত পান করে সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁর আর কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না, যদি কিছু থাকে ত বুঝতে হবে তিনি আসল সত্যের সন্ধান পান নি।"[২] সকল বিদ্যা সকল সাধনা এই রকম জ্ঞান, এই অন্তিম সারল্য লাভের উপায় মাত্র। সমস্ত কর্ম, সমস্ত সিদ্ধিই এই অবস্থার থেকে নিকৃষ্ট। সকল কর্মই ক্রটিপূর্ণ।[৩]

শঙ্কর স্বীকার করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরও আমরণ কার্য করায় কোন আপত্তি নেই।[৪] এরকম সাধককে শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সকল কর্মের উর্ধ্বে বলা হয়।[৫] এর অর্থ এই যে তত্ত্বগতভাবে আধ্যাত্মিক মোক্ষ ও ব্যবহারিক কর্মে কোন বিরোধ নেই। যদিও সঠিকভাবে বলতে গেলে ঈশ্বরেরও যেমন কোন কর্তব্য থাকতে পারে না, তেমনি ব্রহ্মবিদ ঋষিদেরও কিছু করার থাকে না, অথচ উভয়েই লোকসংগ্রহ অর্থাৎ সংসারের রক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকেন। এমন কি এও বলা যায় যে ঈশ্বরই কর্তা, কেননা সাধক ত সমস্ত বাসনামুক্ত হয়েছেন।[৬] কিছুই করেন না, ন কিঞ্চিৎ

১। তৃতীয়, ১৭।

২। জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ। প্রথম, ২৩।

৩। ন্যায়সূত্র প্রথম, ১, ১৮।

৪। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, তৃতীয়, ৩,৩২, ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্য, দ্বিতীয়, ১১, তৃতীয় ৮,২০। নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তায় ছেদ পড়ার ভয়ে বাহ্যিক কার্যের উপর একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা থাকে।

৫। অলঙ্কারো হ্যয়মস্মাকং যদ্ ব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্বকর্তব্যতাহানিঃ। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, প্রথম, ১, ৪।

৬। জৈমিনীয় উপনিষদ—"তুমি (ঈশ্বর)ই কর্তা": "ত্বং বৈ তস্য কর্তাসি।" "খ্রীষ্টের মন আমাদের মধ্যে" (Cor. ii 16)। "আমি বেঁচে আছি, কিন্তু আমি নয়, আমার মধ্যে খ্রীষ্টেরই জীবন" (Gal, ii. 20). Tauler বলছেন "কাজ দিয়ে তারা বলতে পারে না। কেউ যদি ঈশ্বরের কাছে যেতে চায়, ত তাকে সকল কর্ম বর্জন করতে হবে, এবং মাত্র ঈশ্বরকেই সক্রিয় রাখতে হবে।" (*Following of Christ*, 16, 17). St. Thomas Aquinas বলেন, "যে লোক পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত তার সকল কর্ম পবিত্র আত্মারই কর্ম, তার নিজের নয়।" (Summa Theol. II, 1, 93, 6 and 1.)

করোতি। তাঁর যখন কোন অন্তিম লক্ষ্য নেই, তিনি কিছুই দাবী করেন না এবং স্বতঃস্ফূর্তির কাছে সদা সমর্পিত। তখন ঈশ্বরই তাঁর মাধ্যমে কাজ করেন এবং সেক্ষেত্রে ন্যায়ান্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না। যদিও এরকম লোকের পক্ষে অন্যায় করা অসম্ভব।[১] আত্মপ্রশান্তিতে সমাহিত হয়ে, তিনি সকল কার্য করেন, কর্মকৃৎ। তিনি জানেন যে তিনি ঈশ্বরের কার্যের যন্ত্র মাত্র, নিমিত্ত মাত্রম্।[২] অর্জুনের দীর্ঘ মনঃপীড়া যখন সার্থক হল, তখন তিনি বুঝলেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনেই তাঁর শান্তি।[৩] ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রকৃতি তার কাজ করে যায়। প্রাতিস্বিক বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয় বৃহৎ বিশ্ব-জাগতিক উদ্দেশ্যে ও তারই বিধানে ক্রিয়াশীল হয়। জয়-পরাজয়ে কিছু এসে যায় না, কেন না বিশ্বাত্মার তাই ইচ্ছা। যা ঘটে, তাকেই আসক্তি বা বিরক্তি ব্যতিরেকেই সে স্বীকার করে নেয়। সে বিরোধের ঊর্ধ্বে (দ্বন্দ্বাতীত)। সে বিনা আয়াসে, স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের কর্তব্যকর্ম করে যায়।

সংসারাসক্ত লোক সংসারের নানা ক্রিয়ায় হারিয়ে যায়। সে পরিবর্তনশীল (ক্ষয়) জগতে ঝাঁপ দেয়। প্রশান্ত ব্যক্তি পরমেব (অক্ষয়) স্তব্ধতায় নিজেকে সংবরণ করেন কিন্তু গীতার আদর্শ পুরুষ এই দুই প্রত্যন্ত প্রদেশ অতিক্রম করেন, এবং পুরুষোত্তম যেমন নির্লিপ্ত থেকে পৃথিবীর সকল সম্ভাব্যতায়ই অংশগ্রহণ করেন, সেই ভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি কাজ করেন কিন্তু কর্তা নন, কর্তারং অকর্তারম্। অক্লান্ত ও সক্রিয় কর্মীর ঈশ্বরই আদর্শ। ঈশ্বর তাঁর কর্ম দ্বারা নিজের ভাবের অখণ্ডতা কোন রকমেই ক্ষুণ্ণ হতে দেন না। মুক্ত আত্মা কৃষ্ণ ও জনকের মত সর্বদা বাধাহীন।[৪] জনক তাঁর

১। সেন্ট জনের উক্তি স্মরণীয়, "যিনি ঈশ্বরজাত তিনি পাপ করতে পারেন না।"

২। একাদশ, ৩৩ ৩। অষ্টাদশ ৭৩।

৪। ঈশ উপনিষদে সমস্ত বিশ্বকেই ব্রহ্মের নিবাস বলে ধরে নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হতে উপদেশ দিয়েছে, কেননা সেরূপ কর্ম আমাদের বদ্ধ করতে পারে না, ন কর্ম লিপ্যতে নরে। মহাভারতের বনপর্বের ৩১২, ১০৮এর "যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ" তুলনীয়। কঠ উপনিষদের দ্বিতীয় ১৯এর উপর শঙ্করভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি বলেন—

বিবেকী সর্বদা মুক্তঃ কুর্বতো নাস্তি কর্তৃতা
অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণ জনকৌ যথা।

অধ্যাত্ম রামায়ণে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন, "জীবনস্রোতে পতিত মানব বাহ্যতঃ সর্বকর্মে প্রবৃত্ত হলেও নির্লিপ্ত থেকে যায়।"

প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্বান্নপি ন লিপ্যতে
বাহ্যে সর্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘবঃ।

কর্তব্য করে যেতেন, সংসারের ঘটনাবলী দ্বারা বিচলিত হতেন না।[১] যে সব লোক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট পথে চলতে চান, মুক্তাত্মারা তাদের পথ নির্দেশ করেন। মুক্তাত্মারা জগতে আগন্তুক লোকের মত বাস করেন। দেহধারণের সমস্ত কষ্ট সহ্য করেও[২] তাঁরা দেহসর্বস্ব নন।" "অশিক্ষিত ব্যক্তি কর্মে আসক্তিবশতঃ যেমন কার্য করে, শিক্ষাপ্রাপ্তদেরও তেমনি কার্য করা উচিত কিন্তু আসক্তি বর্জন করে, সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য।"[৩]

বৌদ্ধ আদর্শে ধ্যানের জীবনকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়, কিন্তু যে সমস্ত লোক কাজ ও দুঃসাহসিকতা ভালবাসেন গীতা তাঁদের ভাল লাগবে। আত্মসম্পূর্ণতা লাভের জন্যই কার্য। আমাদের অন্তরতম ও মহত্তম অস্তিত্বের সত্য আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে, এবং তারই নির্দেশে জীবনযাপন করতে হবে, বাহিরের কোন আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজন নেই। আমাদের স্বধর্ম অর্থাৎ বহির্জীবন ও স্বভাব অর্থাৎ অন্তর্জীবন পরস্পর উপযোগী হওয়া চাই। তখনই আমাদের কর্ম স্বাধীন, সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হবে। ভগবানের রাজত্বে ভগবান আমাদের যেমনভাবে থাকতে বলেন সেই রকম ভাবে থাকতে পারি, শুধু অদ্বৈতের বহুমূল্য অপার্থিব শিখাকে জ্বলন্ত রেখেই। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিজেদের নিবেদন করে, আমাদের সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করেই, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করতে পারি।

১। আমার ঐশ্বর্য অনন্ত কিন্তু তার কিছুই আমার নয়। মিথিলা যদি দগ্ধ হয়, তো আমার নিজস্ব কিছুই পুড়বে না।

অনন্তং বট মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চিৎ প্রদহ্যতে।

মহাভারত, শান্তিপর্ব, সপ্তম, ১।

শঙ্কর বলেন যে সাধু মহাত্মারা শান্তিতে বাস করেন। বসন্তের মত তাঁরা জগতের কল্যাণ করেন। নিজেরা সংসার সমুদ্র পার হবার পর তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে অন্যকে পার হতে সহায়তা করেন।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি শান্তাঃ বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ তীর্ণাঃ
স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনান অহেতুনান্যাপি তারয়ন্তঃ।

২। ভাগবৎ তুলনীয় "সৎ লোক সংসারে দুঃখে কষ্ট পান। প্রায়শো লোকতাপেন তপ্যন্তে সাধবো জনাঃ"। তাঁরা নিজেদের জ্বালিয়ে জগতে আলোকসম্পাত করেন।

৩। তৃতীয়, ২৫

গীতানুসারে কর্মযোগ জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছবার এক বিকল্প পথ, এবং সে পথে তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করা যায়।[১] এই অর্থে শঙ্কর ঠিকই বলেছেন যে কর্ম ও ভক্তি উভয়ই মোক্ষলাভের পন্থা। কিন্তু পারমার্থিক মুক্তির সঙ্গে কর্মের কোন অসঙ্গতি নেই। কর্তব্য হিসাবে যা করতে হয়, তা খসে যায়, কিন্তু সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয় না। মুক্ত পুরুষের কর্ম স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত এবং তার মধ্যে কোন বাধাবাধকতা নেই। প্রজ্ঞালাভ করার পরও এঁরা জগতের মঙ্গলের জন্য কর্মলিপ্ত হন।[২] এক্ষেত্রে কর্ম সাধনা নয়, লক্ষণ মাত্র। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করলেও অন্য আশ্রমের কর্তব্য থাকে না বটে, কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের কর্তব্য আছে। দয়াধর্মের ন্যায় সাধারণ ধর্ম সকলেরই আচরণীয়। অতএব কর্ম ও মোক্ষ পরস্পরবিরোধী নয়।[৩]

সে সময় যতগুলি বিভিন্ন ধর্মসূত্র ও আচরণবিধি প্রচলিত ছিল এবং জনগণের বিশ্বাসভাজন হবার জন্য প্রতিযোগিতা কবছিল, গীতা সেগুলির সমন্বয় করে এক অন্তর্মুখী ধর্মের আকারে পরিবর্তিত কবেছে যা একাধারে মুক্ত, সূক্ষ্ম ও গভীর। যদি বিভিন্ন জনপ্রিয় দেবতার অর্চনা করা হয়, ত বুঝতে হবে, তারা অদ্বিতীয় সর্বেশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। যজ্ঞে বলিদান যদি দিতে হয়,

---

১। চতুর্থ, ৩৩ ২। ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্য, তৃতীয়, ২০

৩। মণ্ডনমিশ্র তাঁর "ব্রহ্মসিদ্ধি"তে জ্ঞান ও কর্মেব সম্পর্ক সম্বন্ধে সাতদফা মতবাদের উল্লেখ করেছেন। (১) বেদের আনুষ্ঠানিক বিধিগুলি মানুষকে তাদের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম থেকে আকর্ষণ করে আত্মোপলব্ধিব জন্য ধ্যানধারণাব দিকে নিয়ে যায। (২) এই বিধিগুলি ভোগের দ্বারা বাসনা বিনাশ কবার জন্য, যাতে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করাব জন্য চিন্তা কবতে পারে। (৩) আত্মজ্ঞান লাভ কবার জন্য যে তিনটি অপবিহার্য উপকবণ, সেই ঋণত্রয় শোধ করার জন্য কর্ম প্রয়োজন। (৪) অনুষ্ঠানগুলিব দুই ব্যবহাব আছে (সংযোগপৃথকত্ব), বাসনাতৃপ্তি ও আত্মজ্ঞানেব প্রস্তুতি। (৫) কম মাত্রেবই উদ্দেশ্য মানুষকে শুদ্ধ করা, যাতে তারা আত্মোপলব্ধির যোগ্য পাত্র হতে পারে। (৬) কর্মকাণ্ডে বিহিত ক্রিয়ার সম্পাদনকারী কর্তাকে দোষমুক্ত কবাব সহায়তাব জন্য আত্মজ্ঞান প্রয়োজন। (৭) কম ও জ্ঞান পরস্পরবিরোধী।

মণ্ডনমিশ্র চতুর্থ ও পঞ্চম মত গ্রহণযোগ্য মনে কবেন। উপনিষদেব মহাবাক্যগুলি থেকে যে শব্দজ্ঞান লাভ করা যায়, তার যথাযথ ধ্যান কবার জন্য ক্রিয়াকাণ্ড খুব মূল্যবান আনুষঙ্গিক, এবং এতদ্বাবা আত্মার শাশ্বত স্বয়ংপ্রভ আলোকেব চরম অভিব্যক্তি ঘটে। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি ও জ্ঞানাভ্যাস দ্বারাই সন্ন্যাসীরা আত্মোপলব্ধি কবতে পাবেন, গৃহস্থরা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা সেই লক্ষ্যেই পৌঁছান, ইত্যাদি।

সে আত্মিকভাবের, পার্থিব বস্তুর দ্বারা নয়। জিতেন্দ্রিয় জীবন বা অনাসক্ত কর্মই যজ্ঞ। বেদেরও ব্যবহার আছে। কিন্তু গীতার উপদেশের সঙ্গে তুলনা করলে সে প্রসরমান তীব্র নদীস্রোতের কাছে পুষ্করিণীর ন্যায়। উপনিষদ অনুগামীরা যে ব্রহ্মাত্মার অন্বেষণ করেন ও যার কথা ঘোষণা করেন, গীতায় তাঁর সংক্রান্ত তত্ত্বই শিক্ষা দেয়। ইন্দ্রিয় নিবোধ ও মনকে সমাহিত করে যে যোগাভ্যাস করা যায়, তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ব্রহ্মই যোগেশ্বর। সাংখ্যের দ্বৈতবাদকে অদ্বৈতবাদে রূপান্তরিত করা হয়েছে, পুরুষ ও প্রকৃতিকে পুরুষোত্তমের দুই ভাব বলে বর্ণনা করে। একমাত্র তিনিই প্রসাদ দিতে পারেন। তিনিই একমাত্র ভক্তিব পাত্র। সমস্ত কর্ম তাঁকেই উৎসর্গ করতে হবে। মহাজ্ঞান তাঁরই। ধর্মের প্রচলিত বিধিগুলি পালন করতে হবে কেন না তিনি সেগুলির প্রবর্তন করেছেন এবং তিনিই নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। কিন্তু বিধিনিয়ম পালন কবাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনই চবম লক্ষ্য। গীতার উপদেষ্টা প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় করে এমন একটা সর্বাত্মক দ্বন্দ্ব নিরসনকারী মীমাংসা দিয়েছেন যা কোন বিশেষ দেশ বা কালোপযোগী নয়, সকল লোকের পক্ষে এবং সর্বকালে অনুসরণযোগ্য। তিনি বাহিরের আকারের উপর বা মতবাদের গোঁড়ামিকে প্রাধান্য দেন নি। মূল তত্ত্ব এবং মানবসত্তা ও মানবপ্রকৃতির মহৎ তথ্যগুলিই তাঁর উপদেশের বিষয়।

১৩। সাধনার লক্ষ্য[১]

আধ্যাত্মিক জীবনের ঐক্য সম্বন্ধে গীতার মত খুব দৃঢ়। তাকে দার্শনিক জ্ঞান, অচলা ভক্তি বা নিরলস কর্ম প্রভৃতিতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ রূপে, বা লক্ষ্যে পৌঁছবার পরও জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম পরস্পরের পরিপূরক। পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য একই। ভিন্ন ভিন্ন পথে পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করা যায়, কিন্তু চূড়ায় পৌঁছলে সকলের পক্ষে একই দৃশ্য

১। সাধনার চরম লক্ষ্যকে গীতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরম পদপ্রাপ্তি (তৃতীয় ১৯), মোক্ষ (তৃতীয়, ৩১; চতুর্থ, ১৫), অব্যয় শাশ্বত অবস্থা (অষ্টাদশ, ৫৬), যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন নেই অর্থাৎ পুনর্জন্ম না হওয়া (পঞ্চম, ১৭), সিদ্ধি (দ্বাদশ, ১০), পরম শান্তি (চতুর্থ, ৩৯), ঈশ্বর স্বারূপ্য (চতুর্থ, ৯, ১০ ও ২৪), ব্রহ্মসংস্পর্শ (ষষ্ঠ, ৮), ব্রহ্মনির্বাণ (দ্বিতীয়, ৭২) ব্রহ্মত্বলাভ (চতুর্দশ, ২৬), ব্রহ্মভূত হওয়া (পঞ্চম, ২৪)।

প্রতীয়মান হবে। প্রজ্ঞাকে মূর্তভাবে বর্ণনা করলে বলা হয় যে জ্ঞান তার দেহ, কিন্তু প্রেম তার অন্তর। অন্ধকার থেকে আলোয় যাবার, মৃত্যু থেকে অমরত্বে পৌঁছবার যোগই পুরানো পথ। জ্ঞান ও ধ্যান, প্রেম ও সেবা যোগেরই ভিন্ন ভিন্ন দশা।

লোকোত্তর সাধনার পরিণতিকে ব্রহ্মলোক, বা ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মস্থিতি প্রাপ্তি বলে বর্ণনা করা হয়। এর এক দিক হ'ল সংসার থেকে বিচ্ছেদ (কৈবল্য)। গীতায় এর সব কটিরই উল্লেখ আছে। অনেক শ্লোক এমন আছে, যা পড়লে মনে হয় যে মোক্ষপ্রাপ্তির পর দ্বৈতভাব ঘুচে যায়, মুক্ত আত্মা শাশ্বত আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। সে অবস্থা সর্বপ্রকার রীতি ও গুণের অতীত, নিষ্ক্রিয়, অবাধ ও শান্ত। তখনও যদি দেহ আমাদের লগ্ন হয়ে থাকে, ত প্রকৃতি তার উপর আপনার কাজ করে যাবে যতক্ষণ না বর্জিত খোলসের মত দেহ খসে পড়ে। জীবন্মুক্ত দেহী বহির্জগতের ঘটনায় সাড়া দেয় কিন্তু জড়িত হয়ে পড়ে না। এই দিক দিয়ে দেখলে দেহ ও আত্মা অসমন্বিত দ্বৈত এবং আমরা মুক্ত আত্মার কোন ক্রিয়ার কথা ভাবতে পারি না।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কিন্তু গীতা প্রাধান্য দেয় নি। গীতার মতে আধ্যাত্মিক মোক্ষ হয় তখনই, যখন আমাদের সমস্ত স্বভাবকে ঈশ্বরের অমর বিধি ও শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। ঈশ্বরের সহিত সমভাবকে (সাধর্ম্য) প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতাকে (সাযুজ্য) নয়। মুক্ত আত্মা দিব্যজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত ও দিব্য ইচ্ছা দ্বারা চালিত। তিনি ঐশী ভাবের অধিকারী। তাঁব শোধিত প্রকৃতি ঐশী সত্তায় বিলীন। যিনি এই তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁকে যোগী, সিদ্ধপুরুষ, জিতাত্মা, যুক্তচেতসঃ ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত করা হয়। তিনি সর্বদা সুসংহত ও সুষম, তাঁর পক্ষে শাশ্বত নিত্য উপস্থিত। বিভিন্ন প্রকারের আনুগত্য ও ক্রিয়া থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর দেহ, মন ও আত্মা, ফ্রয়েডের ভাষায় বলতে গেলে তাঁর সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান, ত্রুটিশূন্যভাবে একসঙ্গে কাজ করে এবং তার দ্বারা যে ছন্দ স্পন্দিত হয় তা থেকে আনন্দের উন্মাদনা, জ্ঞানের জ্যোতি ও শক্তির তীব্রতা বিস্ফুরিত হতে থাকে। মর মানবজীবন থেকে অমর আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা মোক্ষ নয়, সমগ্র মানবের রূপান্তরণই আসল মোক্ষ। এবং মানবজীবনের সন্তাপগুলিকে বিনষ্ট করেই যে সেই

অবস্থা পাওয়া যায় তা নয়, তাদের নবকলেবর দিয়েই পেতে হয়। বিশ্ব-জগতের ধারণা দ্বারা তার সমস্ত প্রকৃতি অভিভূত হয়, আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত ও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। তার দেহ, প্রাণ ও মন বিলুপ্ত হয় না, পরিশোধিত হয়ে দিব্যজ্যোতির বাহন ও প্রতিকৃতি হয়, এবং নিজেই নিজের সর্বোত্তম রচনা হয়। তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণত্ব লাভ করে, এবং তার গরিষ্ঠ প্রকাশ হয় মুক্ত ও পবিত্র, প্রফুল্ল ও ভারহীন অবস্থায়। তার সমস্ত কর্ম জগতের সংহতির জন্য "বিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।"[১] মুক্তপুরুষরা সমগ্র জগতের পরিত্রাণের ভার নিজেরাই গ্রহণ করেন। আত্মার গতি যদি স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তা নিত্যনূতন বিসংবাদ দ্বারা অভিভূত হয়, তা'হলেই জগতের শেষ। সমগ্র জগৎ অজ্ঞতা ও অশুভ থেকে নিষ্কৃতি না পেলে দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তি শেষ হতে পারে না। সাংখ্যের মতে যেসব লোক পরাজ্ঞান ও মোক্ষের অধিকারী হয়েছেন তাঁরাও অপরের মঙ্গলেচ্ছায় জগৎ পরিত্যাগ করেন না। প্রকৃতির দেহতে নিজেদের লগ্ন করে ও তার গুণের ব্যবহার করে, এই প্রকার "প্রকৃতিলীন" পুরুষেরা জগতের সেবা করেন। সংসারকে আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং যারা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে তাদের মুক্তপুরুষদের শক্তি ও জ্ঞান, প্রয়াস ও দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্ধার করতে হবে।[২] এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিরাই মানবসমাজের স্বাভাবিক নেতা। আমাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের চিরন্তন ভিত্তিতে দৃঢ়বদ্ধ এই সব মুক্তাত্মা, নিত্যপুরুষরা জীবলোকের[৩] জন্য কর্ম করেন। নিজের দেহ প্রাণ মনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও বিশ্বজনীন ভাব দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত হন। তিনি যাই করুন ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্য সংযোগ বিচলিত হয় না।[৪] যদি এবং যখন বিশ্বজাগতিক লীলা তার পূর্ণতা লাভ করবে, যখন সকলেই মোক্ষলাভ করবে, তখন কি ঘটবে তা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। পরমের অনন্ত সম্ভাব্যতা, তিনি হয়ত অন্য-এক সম্ভাবনার মধ্যে নিজেকে প্রকট করবেন।

গীতা স্বীকার করে যে পরম ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা কিন্তু বিশ্বজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি পরমেশ্বর। মানুষের সীমিত ধারণা, সর্বোচ্চ সত্যকে এইভাবেই মাত্র উপলব্ধি করতে পারে। যুক্তির দিক দিয়ে এই দুইয়ের

১। তৃতীয়, ২৫ ২। চতুর্থ, ৩৪
৩। পঞ্চদশ, ৭ ৪। ষষ্ঠ, ৩১

সম্পর্ক আমাদের ধারণার অতীত, কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করলে এ অসুবিধা আর থাকে না। এই ভাবেই চরম মোক্ষের যে দুই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়, তা একই অবস্থার স্বজ্ঞামূলক ও বুদ্ধিজাত ব্যাখ্যা। মুক্ত আত্মার স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন নেই কিন্তু তবু নিজেকে সীমায়িত করে সে স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করে। তবে উভয় ব্যাখ্যাই এ বিষয়ে একমত যে মুক্ত আত্মারা যদি পৃথিবীতে বাস করতে থাকেন, তাহলে তাঁরা কোন না কোন কর্মে লিপ্ত থাকেন। তাঁদের কর্মে যে স্বাধীনচিত্ততা, আন্তরিক আনন্দ ও শান্তি দেখা যায় তার সংরক্ষণের জন্য বহির্জগতের কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না।

গীতার ব্রহ্মলোক স্বভাবে নিত্য নয়, সে হল প্রকাশের চরম সীমা। আনন্দ আমাদের উন্মেষের প্রান্ত আর আমরা সে-স্তরে বিজ্ঞানস্তর থেকে উন্নীত হই। সে ব্রহ্মাণ্ডলীলার অংশ। আনন্দময় আত্মা, আত্মার দৈব সংস্করণ পরমাত্মা নয়।[১] শুদ্ধ আত্মা পঞ্চকোষ[২] থেকে ভিন্ন। ব্রহ্মাণ্ড-লীলায় লক্ষ্য সিদ্ধ হলে, ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, যখন স্বর্গ-মর্ত্য উভয় স্থানেই তার প্রতিষ্ঠা হয়, যখন সকলেই পারমার্থিক প্রজ্ঞার অধিকারী হবে এবং জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে যাবে, তখন জগৎলীলা সেই পর্যায়ে পৌঁছবে যা সর্বপ্রকার অভিব্যক্তিব অতীত।

১। আনন্দময় আত্মা পরমাত্মা নয়, কেননা সে অবস্থার বশীভূত এবং প্রকৃতির রূপান্তর, সর্বপ্রকার সৎকর্মের যোগফল। বিবেক চূড়ামণি, ২১২।

২। পঞ্চকোষ বিলক্ষণঃ। বিবেক চূড়ামণি, ২১৩।

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনের সংশয় ও বিষাদ

প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

১। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥

(১) ধৃতরাষ্ট্র বললেন, হে সঞ্জয়, পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে যখন আমার লোকেরা ও পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থ একত্র হল, তখন তারা কি করল ?

ধর্মক্ষেত্রে—পুণ্যভূমিতে। কোনটা ন্যায় বা ধর্ম, এ নির্ণয় করার ক্ষমতা মানুষের বিশেষ গুণ। ক্ষুধা, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মানুষ ও পশু উভয়েরই সাধারণ ধর্ম। ন্যায়ান্যায় বোধই মানুষকে পশুদের থেকে বিশিষ্ট করেছে।[১]

জগৎই ধর্মক্ষেত্র, নৈতিক সংগ্রামের রণক্ষেত্র। যে প্রশ্ন সমাধানের জন্য সংগ্রাম তা মানুষের অন্তর্নিহিত, সেখানে প্রতিদিন প্রতিঘণ্টা এই দ্বন্দ্ব চলেছে। পৃথিবী থেকে স্বর্গে আরোহণ, দুঃখকষ্টের বহির্জগৎ থেকে ভাবরাজ্যে উন্নয়ন ধর্মপথ ধরেই হয়। দেহসর্বস্ব অস্তিত্বেও ধর্মাচরণ করে আমরা এমন নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারি যেখানে সমস্ত অসুবিধা আনন্দে পরিণত হয়। এই সংসারই ধর্মক্ষেত্র, এখানেই মুনিঋষিরা পালিত হন, এখানে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র শিখা কখনও নির্বাপিত হতে পায় না। একে আবার কর্মভূমিও বলে, কেননা এখানেই আমরা কর্মভোগ করে জীবাত্মা সৃজনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে থাকি।

তত্ত্বপ্রচারের চেয়ে ধর্মাচরণ বিধি শেখানোই গীতার উদ্দেশ্য। যা ব্যবহারিক জীবনে স্বতন্ত্র করতে পারি না, তাত্ত্বিক ভাবেও তাকে আলাদা করা যায় না। নাগরিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্য সকল থেকেই ধর্ম তার নির্দিষ্টকর্ম ও সুযোগগুলি নিরূপণ করে। যা ঐহিক শ্রেয় ও আধ্যাত্মিক মুক্তি

১। আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ। হিতোপদেশ।

আনে তাই ধর্ম।[১] যে অতীন্দ্রিয়তা শুধু মানুষের অন্তর্জগৎ নিয়ে ব্যাপৃত তা গীতার উপদেশের বিষয় নয়। ইহজীবনের কর্তব্য ও সম্পর্কসমূহ মায়া বলে বর্জন না করে, সেগুলি গ্রহণ করে তাদের আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করাই গীতার শিক্ষা। আমরা যে জীবন পেয়েছি তাকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করতে পারলে তবেই তার সদ্ব্যবহার করা হয়।

আবার রণক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হচ্ছে কেন না যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন সেই ভগবান সেখানে সক্রিয় রূপে উপস্থিত।

কুরুক্ষেত্রে—সে যুগের এক প্রধান কুল, কুরুদের জমি।[২]

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" কথা দুটি থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনবিধির আভাস পাওয়া যায়। অর্জুন কর্মক্ষেত্রে ভগবানের ভীষণ মূর্তি দেখছেন। জীবন অশুভভাবের বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম। সৃজনীপদ্ধতি দুটি পরস্পর বিসংবাদীর মধ্যে চিরস্থায়ী সংগ্রাম। তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে অভিব্যক্তি অগ্রসর হয়, ব্রহ্মাণ্ডের তাৎপর্য সিদ্ধ হয়। এ পৃথিবীতে ত্রুটি আছে, অশুভ আছে, অযৌক্তিকতা আছে। ধর্মাচরণের দ্বারা আমাদের

১। প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স হেতুর্য স ধর্মঃ।

২। আধুনিক দিল্লীর কাছে হস্তিনাপুরের নিকটস্থ বিরাট ময়দান। যখন কুরুদের অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনের বদলে ধর্মরাজ নামে খ্যাত যুধিষ্ঠিরকে নিজ সিংহাসন দিতে চাইলেন, তখন দুর্যোধন ছল ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা সিংহাসন দখল করেন এবং যুধিষ্ঠির ও তাঁর চার ভাইকে বধ করার চেষ্টা করেন। যাদবকুলপতি কৃষ্ণ এই জ্ঞাতিশত্রুতা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যখন সমস্ত চেষ্টা বিফল হল, তখন কৌরব ও পাণ্ডবদের জ্ঞাতিবিবাদ সংগ্রামে পরিবর্তিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। কৃষ্ণ প্রস্তাব করলেন যে তিনি মাত্র একা একদিকে থাকবেন এবং তাঁর কুলের লোকেরা অন্যদিক গ্রহণ করবেন। নির্বাচনের ভার দুর্যোধনকে দেওয়া হইল। দুর্যোধন যাদবকুলকে বেছে নিলেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দলে যোগ দিলেন ও অর্জুনের সারথির পদ গ্রহণ করলেন। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ১৪৭ সংখ্যক শ্লোক। "কেউ রথে বিশ্বাস রাখে, কেউ অশ্বে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু আমরা আমাদের প্রভু, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখব।" বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও এই কথা আছে। পাণ্ডব ও কৌরবেরা দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির প্রতীক, উন্নতি ও অবনতি, দৈব ও আসুরিক, ধর্ম যে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্মেষে সহায়তা করে আর অধর্ম বা আমাদের টেনে নিয়ে ঐহিক জড় জগতের সঙ্গে আরও গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরে। একই উৎস থেকে উৎপন্ন বলে এদের মধ্যে মিটমাট অসম্ভব নয়। তাই সংগ্রামী পাণ্ডব ও কৌরবরা একই বংশে জাত জ্ঞাতি।

পৃথিবীকে শোধিত করতে হবে এবং যে সমস্ত উপাদানের কাছে সুযুক্তি অস্পষ্ট রয়ে গেছে তাদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তুলতে হবে। যুদ্ধ শাস্তিমূলক বিচারও বটে একটা নিয়মানুবর্তী তপস্যাও বটে। কুরুক্ষেত্রকে তপক্ষেত্রও বলা হয় অর্থাৎ যেখানে প্রায়শ্চিত্ত মূলক অভ্যাস করতে হয়।[১] যুদ্ধ একই সময়ে শাস্তি এবং মানবজাতির শোধন। ঈশ্বর বিচারক ও পরিত্রাতা উভয়ই। তিনি বিনাশ করেন ও সৃষ্টি করেন, শিব ও বিষ্ণু।

মামকা—আমার দল।[২] "আমার" কথাটা অহঙ্কারজাত, সেখানেই অমঙ্গলের বীজ। কৌরবদের "মমকার" বা স্বার্থপরতা থেকে যে শক্তিমত্ততা ও প্রভুত্বাভিলাষের উৎপত্তি সেইটিই এইভাবে দেখানো হয়েছে।

সঞ্জয়—অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সারথি। তাঁকে যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শোনাচ্ছে।

দুই পক্ষের সেনাদল

সঞ্জয় উবাচ

২। দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥

(২) সঞ্জয় বললেন, রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদের ব্যূহবদ্ধ অবস্থায় দেখে আচার্যের কাছে গিয়ে বললেন।

আচার্য—গুরু, যাঁর শাস্ত্রজ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান তিনি অন্যকে বিতরণ করেন এবং নিজে শাস্ত্রসম্মত আচরণ করেন। এখানে আচার্য অর্থে দ্রোণাচার্য, যিনি উভয় পক্ষের রাজপুত্রদের রণকৌশল শিখিয়েছিলেন।

৩। পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥

(৩) হে আচার্য, দেখুন পাণ্ডবদের মহতী সেনা আপনার বিচক্ষণ শিষ্য দ্রুপদপুত্রদ্বারা ব্যূহতে সজ্জিত হয়েছে।[৩]

১। মনু, দ্বিতীয়, ১৯, ২০।

২। মামেতি কায়ন্তীতি মামকা, অবিদ্যা পুরুষাঃ। অভিনব গুপ্ত।

৩। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন।

৪। অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুন সমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥

(৪) যুদ্ধে ভীমার্জুনের সমান পারদর্শী মহাধনুর্ধর যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদ রয়েছেন।[১]

৫। ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥

(৫) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীশ্বর, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্যও রয়েছেন।[২]

৬। যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥

(৬) বলবান যুধামন্যু, এবং বীর উত্তমৌজা আর সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর ছেলেরা সকলেই বড় বড যোদ্ধা।

সৌভদ্র অর্থে অভিমন্যু—অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র।

৭। অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥

(৭) হে দ্বিজোত্তম, আমার দলের যাঁরা বিশিষ্ট নেতা এইবার তাঁদের কথা আপনার জ্ঞাতার্থে বলি।

দ্বিজোত্তম—দ্বিজদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভাষাগত অর্থে দ্বিজ মানে যার দুবার জন্ম হয়েছে, লক্ষ্যার্থে যার উপবীত হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য পরমার্থে দীক্ষা দেওয়া। আমরা প্রাকৃতিক জগতে জন্মাই, আমাদের দ্বিতীয় জন্ম পারমার্থিক জগতে, "তদ্ দ্বিতীয়ং জন্ম, মাতা সাবিত্রী, পিতা তু

১। ভীমই যুধিষ্ঠিরের আসল সৈন্যাধ্যক্ষ, যদিও নামে ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পদে আছে।

অর্জুন কৃষ্ণসখা ও পাণ্ডবদলের মহাবীর।

যুযুধান কৃষ্ণের সারথি, অপর নাম সাত্যকি। বিরাটরাজার আশ্রয়ে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস কাটান।

২। ধৃষ্টকেতু চেদিরাজ।

চেকিতান পাণ্ডবদলের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা।

পুরুজিৎ ও কান্তিভোজ দুই ভাই। কখনও কখনও পুরুজিৎ ও কান্তিভোজ একই লোক বলে ধরা হয়।

শৈব্য শিবিকুলের এক রাজা।

আচার্য"। লোক স্বভাবজাত শিশু হয়ে জন্মে আধ্যাত্মিক জগতে যখন পরিণত বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন সে আলোকের পুত্র।

৮। ভবান ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈবচ॥

(৮) যুদ্ধে সবদা জয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, এবং কৃপ; অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্ত পুত্র।[১]

৯। অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥

(৯) এবং আরও অনেক বীর যাঁরা আমার জন্য জীবন পণ করেছেন। তাঁরা নানাপ্রকার অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত এবং সকলেই সমরদক্ষ।

১০। অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥

(১০) ভীষ্মরক্ষিত আমাদের সৈন্যদল অপর্যাপ্ত, কিন্তু ভীমরক্ষিত ওদের সৈন্য পরিমিত।

অপর্যাপ্তম্—যথেষ্ট নয়। শ্রীধর। (এ এক বিকল্প ব্যাখ্যা—অনুবাদক)

১১। অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি॥

(১১) অতএব আপনারা সকলে নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে ভীষ্মকে সমর্থন করুন।

শঙ্খনিনাদ

১২। তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান॥

(১২) তাঁকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কুরুবৃদ্ধ পিতামহ প্রতাপবান ভীষ্ম সিংহনাদ পূর্বক শঙ্খধ্বনি করলেন।

১। ভীষ্ম—বৃদ্ধ জ্ঞানী ও যোদ্ধা। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়কেই মানুষ করেছিলেন।
কর্ণ—অর্জুনের সহোদর ভ্রাতা, কিন্তু অন্য পিতার ঔরসে।
কৃপ—দ্রোণাচার্যের শ্যালক।
অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্যের পুত্র।

ভীষ্মের এবং আরও অনেকের কাছে ব্যক্তিগত রুচির অপেক্ষা কর্তব্য-নিষ্ঠা বড়। কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতা সামাজিক শৃঙ্খলার ভিত্তি। সক্রেটিস কি ক্রীটোকে বলেন নি, যে এথেন্‌স তাঁকে মানুষ করেছে, রক্ষণাবেক্ষণ করেছে ও প্রহরা দিচ্ছে, সেই এথেন্‌সের নিয়ম তিনি ভঙ্গ করবেন না?

সিংহনাদ—ভীষ্ম তাঁর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন।

১৩। ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥

(১৩) তখন শঙ্খ, ভেরী, ঢাক, মৃদঙ্গ, রণশিঙ্গা প্রভৃতি ধ্বনিত হ'ল, এবং তুমুল শব্দ উৎপন্ন হ'ল।

১৪। ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥

(১৪) তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত কৃষ্ণ ও অর্জুনও তাঁদের দিব্য শঙ্খ বাজালেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে সর্বত্রই রথকে দেহ ও মন উভয়েরই বাহন বলে কল্পনা করা হয়েছে। অশ্বেরা ইন্দ্রিয়, বল্গা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী, কিন্তু সারথি আসলে আত্মা। সারথি কৃষ্ণ আমাদের অন্তরস্থ পরমাত্মা।[১]

১৫। পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥

(১৫) কৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীষণ কীর্তিমান ও প্রচুর ক্ষুধাসম্পন্ন ভীম তাঁর মহাশঙ্খ পৌণ্ড্র বাজালেন।

এগুলি যুদ্ধের প্রস্তুতির লক্ষণ।

১৬। অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ।

(১৬) কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ আর নকুল সহদেব তাঁদের সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামের শঙ্খ বাজালেন।[২]

বিকর্ণ—ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে তৃতীয়। দুর্যোধন ও দুঃশাসনের পরে।

সৌমদত্তি—বাহিকদের রাজা সোমদত্তের পুত্র।

১। কঠ উপনিষদ তৃতীয়, ৩। প্লেটোর Laws ৪৯৪০ ও মিলিন্দপন্‌হ ২৬-৮৩ তুলনীয়।

২। যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের সর্বজ্যেষ্ঠ, নকুল চতুর্থ ও সহদেব সর্বকনিষ্ঠ।

১৭। কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥

(১৭) মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহাযোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকি।

১৮। দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দধ্মুঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌॥

(১৮) হে পৃথিবীশ্বর, দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা এবং মহাবাহু সুভদ্রা-নন্দন সব দিক থেকে আপন আপন শঙ্খ বাজালেন।

১৯। স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোব্যনুনাদয়ন্‌॥

(১৯) সেই দারুণ নিনাদ পৃথিবী ও আকাশে প্রতিধ্বনিতে ব্যপ্ত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রনন্দনের হৃদয় বিদীর্ণ করতে লাগল।

অর্জুনের দুই সৈন্যদল নিরীক্ষা।

২০। অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্‌ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥

(২০) যাঁর পতাকায় হনুমান চিহ্ন অঙ্কিত, সেই অর্জুন যুদ্ধার্থে সজ্জিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের দিকে দেখে, তারা শস্ত্রনিক্ষেপে (প্রায়) প্রবৃত্ত দেখে, নিজের ধনু হাতে নিলেন।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে—বাণগুলি যখন ছোঁড়া শুরু হ'ল। এই সঙ্কটে অর্জুনের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হল। বিরোধী সৈন্যদল ব্যূহবদ্ধ, শাঁখ বাজছে, আসন্ন যুদ্ধের উম্মাদনা সকলের মনকে আচ্ছন্ন করেছে, সেই সময় হঠাৎ এক মুহূর্তের আত্মবিশ্লেষণের ফলে অর্জুন বুঝতে পারলেন যে তাঁর সমগ্র জীবনদর্শন, পরিবার ও কুলের মহৎ আদর্শ, আইন ও শৃঙ্খলা, দেশভক্তি ও গুরুভক্তি, যার প্রতি এতদিন তাঁর অচঞ্চল আনুগত্য ছিল, তা সবই বর্জন করতে হবে।

২১। হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥

(২১) তারপর, হে মহারাজ, হৃষীকেশ (কৃষ্ণ) কে তিনি এই কথা

বললেন, "হে অচ্যুত (কৃষ্ণ), আমার রথ দুই সৈন্যবাহিনীর মাঝখানে রাখ।"

অচ্যুত—যাকে স্থানচ্যুত করা যায় না, বা অবিচলিত, কৃষ্ণের অপর নাম।[১]

২২। যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে।

(২২) যাঁরা যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাঁদের যাতে আমি দেখতে পাই।

২৩। যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥

(২৩) দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র যাতে খুশী হন তাই করার জন্য যারা উদ্গ্রীব হয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়ে এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের আমি দেখতে চাই।

যুদ্ধের সকলপ্রকার প্রস্তুতিপর্ব শেষ। সেই দিন প্রাতেই ভীষ্মসজ্জিত অভেদ্য ব্যূহ দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলেছেন "এরকম সৈন্যদলকে আমরা কি করে হারাব?"[২] অর্জুন বড ভাইকে সাহস দিয়ে এক প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করেছেন, "যারা যুদ্ধে জয় চায়, তারা শক্তিদ্বারা ততটা সিদ্ধকাম হয় না যতটা সত্য, করুণা, ধর্মাচরণ ও সদগুণ দ্বারা হয়। কৃষ্ণ যে পক্ষে আছেন সেখানে জয় সুনিশ্চিত কেন না বিনয় যেমন তাঁর এক গুণ, জয়ও সেইরকম।[৩] কৃষ্ণ অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনি যেন নিজেকে বিশুদ্ধ করেন এবং দেবী দুর্গার কাছে সিদ্ধিভিক্ষা করেন। অর্জুন রথ থেকে নেমে দেবীর প্রশংসা করে স্তোত্রপাঠ করেন। তাঁর ভক্তিতে সন্তুষ্ট

১। কৃষ্ণের অন্যান্য নাম মধুসূদন (মধুদৈত্যহন্তা), অরিসূদন (শত্রুহন্তা), গোবিন্দ (রাখাল বা জ্ঞানদায়ক), বাসুদেব (বসুদেবনন্দন), যাদব (যদুবংশজাত), কেশব (সুন্দর কেশযুক্ত), মাধব (লক্ষ্মীকান্ত), হৃষীকেশ (হৃষীক—জ্ঞানেন্দ্রিয় তার ঈশ—প্রভু), জনার্দন (মানুষের মুক্তিদাতা)।

অর্জুনের অন্যান্য নাম ভারত (ভরতবংশজাত), ধনঞ্জয় (ধন আহরণকারী), গুড়াকেশ (চুল যার গুটিয়ে বাঁধা), পার্থ (পৃথার নন্দন), পরন্তপ (শত্রুকে যিনি সন্তাপ দেন)।

২। ধনঞ্জয় কথং শক্যমস্মাভির্যোদ্ধুমাহবে। মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২১, ৩১।

৩। যুধ্যধ্বমনহংকারা যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ..... যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ। মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ২১, ১১-১২।

হয়ে দেবী অর্জুনকে বর দেন, "হে পাণ্ডব, তুমি তোমার শত্রুকে অচিরে বিনষ্ট করবে। নারায়ণ নিজে তোমার সহায়।" তবু কর্মব্যস্ত অর্জুন ব্যাপারটাকে সমস্ত দিক থেকে তখনও ভেবে দেখেন নি। গুরুর উপস্থিতি ও ঐষী চেতনা উদ্রেকে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে শত্রুদের সঙ্গে তিনি লড়তে যাচ্ছেন তারা তাঁর প্রিয় ও মান্য। ন্যায়রক্ষা ও বেআইনী হিংসা দমন কবার জন্য তাঁকে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন কবতে হবে।

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় মানব ও দেবতার উভয়েরই সহযোগিতা দরকাব। সৃষ্টিকার্যে মানুষও অংশীদার।

২৪। এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥

(২৪) হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র) অর্জুনের এই কথা শুনে কৃষ্ণ তাদের উত্তম রথকে দুই সৈন্যদলের মধ্যে রাখলেন।

২৫। ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান কুরূনিতি ॥

(২৫) ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বাজাদের সামনে তিনি বললেন, "দেখ হে পার্থ (অর্জুন), এই কুরুরা (এখানে) সমবেত হয়েছেন।"

২৬। তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥

(২৬` পিতা, পিতামহ, গুরু, মামা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র ও বন্ধু সকলকে অর্জুন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

২৭। শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান বন্ধুনবস্থিতান্ ॥

(২৭) এবং শ্বশুর ও উভয় সেনাদলে বন্ধুগণ। কুন্তীপুত্র অর্জুন তখন এই সকলকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ;

২৮। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।
দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্ ॥

(২৮) তিনি করুণাপ্লুত হয়ে বিষণ্ণভাবে এই কথা বললেন।

স্বজনং হনন যতটা না হোক, নিজের আত্মীয় হত্যাই অর্জুনের বিষাদ ও উদ্বেগের কারণ। ৩১, ৩৭ এবং ৪৫ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। আমরা যুদ্ধকে

যান্ত্রিকভাবে দেখি এবং পরিসংখ্যানের মধ্যে হারিয়ে যাই। কিন্তু সামান্য কল্পনা প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারি যে আমাদের শত্রুরাও মানুষ, "পিতা ও পিতামহ" তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র জীবন আছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। পরে অর্জুন এ কথাও জিজ্ঞাসা করেছেন যে দেশটাকে মরুভূমি করে জয় করার কি কোন মূল্য আছে? প্রথম, ৩৬।

অর্জুন বিষাদ

হে কৃষ্ণ, আমার নিজের লোকেদের এইভাবে যুদ্ধোদ্যত অবস্থায় দেখে—

২৯। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥

(২৯) আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীর কাঁপছে, আর রোমাঞ্চ হচ্ছে।

৩০। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥

(৩০) হাত থেকে আমার গাণ্ডীব ধনু খসে পড়ছে, এবং আমার গা উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে যাচ্ছে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। আমার মন বিচলিত হচ্ছে।

যে লোক সন্দেহদোলায় আন্দোলিত, বিনাশ ও শূন্যতা দ্বারা শঙ্কিত, যার কাছ থেকে স্বর্গ-মর্তের সমস্ত ঐশ্বর্য এবং মানুষের স্নেহমমতা সরে যাচ্ছে, সেই মানুষের নিঃসঙ্গতার কথা অর্জুনের কথাগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি। যাঁরাই সত্যের সন্ধানী তাঁরাই এই অসহ্য বিষাদ অনুভব করেন।

৩১। নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥

(৩১) হে কেশব (কৃষ্ণ) আমি চতুর্দিকে কুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। তা'ছাড়া যুদ্ধে নিজের লোকেদের হত্যা করে যে কিছু মঙ্গল হবে, তাও মনে হচ্ছে না।

অর্জুন যে কুলক্ষণের কথা বলছেন তাতে তাঁর মানসিক দুর্বলতা ও চাঞ্চল্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

৩২। ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥

(৩২) হে কৃষ্ণ, আমি বিজয়, রাজ্য, সুখ এসব কিছুই চাই না। হে কৃষ্ণ, রাজ্যই বল, ভোগই বল, এমন কি জীবনই বল, এতে আমার কি লাভ ?

পরম দুঃখের সময় আমরা ত্যাগের কথা ভাবি। এই শ্লোকে অর্জুনের সংসারত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে।

সন্ন্যাস সাধনসূচনম্। মধুসূদন।

৩৩। যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥

(৩৩) যাদের জন্য আমবা রাজত্ব, সুখ, ভোগ ইত্যাদি চাই, তারাই ত এখানে নিজেদেব প্রাণ ও ঐশ্বর্য বিসর্জন দেবার জন্য যুদ্ধে প্রস্তুত রয়েছেন।

৩৪। আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈবচ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥

(৩৪) গুরুজন, পিতাগণ, পুত্রগণ, ও পিতামহগণ, মাতুল ও শ্বশুরগণ, পৌত্র ও শ্যালকগণ ও অন্যান্য আত্মীয়গণ।

৩৫। এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥

(৩৫) এরা যদি আমাকে মারতেও আসে তবু এদের আমি মারতে চাই না। হে মধুসূদন (কৃষ্ণ), ত্রিলোকের রাজত্বের জন্যও নয়, এমনি জমির জন্য ত নয়ই।

ত্রিলোক কথা দ্বারা পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ (বায়ুমণ্ডল) এই বৈদিক ধারণা বোঝাচ্ছে।

৩৬। নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈ তানাততায়িনঃ ॥

(৩৬) হে কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের হত্যা করার পর আমাদের কি সুখটা হবে ? এই সব শত্রুদের মেরে আমাদের শুধু পাপই লাভ হবে।

এই রক্তযজ্ঞে আমাদের কি লাভ হবে ? কি এমন আমাদের লক্ষ্য যার

কাছে পৌঁছবার জন্য যেসব লোক আমাদের প্রিয় তাদের মৃতদেহকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে ?

প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও ব্যবহারিক নীতিবোধ থেকে অর্জুনের মনে এই সব ভাব আসছে, তাঁর নিজস্ব সত্যোপলব্ধির স্থান এর মধ্যে নেই। এই সব বহিরঙ্গের নীতিজ্ঞানের প্রতীকগুলিকে বিনষ্ট করে, তাঁর অন্তরের বলে বলীয়ান হতে হবে। তাঁর আগেকার যে আচার্যেরা তাঁকে জীবনের পথ দেখিয়েছিলেন তাদের হত্যা করে তবেই তিনি আত্মিক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন। অর্জুন এখনও বুদ্ধিপ্রণোদিত স্বার্থপরতার ভাষায় কথা বলছেন। শত্রুপক্ষ যদিও প্রথম আক্রমণ করেছে, তবু তাদের মারা ঠিক নয়। "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ" (অর্থাৎ এক পাপের প্রতিকার আর এক পাপ দ্বারা করা উচিত নয়) "অন্যের ক্রোধ, অক্রোধ দিয়ে জয় কর, যারা মন্দ কাজ করে তাদের মঙ্গলকার্য দ্বারা জয় কর, কৃপণদের উদারতা দিয়ে জয় কর আর মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় কর।'[১]

৩৭। তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥

(৩৭) অতএব আমাদের জ্ঞাতি ধৃতরাষ্ট্রনন্দনদের হত্যা করা ঠিক হবে না। হে মাধব, স্বজন বিনাশ করে আমরা কি করে সুখী হব ?

৩৮। যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহত চেতসঃ।
কুলক্ষয় কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥

(৩৮) যদিও এরা লোভাতুর হয়ে কুলক্ষয় বা মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় কোন পাপ দেখছে না।

৩৯। কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্ নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥

(৩৯) কিন্তু হে জনার্দন, আমরা কুলক্ষয়কে যখন দোষ বলে জানি, তখন সে পাপ থেকে নিবৃত্ত হবার মত বুদ্ধি আমাদের কেন থাকবে না ?

তারা লোভে অন্ধ হয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমরা ত অন্যায়টা দেখতে

১। অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্, অসাধুং সাধুনা জয়েৎ
জয়েৎ কদর্যং দানেন, জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৮, ৭৩, ৭৪। ধর্ম্মপদ ২২৩-ও দ্রষ্টব্য।

পারছি। যদি আমরা ধরেও নিই যে তারা স্বার্থপর ও লোভী, তবু তাদের মারা অন্যায়, এবং তারা প্রবৃত্তি দ্বারা অন্ধ হয়ে না জেনে পাপ করছে, কিন্তু আমাদের চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও সে কাজ করলে আরও বেশী পাপ হবে।

৪০। কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥

(৪০) কুলক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কুলধর্মও নষ্ট হয়ে যায়, আর ধর্মনষ্ট হলে সমগ্র বংশই অধর্মে লিপ্ত হয়।

যুদ্ধের সময় প্রায়ই আমরা আমাদের স্বাভাবিক প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হই এবং পরিণত বয়সের সংকল্প ও লোকের অভিজ্ঞতার নির্যাস স্বরূপ পরম্পরাগত সামাজিক প্রথাগুলি থেকে ভ্রষ্ট হই।

৪১। অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ ॥

(৪১) হে বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণঃ, অধর্মের প্রাদুর্ভাব হলেই কুলবধূরা নষ্ট হয় এবং তা থেকে বর্ণসংকরের উৎপত্তি হয়।

বর্ণ কথাটা বর্তমানে জাতি বলে ধরা হয় যদিও বর্তমানে যে জাতিপ্রথা চলিত আছে, গীতার আদর্শের সঙ্গে তাদের মিল নেই।

৪২। সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥

(৪২) আর বর্ণসংকর ঘটলে কুল এবং কুলঘ্ন উভয়েই নরকগ্রস্ত হয় কেননা পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ড লোপ পায়।

মৃত পূর্বপুরুষেরা তাঁদের কল্যাণের জন্য জলপিণ্ডের উপর নির্ভরশীল, এই ধারণার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৪৩। দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসংকরকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥

(৪৩) এই কুলনাশকারীদের দুষ্কর্মের জন্য যে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়, তাতে জাতি ও পরিবারের চিরাচরিত ধর্মগুলি নষ্ট হয়।

স্মরণাতীত কাল থেকে যে সমস্ত সামাজিক প্রথা চলে আসছে তার মধ্যে যে সব আদর্শের স্থান, সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে সেগুলি নষ্ট হয় এবং তাতে সংসারে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়।

৪৪। উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥

(৪৪) হে জনার্দন, আমরা শুনেছি যে যারা কুলধর্মাচরণ করে না, তারা চিরকাল নরকবাস করে।

৪৫। অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥

(৪৫) হায়, রাজ্যসুখ লোভে স্বজনহানি করতে উদ্যত হয়ে কি মহাপাপ সংকল্পই না করছি!

৪৬। যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥

(৪৬) তার চেয়ে ঢের ভাল হবে যদি আমি নিরস্ত্র হয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা না করি আর সে অবস্থায় সশস্ত্র ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা আমাকে বধ করে।

পাঠান্তরে 'ক্ষেমতরম্'এর স্থানে 'প্রিয়তরম্' আছে।

অর্জুনের কথাগুলি যুগপৎ ক্ষোভ ও প্রেমব্যঞ্জক। তাঁর মন দুই জগতের সীমানায়। আদিকাল থেকে লোক যেমন প্রচেষ্টা করে আসছে, তিনিও তেমনি কিছু করার প্রচেষ্টা করছেন, তবু তিনি মনস্থির করতে পারছেন না যেহেতু তিনি নিজেকে বা তাঁর সহযোগিদের বা যে বিশ্বের অধিবাসী তার সত্য রূপ বুঝতে অক্ষম। যুদ্ধে যে ঐহিক কষ্ট ও শারীরিক দুঃখভোগ করতে হয় অর্জুন সেইগুলিকেই বড করে দেখছেন। ঐহিক সুখাভিলাষ জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। বার্ধক্য, জরা ও মৃত্যুর জন্য জীবনের সায়াহ্নে আমরা সেগুলির অভাব অনুভব করতে বাধ্য। আদর্শের জন্য, ন্যায় ও প্রেমের জন্য আমাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণা ও মৃত্যুবরণ করতে হয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অর্জুন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন ও সাংসারিক ও ঐহিক কারণে যুদ্ধে থেকে বিরত থাকতে চান। তিনি তখনও বুঝতে পারছিলেন না যে স্ত্রী, সন্তান, আচার্য, জ্ঞাতি এরা তাদের নিজের জন্য প্রিয় নয়, পরমাত্মার অংশ বলেই প্রিয়। অর্জুন তখনও সেই উপদেশ পান নি যাতে তাঁকে এমন জীবনযাপম করতে বলা হয়েছে যাতে তার কর্মের উৎস কামনার মধ্যে না থাকে। নিষ্কাম কর্ম বলে যে এক প্রকার কর্ম আছে তা তখনও তিনি জানেন না।

৪৭। এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক সংবিগ্নমানসঃ॥

(৪৭) যুদ্ধক্ষেত্রে এই কথা বলে, অর্জুন ধনুঃশর বিসর্জন করে, শোক-মগ্ন চিত্তে রথের উপর বসে পড়লেন।

অর্জুন বিষাদ একটি চিরন্তন পুনরাবৃত্ত সঙ্কটের নাটকীয় রূপ। উচ্চতর জীবনের আভাস পেলে মানুষ ঐহিক জাঁকজমক সম্বন্ধে হতাশ হয় কিন্তু তবু ভ্রান্তি সম্পূর্ণভাবে যায় না এবং সেই ঐহিক বস্তুই তার প্রিয় থাকে। তার দৈব উৎস ভুলে গিয়ে নিজ অস্মিতায় আসক্ত হয়ে পড়ে এবং জগতের বিসংবাদী শক্তিসমূহ দ্বারা উদ্বেজিত হয়। আধ্যাত্মিক জগতের হদিস পাওয়ার আগে এবং তার কর্তব্যগুলি স্বীকার করার আগে তাকে স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতা রূপ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় এবং আত্মকেন্দ্রিক অহংবোধের অন্ধকার মোহকে জয় করতে হয়। যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে, তার পুনরুদ্ধার করতে হয়। এখানে মানুষের আত্মার অভিব্যক্তিই চিত্রিত হয়েছে। এর মধ্যে দেশকালের কোন সীমা নেই। প্রতি মুহূর্তে মানুষের আত্মার মধ্যে এই সংগ্রাম চলেছে।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অর্জুন বিষাদ যোগোনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবদ্গীতা রূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাসংক্রান্ত যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে আলাপ সম্বলিত অর্জুন-বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।[১]

ব্রহ্মবিদ্যা—পরম বিদ্যা। সত্য কি? এই যে ঘটনাবলী নিয়ত সংঘটিত হয়ে চলেছে এই কি সব না এমন কিছু আছে যার পরিবর্তন নেই? সে কি বস্তু যা এত রকমে নিজেকে প্রকট করতে পারে? এই যে অনন্ত সম্ভাব্যতার অজস্র লীলা একে বাধ্য করে বা অনুপ্রাণিত করে কে? এসবের কি কোন লক্ষ্য আছে বা অর্থ আছে? সত্য স্বরূপ সংক্রান্ত এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করতে যে সহায়তা করে তাই ব্রহ্মবিদ্যা। সুযৌক্তিক বিচারাবলী আধ্যাত্মিক

১। এই হল প্রথানুযায়ী উপসংহার।
পাঠে অধ্যায়গুলির শিরোনামায় সামান্য সামান্য পার্থক্য আছে কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়।

জ্ঞানলাভের সহায়। শঙ্করাচার্য তাঁর অপরোক্ষানুভূতিতে বলেছেন যে পার্থিব বস্তু যেমন বিনা আলোকে দেখা যায় না, তেমনি সন্ধান করা ছাড়া আর কোন রকমেই জ্ঞানলাভ হয় না।[১]

যোগশাস্ত্র—অনেকে দর্শনশাস্ত্রকে জীবনের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন। বলা হয় যে সত্যের অব্যয় বিশ্বদর্শনের আলোচ্য বিষয়, আর জীবনের বিষয় নিয়ত পরিবর্তনশীল জাগতিক প্রক্রিয়া। এ ধরনের মত যে সঙ্গত বলে মনে হয় তার কারণ এই যে পাশ্চাত্যে প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রেই প্রথম দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি হয়। সেখানে দুই শ্রেণীর ধনী ও প্রচুর অবসরবিশিষ্ট অভিজাতরাই দার্শনিক আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতেন, এ বিলাস তাদেরই পক্ষে সম্ভব ছিল। এ ছাড়া সেদেশে এক বৃহৎ দাসশ্রেণী ছিল যারা চারুকলা বা প্রয়োগবিদ্যা কোনটারই চর্চা করার সুযোগ পেত না। মার্ক্‌স যে দার্শনিকদের এই বলে সমালোচনা করেছেন যে দার্শনিকরা জগৎকে ব্যাখ্যাই করতে পারেন, কিন্তু আসল প্রয়োজন তাকে পরিবর্তিত করা, সে সমালোচনা গীতা-রচয়িতার ক্ষেত্রে খাটে না। গীতা রচয়িতা যে ব্রহ্মবিদ্যা বা দার্শনিক ব্যাখ্যাই দিয়েছেন তা নয়, একটা আচরণীয় কর্মসূচীও দিয়েছেন, যার নাম যোগশাস্ত্র। আমাদের পৃথিবীকে একটা দৃশ্য ভেবে বিভোর হয়ে থাকা চলবে না, সেটা আসলে একটা রণক্ষেত্র। অবশ্য গীতার মতে সামাজিক উন্নতিসাধন করতে হলে প্রাতিস্বিক প্রকৃতির উন্নয়ন অপরিহার্য।

কৃষ্ণার্জুন সংবাদ—কৃষ্ণার্জুনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গীতা-রচয়িতা মানুষের মধ্যে ভগবানের অবস্থিতি নাটকীয়ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

অর্জুন যখন নিজ কর্তব্যসাধনে বিমুখ থাকতে প্রলোভিত হলেন, তখন তার আত্মস্থ শব্দব্রহ্ম নিজের খাঁটি অনুপ্রেরণার সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দিলে। তখন তিনি তাঁর নিকৃষ্ট অংশের সূক্ষ্ম ও মৃদু পরামর্শকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন। আত্মার অন্তরতম কোষই সমগ্র বিশ্বের দিব্যকেন্দ্র। অর্জুনের গভীরতম আত্মই কৃষ্ণ।[২] যেমন প্রেমিকযুগলের মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি

১। নোৎপদ্যতে বিনা জ্ঞানং বিচারেণান্যসাধনৈঃ
যথা পদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা কচিৎ॥

২। Tauler-এর কথা তুলনীয় "আত্মার গভীরে ঈশ্বরের স্বারূপ্য ও বর্ণনাতীত নৈকট্য

অবান্তর, তেমনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোন তৃতীয় সত্তা নিষ্প্রয়োজন। লোক নিজেই ভগবানের যত নিকট তত আর কেউ নয়, এবং তাঁকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল অন্তঃকরণ ও শুদ্ধ মতিই যথেষ্ট। অর্জুন একাকী ও নগ্ন অবস্থায় কোন পরিচায়কের সাহায্য না নিয়েই তাঁর ভগবানের সামনে দাঁড়িয়েছেন। ভগবান ও মানুষের মধ্যে নিরন্তর সংযোগ রয়েছে এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ও সুষম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ততদিন ভাবের আদানপ্রদান চলে।

এই দিব্যতত্ত্ব আমাদের থেকে দূরে নয়, অতি নিকটে। ঈশ্বর নিরপেক্ষ দর্শক বা প্রশ্নের সুদূর মীমাংসক নন। তিনি সখা, সর্বসময় আমাদের সঙ্গে আছেন, "বিহার শয্যাসন ভোজনেষু" (একাদশ, ৪২)। ঋগ্বেদে দুই পাখীর তুলনা দেওয়া হয়েছে, তাদের পাখা সুন্দর, স্বভাবতঃ পরস্পরের বন্ধু, এবং একই বৃক্ষ আশ্রয় করে বাস করে।[১]

বিষাদ—অধ্যায়টি দুঃখ ও নিরুৎসাহের মধ্যে শেষ হয়েছে এবং একেও যোগ বলা হয়েছে এইজন্য যে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতির পক্ষে আত্মার অন্ধকার এক অপরিহার্য স্তর। আমাদের বেশীর ভাগ লোক জীবন কাটিয়ে দেয় চরম সমস্যাগুলির কথা না ভেবেই। কচিত কোন সঙ্কটময় মুহূর্তে, যখন আমাদের উচ্চাভিলাষের ধ্বংসস্তূপ আমাদেব পায়ের কাছে দেখতে পাই, তখনই অনুতাপ ও আক্ষেপের সঙ্গে উপলব্ধি করি যে জীবনটার কি অপব্যবহারই না করেছি! তখন চেঁচিয়ে উঠি, "আমরা এখানে কেন?" "এসবের মানে কি এবং এর পরে কোথায় যাব?" "হে ভগবান, আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে?" দ্রৌপদী কাঁদছেন, "আমার স্বামী নেই, পুত্র নেই, আত্মা নেই, ভাই নেই, বাপ নেই, এমন কি হে কৃষ্ণ, তুমিও নেই।"[২]

রয়েছে…সেই গভীরতম প্রদেশে, আত্মার অন্তরতম ও গুহ্যতম গভীরে ঈশ্বরেব স্থিতি অপরিহার্য, সত্য এবং বাস্তব।"

১। হে সর্বজ্ঞ, তুমি সর্বদা আমাদের কাছে আছ। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে যা কিছু পাপ আছে, তা তুমি সবই দেখতে পাও।

সর্বজ্ঞত্বং স্বয়ং নিত্যং সন্নিধৌ বর্তসে চ নঃ
অন্তর্বহিশ্চ যৎকিঞ্চিৎ পাপং তৎ পশ্যতি স্বয়ং।

২। নৈব মে পতয়ঃ সন্তি, ন পুত্রা, ন চ বান্ধবাঃ
ন ভ্রাতরো, ন চ পিতা, নৈব ত্বং মধুসূদন।

অর্জুন এক ভীষণ আত্মিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলেন। যখন তিনি তাঁর সামাজিক কর্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন যে সমাজ তাঁকে যে সকল কর্তব্য পালন করতে বলছে, তা তিনি কেন করতে যাবেন, তখন তিনি তাঁর সমাজবাদী আত্মার অন্তরালে গেছেন এবং একক ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তি-রূপে নিজেকে দেখছেন। এক ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের মধ্যে আগন্তুকের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখছেন। নবলব্ধ স্বাধীনতায় উদ্বেগ, নিঃসঙ্গতা, সন্দেহ ও নিরপত্তার অভাবের গভীর অনুভূতির উদ্ভব হয়েছে। তাকে যদি সার্থকভাবে কাজ করতে হয় ত এই সব অনুভূতিকে দমন করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য সিদ্ধান্ত ও ব্যবহারিক যোগ

কৃষ্ণের তিরস্কার ও সাহস দেওয়া

সঞ্জয় উবাচ

১। তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥

(১) সঞ্জয় বললেন

তাঁকে করুণাপ্লুত অশ্রুপূর্ণ লোচন ব্যাকুল চিত্ত ও বিষণ্ণ দেখে মধুসূদন (কৃষ্ণ) তাঁকে এই কথাগুলি বললেন।

শত্রুদের প্রতি অর্জুনের করুণার সঙ্গে ঐশী অনুকম্পার কোন সাদৃশ্য নেই। অর্জুনের করুণা কতকটা আত্মবিলাস, নিজের আত্মীয়স্বজন বধ করতে সঙ্কোচ থেকে জাত। আত্মবিলাপের ভাবাবেগ চালিত হয়ে অর্জুন তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে পিছিয়ে আসতে চাচ্ছেন দেখে গুরু তাঁকে তিরস্কার করছেন। কৌরবরা যে তাঁর আত্মীয়, এ ত আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল।

শ্রীভগবানুবাচ

২। কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥

(২) শ্রীভগবান বললেন, হে অর্জুন, এই সঙ্কট সময়ে তোমার মনের উপর এই ছায়া (বিষাদ) কোথা থেকে এল? এ ভাব ত মহৎ মনের অযোগ্য (আর্যদের প্রথাবহির্ভূত), স্বর্গলাভে বাধাদায়ী ও (পৃথিবীতে) কীর্তিনাশা।

অনার্যজুষ্টম—কেউ কেউ বলেন যে যারা একটা বিশেষ ধরনের আন্তরিক সংস্কৃতির ও সামাজিক প্রথার অনুগামী, যার জন্য সাহস, শিষ্টাচার, মহত্ত্ব ও অকপট আচরণ প্রয়োজন, তারাই আর্য।

অর্জুনের সন্দেহভঞ্জন করতে কৃষ্ণ আত্মার অবিনশ্বরতার প্রসঙ্গ তুলে তাঁর মর্যাদাবোধ ও ক্ষাত্র ঐতিহ্যের কাছে আবেদন করছেন। তাঁর কাছে

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রকাশ করছেন এবং সংসারে কি ভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হয় তার নির্দেশ দিচ্ছেন।

৩। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

(৩) হে পার্থ (অর্জুন), কাপুরুষতা পরিত্যাগ কর, তা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুঞ্জয় (অর্জুন), তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে উঠে বস।

অর্জুন এখনও সংশয়াবিষ্ট।

অর্জুন উবাচ

৪। কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥

(৪) অর্জুন বললেন, হে মধুসূদন, হে অরিসূদন (কৃষ্ণ), পূজার্হ ভীষ্ম ও দ্রোণকে যুদ্ধের সময় কি করে শরাঘাত করব ?

৫। গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥

(৫) এই সমস্ত সম্মানার্হ গুরুদের হত্যা করার চেয়ে ভিক্ষা করে খাওয়া ভাল।[১] তাঁরা যদিও তাঁদের নিজেদের লাভেচ্ছায় রত, তবুও তাঁরা আমার গুরুজন, তাঁদের হত্যা করে, পৃথিবীর যে সমস্ত বস্তু আমার ভোগে আসবে তা ত রুধিরসিক্তই হবে।

রুধির প্রদিগ্ধান—রক্তাপ্লুত। আমরা যদি ইতিহাসের রক্তসিক্ত পৃষ্ঠাগুলির পাত্রপাত্রীদের কথা সম্যকভাবে অনুভব করি, নারীর শোকোচ্ছ্বাস, শিশুর রোদনধ্বনি, দুর্দৈবের কাহিনী, অত্যাচার ও অবিচারের নানাপ্রকারের বৃত্তান্ত যদি আমাদের কানে পৌঁছয়, তা হলে মানুষের মন নিয়ে কেউই এ ধরনের রক্তাপ্লুত বিজয়ে আনন্দ পেতে পারে না। (সম্রাট অশোকের কলিঙ্গজয়ের কথা স্বতঃই মনে আসে —ইতি অনুবাদক)।

৬। ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।

১। মহানুভাবান-শ্রুতাধ্যয়ন-তপ-আচারাদি নিবন্ধনঃ প্রভাবো যেষাং তান হি মহানুভাবানিত্যকম্ বা পদম্। হিমং জাড্যং অপহন্তীতি হি মহা অদিত্যোঽগ্নির্বা তস্যেবানুভাবঃ সামর্থ্যং যেসাং তান্। (মধুসূদন) শেষের টীকা কষ্টকল্পনা।

(৬) জয় বা পরাজয়, কোনটা যে আমাদের পক্ষে শ্রেয়, তাই বুঝতে পারছি না। রণসজ্জায় সজ্জিত যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা আমাদের বিপরীতে রয়েছে, তারা হত হলে তো আমাদেরও বাঁচবার সাধ থাকবে না।

৭। কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ় চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

(৭) আমি অনুকম্পা (ভাবালুতা) জনিত দুর্বলতায় অভিভূত। আমার মন কর্তব্য নিরূপণে অসমর্থ, অতএব আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। আমাকে নিশ্চিত করে বল, কোনটা শ্রেয়? আমি তোমার আশ্রয়প্রার্থী ও শিষ্য। আমাকে উপদেশ দাও।

নিশ্চিতম—নিশ্চয় করে। অর্জুন যে শুধু হতাশা, উদ্বেগ ও সংশয়াচ্ছন্ন, তাই নয় তিনি নিশ্চিত হবার জন্য ব্যগ্র।

নিজের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারাই যৌক্তিকতা উন্মেষের প্রথম সোপান। নিজের সম্বন্ধে ত্রুটিবোধ হলেই বুঝতে হবে আত্মা সজীব। সজীব দেহ যেমন কোন স্থান কেটে গেলে বা আহত হলে তাকে সারিয়ে তুলতে পারে, তেমনি আত্মাও সজীব থাকলে তবেই আত্মিক উন্নতি সম্ভব হয়। অনুশোচনা দগ্ধ মানুষই উচ্চতর অবস্থায় নীত হতে পারে।

সাধকদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে সিদ্ধিলাভের মুখেও তারা সন্দেহ ও বিঘ্নদ্বারা আক্রান্ত হয়। আত্মার উপর আলোকসম্পাত হতে আরম্ভ হলেই অন্ধকার তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। অর্জুনের অন্তরে বাহিরে নানা বিঘ্ন, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের প্রতিরোধ, সংশয়, আশঙ্কা, প্রবৃত্তি ও বাসনাসমূহ। এদের সবাইকে বলি দিয়ে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হবে। যতক্ষণ না সমগ্র সত্তা আলোকিত হয় ততক্ষণ অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রাম চলবে।

শোকাভিভূত হয়ে ন্যায়ান্যায় নির্ধারণে অসমর্থ অর্জুন তাঁর নিজের আত্মস্থ ঈশ্বররূপ গুরুর কাছে নির্দেশ ও সন্দেহ নিরসন চাইছেন। নিজের উদ্ভাবিত উপায়ে মানুষের সব সময় কাজ হয় না। নিজের বহির্জগৎ যখন ধ্বংসোন্মুখ তখন ভিতরের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের অনন্ত করুণার শরণাপন্ন হয়ে আলোর সন্ধান করা ছাড়া উপায় নেই।

অর্জুন দার্শনিককে চান না, কেননা প্রজ্ঞায় তাঁর প্রয়োজন নেই। কাজের লোক রূপে তাঁর কর্মপদ্ধতির অর্থাৎ ধর্মের নিশানা দরকার, তাতেই

তাঁর সঙ্কটমোচনের আশা। "হে প্রভু, আমাকে কি করতে হবে, বলে দাও।"

অর্জুনের মত সাধকদেরও নিজের দুর্বলতা ও অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করে সেই উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ হয়, তাই করার জন্য উদগ্রীব হতে হবে।

৮। ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরানামপি চাধিপত্যম্॥

(৮) পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন ও সমৃদ্ধ রাজত্ব পেয়ে, এমন কি দেবতাদের অধিপতি হয়েও যে এই শোক, যার দ্বারা আমার ইন্দ্রিয়সকল শুকিয়ে যাচ্ছে, তা কি করে দূর হবে তা বুঝতে পাচ্ছি না।

অর্জুনের অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরসন চাই। তাঁর এক নূতন অখণ্ড সর্বব্যাপী চেতনার উন্মেষের প্রয়োজন।

সঞ্জয় উবাচ

৯। এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূবহ॥

(৯) সঞ্জয় বললেন, "হৃষীকেশ (কৃষ্ণ)-কে এই কথা বলে, প্রবল গুড়াকেশ (অর্জুন) গোবিন্দ (কৃষ্ণ)-কে বললেন, "আমি যুদ্ধ করব না।" তারপর চুপ করে রইলেন।

ন যোৎস্যে—আমি যুদ্ধ করব না। মনে হয় যেন উপদেশ চেয়েও, উপদেশ পাবার আগেই অর্জুন মন স্থির করে ফেলেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে শিক্ষা নিতে যাবার সময় তাঁর চিত্ত মুক্ত নয়। এতে উপদেষ্টার কাজ কঠিন হয়।

গোবিন্দ—এই কথা দ্বারা সর্বজ্ঞ এই ব্যঞ্জনা আসে। মধুসূদন[১]। তূষ্ণীম্ বভূব—স্তব্ধ হলেন। সত্যের বাণী স্তব্ধতার মধ্যে শোনা যায়।

১০। তমুবাচ হৃষীকেশ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥

(১০) হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র) উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত বিষণ্ণচিত্ত অর্জুনকে যেন হাসতে হাসতেই হৃষীকেশ (কৃষ্ণ) এই কথা বললেন।

১। গাং বেদলক্ষণাং বাণিং বিন্দতীতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ববেদোপাদানত্বেন সর্বজ্ঞম্।

সঙ্কটময় মুহূর্তে অর্জুনের মজ্জমান অন্তরে কৃষ্ণের দৈববাণী পৌঁছল। হাসি এইজন্য যে অর্জুনের যুক্ত্যাভ্যাসের চেষ্টার আসল রূপ তাঁর নজরে পড়েছে। আজকালকার ভাষায় বলা যায় ইচ্ছানুগামী চিন্তা (wishful thinking)। ত্রাণকর্তা ভগবান দুঃখী মানুষদের পাপ ও দুঃখের কথা সবই জানেন, কাজেই সেগুলির দিকে তাঁর কোমল অনুকম্পাময় ও উৎসুক দৃষ্টি।

আত্মা ও দেহের প্রভেদ—অবিনশ্বর বস্তুর জন্য শোক অনুচিত।

শ্রীভগবানুবাচ

১১। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

(১১) শ্রীভগবান বললেন, "যারা শোকের অযোগ্য তুমি তাদের জন্য শোক করছ, অথচ কথাগুলি জ্ঞানীর ভাষায় বলছ। পণ্ডিতগণ জীবিত বা মৃত কারুর জন্যই শোক করেন না।

কাশ্মীর সংস্করণের পাঠ "প্রজ্ঞাবান্ন অভিভাষসে" অর্থাৎ বুদ্ধিমান লোকের মত কথা বলছ না।[১]

উপদেষ্টা ১১-৩৮ সংখ্যক শ্লোকে সাংখ্যদর্শনের মর্ম সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছেন। সাংখ্য অর্থে কপিলমুনি প্রবর্তিত মতবাদ নয়, এ উপনিষদের শিক্ষা।

১২। ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরং ॥

(১২) এমন কোন কাল ছিল না, যখন আমি, তুমি বা এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না, এবং এর পরও এমন কোন্ সময় আসবে না, যখন আমরা আর থাকব না।

এই শ্লোকে যে একাধিকের কথা ব্যবহৃত হয়েছে, শঙ্করাচার্যের মত, সে

১। প্লটিনাসের মত তুলনীয়, "হত্যাই হোক, সকল প্রকারের মৃত্যুই হোক, বা নগর অধিকার ও ধ্বংসই হোক, সবই নাট্যমঞ্চের ব্যাপার বলে ধরতে হবে, এগুলি পট পরিবর্তন, নাটকীয় ভয় ও চীৎকার; কেননা এখানেও জীবনের নানা অভিশাপের মধ্যে সত্যকার মানুষ অর্থাৎ অন্তরাত্মা, শোক বা অনুশোচনা করে না, কিন্তু বাহিরের মানুষের ছায়াই জগতের নাট্যমঞ্চে অভিনয় করে থাকে।

Enneads III, ২-১৫। ইংরাজী অনুবাদ।

শুধু প্রচলিত প্রথানুযায়ী। তাঁর যুক্তি এই যে বিভিন্ন দেহ সকলের জন্যই বহু বচন দরকার, অদ্বিতীয় বিশ্বাত্মার ক্ষেত্রে তার কোন সার্থকতা নেই।[১]

রামানুজ কিন্তু বলেন যে কৃষ্ণ, অর্জুন ও নৃপতিদের পক্ষে যে পার্থক্য তা চরম এবং তাঁর মতে প্রত্যেক বিশিষ্ট আত্মাই অবিনশ্বর এবং সমগ্র বিশ্ব-জগতের সঙ্গে সমকালীন।

পরমাত্মা যে অনাদি ও অনন্ত সে প্রসঙ্গ এখানে তোলা হয় নি, এখানে আলোচ্য হল প্রায়োগিক অহং। প্রায়োগিক বিশ্বজগতে বহুবিধ অহং-এর অবস্থিতি তথ্যমূলক। প্রাতিস্বিক মাত্রই প্রাবস্থিক অবিদ্যমানতা থেকে পূর্ণ-বিদ্যমানতারূপ সত্তার উন্নীত হয়, অসৎ থেকে সৎ-এ। সাংখ্যদর্শনে আত্মাদের বহুতা স্বীকার্য, কিন্তু গীতা একের সঙ্গে বহুর সামঞ্জস্য করেছে। তিনি এক ক্ষেত্রজ্ঞ, তাঁর মধ্যেই আমাদের জীবন, গতি ও অস্তিত্ব। ব্রহ্ম সকল বস্তুর মূল কিন্তু তিনি নিজে বস্তু নন। ব্রহ্ম কালবশ নয়, কিন্তু কাল তাঁর অন্তর্গত। এই অর্থে জীবাত্মারাও আদিঅন্তহীন। আত্মাও ব্রহ্মসদৃশ, কেননা কার্য কারণ মূলতঃ অভিন্ন, "ব্রহ্মোহহং" "ত্বৎসৎ" প্রভৃতি পরিচিত বাক্য তারই সূচক। এই প্রসঙ্গে সুসো (Suso)র বাক্য তুলনীয় "সমস্ত জীবনই দিব্য সত্তার মধ্যে অনন্তকাল ধরে আছে; তাদের আদর্শ যিনি তাঁর মতই। যেটুকু তারা দৈবভাবের অনুগামী, সেটুকু সৃষ্টির পূর্ব থেকেই ছিল ঐশী সারসত্তার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে।"

সৃষ্টিকর্তা সগুণ ঈশ্বর, প্রায়োগিক বিশ্বজগতের সমকালীন। একদিক দিয়ে তিনি সমস্ত প্রয়োগজ অস্তিত্বগুলির সমগ্রতা। "প্রজাপতি জঠরে বিচরণ করেন। তিনি নিজে অজাত হয়েও বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন।"[২]

শঙ্কর বলেন, "সত্য কথা বলতে কি ঈশ্বরই একমাত্র দেহান্তর সঞ্চারী।"[৩] এই কথার সঙ্গে পাস্কালের উক্তি তুলনীয় "যতদিন না জগৎ শেষ হবে ততদিন খ্রীষ্টের সন্তাপের শেষ হবে না"। মানুষের উপর আঘাত তিনি বুক পেতে নেন। সৃষ্ট ভূতেদের অবস্থার জন্য তিনি কষ্ট পান। মুক্তআত্মারা

১। দেহ ভেদানুবৃত্ত্যা বহু বচনম্, নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ।

২। প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে। বাজসনেয়ি সংহিতা, একত্রিংশৎ ১৯ ও দ্বাত্রিংশৎ ৪।

৩। সত্যং নেশ্বরাদন্যৎ সংসারিন। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, প্রথম, ১, ৫।

কালে কষ্টভোগ করেন, কালান্তে শান্তি পান, যদিও তাঁরা বর্তমানেই দিব্য-জীবনে অংশগ্রহণ করেন। সগুণ ব্রহ্ম অবশ্য স্বেচ্ছায় সীমাবদ্ধ, আমরা কিন্তু অসহায় ভাবে সীমাবদ্ধ। তিনি প্রকৃতির লীলার কর্তা, আমরা সেই লীলার বিষয়। জীবাত্মা মোহগ্রস্ত হয়, কিন্তু বিশ্বাত্মা তা থেকে মুক্ত। ব্রহ্মাণ্ড লীলা যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন নানা বিশেষ বিশেষ গুণ সমন্বিত প্রাতিস্বিকের বহুতা থাকবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে পৃথক থাকা যায় না। মুক্ত-পুরুষ সত্য জেনেছেন এবং তার মধ্যেই বাস করেন কিন্তু বদ্ধজীব কর্মবন্ধনে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভ্রমণ করে।

১৩। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

(১৩) জীবাত্মার দেহে যেমন শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য ক্রমে ক্রমে আসে, তেমনি তার দেহান্তরও ঘটে, তাতে পণ্ডিতরা হতবুদ্ধি হন না।

বিষ্ণুস্মৃতি, বিংশ, ৪৯ তুলনীয়।

মানুষ জীবনমৃত্যু পরম্পরার মধ্যে দিয়ে অমরত্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। দেহান্তর মানে আত্মার পরিবর্তন নয়। কোন দেহধারণই স্থায়ী নয়।

১৪। মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

(১৪) হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত তাদের বিষয় গুণ সমূহের সংস্পর্শ থেকে শীত, গ্রীষ্ম সুখদুঃখ-বোধ আসে, এগুলি আসে যায়, কোনটাই চিরস্থায়ী নয়, অতএব হে ভরতকুলোদ্ভব (অর্জুন) তুমি সেগুলি সহ্য করতে শেখ।

সুখ দুঃখ শীত-গ্রীষ্মাদি বিপরীতগুলি সসীম ও আকস্মিক কারণসঞ্জাত কিন্তু ব্রহ্মানন্দ বিশ্বজনীন, স্বয়ংভব এবং বিশেষ বিশেষ কার্যকারণসম্বন্ধ নিরপেক্ষ। যে অহমিকা সম্বলিত অস্তিত্ব বহুবিধ বিশ্বের সংস্পর্শে আসে, তার সুখ-দুঃখের বৈচিত্র্যকে এই অবিভাজ্য সত্তা ধারণ করে। সুখদুঃখ-বোধ অভ্যাসবশে হয়। সফল হলে সুখী হতে হবে আর বিফল হলে কষ্ট পেতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা সম্পূর্ণ অবিচলিত চিত্তে তাদের সম্মুখীন হতে পারি। অহং জ্ঞানই সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং যতদিন তা দেহ ও জীবনের ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং জ্ঞান ও কর্মের জন্য তাদের উপর নির্ভর করে থাকবে, ততদিন তাকে সুখ-দুঃখ ভোগ

করতে হবে। কিন্তু মন যখন মুক্ত ও অনাসক্ত হবে, সেই শুদ্ধ প্রশান্তিতে ডুবে যাবে, যখন তার চেতনা প্রদীপ্ত হবে, তখন সে যা-কিছু ঘটবে, তাকেই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করবে, কেননা সে ভাল ভাবেই বুঝবে যে এই সব সংস্পর্শ আসে যায়, তার ওপর দিয়ে ঘটে যায় বটে, কিন্তু তার অংশ নয়।[১]

১৫। যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

(১৫) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যিনি এই সব দ্বারা পীড়া অনুভব করেন না, যিনি সুখ-দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করেন, সেই প্রাজ্ঞ অমৃতত্ত্বের অধিকারী হন।

প্রত্যেক দেহীই যে মৃত্যুর অধীন তাকে এড়িয়ে যেতে পারলেই অনন্ত জীবনলাভ হয় না। সে হ'ল জীবনমৃত্যুকে অতিক্রম করা। সুখ-দুঃখের বশ হওয়া, ঐহিক ঘটনায় বিচলিত হওয়া, তার জন্য কর্তব্যের পথ (নিয়তং কর্ম) থেকে বিচ্যুত হওয়া, এগুলি অবিদ্যাগ্রস্ততার লক্ষণ।

১৬। নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

(১৬) যা এখন নেই তা পরেও হবে না, আর যা আছে তা কখনও বিনষ্ট হবে না। এই দুই প্রকারের বস্তু (সৎ ও অসৎ) সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শীরা এই মীমাংসায় পৌঁছেছেন।

সদাখ্যম্ ব্রহ্ম—শঙ্কর যা আছে (সৎ) তার এইপ্রকার সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন যে তার সম্বন্ধে আমাদের চেতনা কখনও বিলুপ্ত হয় না আর যা নেই (অসৎ) সে সম্বন্ধে আমাদের চেতনা লোপ পায়।[২] বিষয়দের সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নানাবিধ হয়, কিন্তু অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা একই প্রকার। জগতের অপম্রিয়মাণ দৃশ্যপট রূপ যে অসৎ সে সততব্যক্ত নির্বিকার সৎকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

রামানুজের মতে দেহই অসৎ অর্থাৎ অবাস্তব আর আত্মাই সৎ।

মধ্ব শ্লোকটির প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে দ্বৈতভাবের পোষকতা দেখতে পান, "বিদ্যতে-অভাবঃ"। যা অপ্রকট (অব্যক্ত) প্রকৃতি তার বিনাশ নেই। সৎ অবশ্যই অবিনশ্বর।

১। Imitation তুলনীয়, ইন্দ্রিয় বাসনা দ্বারা আমরা এধারে ওধারে চালিত হই, কিন্তু কালান্তে তাদের থেকে আমরা কি পাই? শুধু বিবেকদংশন আর ভাবের অপচয়।

২। যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ, যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ।

১৭। অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥

(১৭) যিনি এই সমস্ত বিষয়কে ব্যাপ্ত করে আছেন তিনি অবিনশ্বর। কেহই এই অব্যয় সত্তার বিনাশ করতে পারে না।

ততম্—ব্যাপ্ত। অষ্টম অধ্যায়ের ২২,৪৬, নবমের ৪, একাদশের ৩৮ সংখ্যক শ্লোক ও মহাভারতের দ্বাদশ, ২৪০, ২০ দ্রষ্টব্য। শঙ্করাচার্য "ব্যাপ্তম্" কথাটি ব্যবহার করেছেন।

এমন কি পরমেশ্বরও আত্মাকে বিনাশ করতে পারেন না।[১] তার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। কারুরই অজ্ঞাত নয়।[২] যেসব গুণ পরমাত্মার পক্ষে অস্বাভাবিক সেইগুলির অধ্যারোপণ অর্থাৎ কল্পনাকে শাস্ত্রপাঠ দ্বারা দূর করা যায়, যা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাকে উন্মোচিত করা শাস্ত্রের কাজ নয় রামানুজ "আত্মতত্ত্ব" বলতে সাংখ্যিক বহুবিধার মধ্যে গুণজ ঐক্য ও সাম্য বলেছেন।

১৮। অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥

(১৮) নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় আত্মার এই দেহগুলি শেষ হবে বলে কথিত আছে। অতএব হে ভরতবংশোদ্ভব (অর্জুন), তুমি যুদ্ধ কর।

শরীরি বলতে এখানে জীবের আসল আত্মাকে বোঝাচ্ছে, "শারীরিক মীমাংসা"[৩] কথাটি তার প্রমাণ। ওর দ্বারা প্রাতিস্বিক আত্মের সম্বন্ধে বিচার বোঝায়। তা অপ্রমেয়, অর্থাৎ প্রমাণাতীত এই কারণে যে জ্ঞানলাভের সাধারণ উপায় দ্বারা তাকে জানা যায় না।

১৯। য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

(১৯) যিনি আত্মকে হন্তা বলে ভাবেন বা তাকে হত বলে মনে করেন, উভয়ই সত্যদর্শনে বিফল হয়েছেন, তাঁকে হত্যা করে যায় না, সেও কাউকে হত্যা করে না।

১। ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতীশ্বরোপি। শঙ্কর।

২। নহ্যাত্মা নাম কস্যচিদপ্রসিদ্ধো ভবতি। ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্য দ্বিতীয়, ১৮।

৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরঃ। তৃতীয়, ৪, ১।

এখানে গীতা-রচয়িতা আত্ম ও অনাত্ম, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখাচ্ছেন।[১]

২০। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(২০) সে কখনও জন্মায়ও না, কোন কালে মরেও না, একবার হলে আবার বিলুপ্তও হয় না। সে অজ, নিত্য, সনাতন এবং আদি। দেহ হত হলেও সে হত হয় না।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয়, ১৮-তে "ন বধ্যেঽস্য হন্যতে" কথাটি দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদ, অষ্টম, ১, ৫ ও দ্রষ্টব্য। আত্মকে "হয়ে থাকলে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা দিব্যাকারে নিত্য ও ঈশ্বর থেকে তার অস্তিত্ব সিদ্ধ।

শঙ্কর প্রথম পাদের শেষ অংশকে ভূত্বা-অভবিতা এইভাবে সন্ধিবিচ্ছেদ করেছেন।

২১। বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥

(২১) যিনি জানেন যে এ বস্তু অবিনশ্বর ও নিত্য, অসৃজিত ও অপরিবর্তনীয়, হে পার্থ (অর্জুন) তিনি কি করে কাউকে হত্যা করতে পারেন বা কারুকে দিয়ে হত্যা করাতে পারেন?

যখন আমরা জানি যে আত্ম অভেদ্য, তখন তাকে কি করে কেউ হত্যা করতে পারে?

২২। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(২২) লোকে যেমন ছেঁড়া পোশাক ফেলে দিয়ে নূতন পোশাক পরে, তেমনি দেহী জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নবীন শরীর পরিগ্রহ করে।

শাশ্বত এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যান না, কিন্তু দেহাত্মা এক বাসা থেকে আর এক বাসায় যান। সে প্রতিবার জন্মগ্রহণ করার সময় তার পূর্ব অভিব্যক্তি ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুসারে প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা

১। এমার্সনের "ব্রহ্ম" নামে কবিতায় আছে: রক্তাপ্লুত হন্তা যদি মনে করে সে হত্যা করেছে বা হত যদি মনে করে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তারা আমার সূক্ষ্ম কার্যের খবর রাখে না। আমি ধারণ করি, চলে যাই আবার ফিরে আসি।

গঠিত দেহ মন ও প্রাণ সংগ্রহ করে। মানসিক প্রকৃতি হ'ল বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান দেহ (অন্ন), জীবন (প্রাণ) ও মন রূপ তিন রকমের প্রকটতাকে ধারণ করে। যখন স্থূল ভৌত দেহ খসে যায়, তখনও আত্মার বাহন রূপে প্রাণময় ও মনোময় কোষ থেকে যায়। পুনর্জন্ম প্রাকৃতিক বিধি। বিভিন্ন প্রকারের জীবের মধ্যে বিষয়গত সম্পর্ক আছে। কঠোপনিষদের প্রথম, ৬-এ আছে: "মরব্যক্তি শস্যের মত পক্ব হয়, আবার শস্যের মতই পুনর্বার জন্মায়।" আত্মার পক্ষে দেহধারণ অপরিহার্য বলে মনে হয়। তাহলে দেহকে হত্যা করা কি ঠিক? মূর্ত অস্তিত্বময় জগতের একটা অর্থ আছে।

২৩। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

(২৩) এই আত্মাকে অস্ত্র দ্বারা কাটা যায় না, আগুন দ্বারা পোড়ানো যায় না, জল দ্বারা সিক্ত করা যায় না বা বাতাস দ্বারা শুকানো যায় না।

মোক্ষধর্ম, ১৭৪, ১৭ ও দ্রষ্টব্য।

২৪। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

(২৪) সে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অনার্দ্র্য, ও অশোষ্য। সে নিত্য সর্বব্যাপী, অচঞ্চল, অবিচল এবং সনাতন।

২৫। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥

(২৫) তাকে বলা হয় অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ও অবিকার্য। অতএব তার সেই স্বরূপ জেনে আর তোমার শোক করা উচিত নয়।

এই কটি শ্লোকে আগাগোড়াই সাংখ্যের পুরুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এ উপনিষদের ব্রহ্মন্ নয়। পুরুষ আকার ও চিন্তার অতীত, দেহ মন ও প্রাণে যে সব বিকার আসে, তাঁকে তা স্পর্শ করে না। এমন কি সকলের মধ্যে এক যে পরমাত্মা আছেন, তাঁর সম্বন্ধে এগুলি প্রয়োগ করলেও, তাঁকে অচিন্ত্য এবং অবিকার্য আত্ম এই অর্থে ধরতে হয়। অর্জুনের শোক অকারণ কেননা আত্মকে হত্যা করা যায় না। রূপান্তর হতে পারে, বস্তু আসে যায়, কিন্তু তাদের সকলের অন্তরালে যা আছে তা চিরস্থায়ী।[১]

১। ক্রিতো যখন জিজ্ঞাসা করেন "হে সক্রেতিস, কিভাবে তোমাকে কবরস্থ করব"

নশ্বরের জন্য শোক করা অনুচিত।

২৬। অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥

(২৬) হে মহাবাহো (অর্জুন), যদি তুমি এমনও ভাব যে আত্ম নিয়ত জন্মাচ্ছে আর নিয়ত মরছে, তাহলেও তোমার শোক করা উচিত নয়।

২৭। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

(২৭) জন্মালেই মৃত্যু সুনিশ্চিত, আর যে মরেছে, তার পুনর্জন্মও নিশ্চিত। কাজেই যা অপরিহার্য তার জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

"এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন মৃত ব্যক্তি না পুনরায় জন্মায়"[১] এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করলে আমাদের ধৈর্য ও মাত্রাজ্ঞান আসে।[২]

আমাদের অস্তিত্ব স্বল্পক্ষণস্থায়ী ও মৃত্যু নিশ্চয়। ন্যায়ের জন্য দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করা আমাদের মানবীয় মর্যাদার দাবী।

তা বলে মৃত্যু অনিবার্য বলে খুন, আত্মহত্যা বা যুদ্ধকে ভাল বলা যায় না। সব মানুষই মরবে জানলেও, ইচ্ছা করে অন্যের মৃত্যুকামনা করতে

সক্রেতিস উত্তর দেন, যেভাবে খুশী, কিন্তু তার আগে আসল আমি কে ধরতে হবে। বৎস ক্রিতো, আনন্দ কর এই ভেবে যে তুমি আমার দেহটাকেই সমাহিত করছ, আমাকে নয় এবং সেটাকে নিয়ে যা প্রচলিত প্রথা এবং যা তুমি উত্তম বুঝবে তাই করবে।

১। পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে। হিতোপদেশ।

২। গৌতম বুদ্ধ একমাত্র সন্তানের শৈশবাবস্থায়ই মৃত্যুতে শোকার্তা মাতাকে এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, "শহরে গিয়ে যে বাড়ীর কোন লোক এখনও মরে নি, এমন এক বাড়ী থেকে আমার জন্য কিছু সরষে চেয়ে আন।" মাতা ঘুরে ঘুরে দেখলেন যে এমন কোন পরিবার নেই, যাতে কেউ না কেউ মরেছে। তিনি আবিষ্কার করলেন যে জীবের বিধিই হচ্ছে যে তারা গত হবে।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী পতাচারা অনেক শোকার্তা মাতাদের এই সান্ত্বনা দিতেন বলে উল্লেখ আছে:

কেঁদ না, কেননা মানুষের জীবনই এই, সে অযাচিতভাবে আসে, যেতে না বললেও চলে যায়। আবার নিজেকে প্রশ্ন কর তোমার পুত্র এই সামান্যক্ষণ পৃথিবীতে অতিবাহিত করতে কোথা থেকে এসেছিল। একদিক থেকে এসেছিল, আর একদিকে চলে গেল… অতএব এখানে এবং এখান থেকে—তবে কান্না কেন? ভগ্নীদের গীতি (Psalms of the Sisters) Mrs. Rhys Davids কৃত ইংরাজী অনুবাদ (১৯০৯) পৃ, ৭৮।

পারি না। এ কথা সত্য যে সমস্ত জীবনই মৃত্যুতে শেষ হবে, সমস্ত অগ্রগতিই নশ্বর, ঐহিক অর্থে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু জীবনের প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতেই নিত্য রূপ ধরে, কালগত উন্মেষ সারলক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। যা সম্পূর্ণ কালবশ বা পরিবর্তনীয়, তার নিজস্ব কোন গুরুত্ব নেই। শাশ্বত পরিকল্পনাই সমস্ত সত্যের কেন্দ্রে, বিশ্বজাগতিক ঘটনাচক্রে পৃথিবীতে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হতে পারুক বা না পারুক।

২৮। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পবিদেবনা ॥

(২৮) জীবেবা প্রারম্ভে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত আবাব অন্তে অব্যক্ত। হে ভারত (অর্জুন), এব মধ্যে শোকের কি আছে ?

২৯। আশ্চর্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃনোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥

(২৯) কেউ তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়, কেউ তাঁকে বিস্ময়কব বলে বর্ণনা করে, কেউ তিনি কিরূপ অপূর্ব তাই শোনেন, কিন্তু শুনেও কেউ তাকে জানতে পারে না।

যদিও আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রত্যেক মানুষেরই অধিগম্য, তবু অতি অল্প লোকই তা পায় কেননা অল্প লোকেই তাকে পাবার জন্য আত্মসংযম, একান্তিক নিষ্ঠা ও অনাসক্তিরূপ মূল্য দিতে প্রস্তুত। চেষ্টা করলে সকলেই সত্যের দর্শন পেতে পারে, কিন্তু অনেকে চেষ্টা করা প্রয়োজনই মনে করে না। যারা প্রয়োজন মনে করে তাদেরও অনেকে সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়। আবার দ্বিধা বা সংশয় না থাকলেও, ব্যাপারটা কতখানি দুরূহ দেখে অনেকে পেছিয়ে যায়। অতি অল্পসংখ্যক লোকই সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

কঠোপনিষদ দ্বিতীয় ৭ দ্রষ্টব্য। "এমন কি দেখা, শোনা ও ঘোষণা করার পরও কেউ তাঁকে বুঝতে পারে নি।" শঙ্করাচার্য।

৩০। দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

(৩০) হে ভারত (অর্জুন), প্রত্যেকের দেহে যিনি বাস করেন তিনি নিত্য ও অবধ্য, সেই জন্য কোন জীবের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

মানুষ অমর আত্ম ও মর দেহের যোগ। একথা যদি মেনেও নি যে দেহ

স্বভাবতঃই মৃত্যুর অধীন, তবু আত্মের কল্যাণার্থই দেহকে রক্ষা করা প্রয়োজন। অবশ্য শুধু এটাই খুব সন্তোষজনক যুক্তি নয়। তাই কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

কর্তব্যবোধের কাছে আবেদন।

৩১। স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।

(৩১) তা ছাড়া তোমার নিজের কর্তব্যের কথা স্মরণ করেও দ্বিধা ত্যাগ করা উচিত, কেননা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ন্যায়যুদ্ধের অপেক্ষা শ্রেয়তর আর কিছুই নেই।

অর্জুনের স্বধর্ম বা আচরণবিধিতেই তাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বলে। প্রয়োজন হলে অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের সামাজিক কর্তব্য, সংসার ত্যাগ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। তার ধর্ম জোর করে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, "মাথা মুড়িয়ে"[১] সন্ন্যাসী হওয়া নয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে যোদ্ধার পক্ষে ন্যায়যুদ্ধের মত মহৎ কর্তব্য আর কিছু নেই। সেই কর্তব্য পালন করলেই স্বর্গলাভ হয়।

৩২। যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

(৩২) হে পার্থ (অর্জুন), সেই ক্ষত্রিয়েরা সুখী যাদের কাছে স্বর্গদ্বার উন্মোচনকারী ন্যায়যুদ্ধ আপনিই উপস্থিত হয়।

ক্ষত্রিয়ের সাংসারিক আরাম ও ভোগ দ্বারা সুখ হয় না, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করাই তার আসল সুখ।[২]

১। মহাভারত দ্রষ্টব্য। দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধর্মো ন মুণ্ডনম্।—শান্তিপর্ব ২৩, ৪৬।
"যে ক্ষত থেকে রক্ষা করে সেই ক্ষত্রিয়" ক্ষতাদ্‌ যো বৈ ত্রায়তীতি স তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ।
মহাভারত, দ্বাদশ, ২৯, ১৩৮।

২। "হে পুরুষশার্দুল, দুই ধরনের লোক সূর্যমণ্ডল ছিন্ন করতে পারে (ব্রহ্মমণ্ডলে পৌঁছতে পারে)। একজন যোগমগ্ন সন্ন্যাসী, আর অন্যজন যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে হত যোদ্ধা।"
দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্যমণ্ডল ভেদিনৌ
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ।
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩২, ৬৫।

৩৩। অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥

(৩৩) কিন্তু তুমি যদি এই ন্যায়যুদ্ধে না যোগ দাও তাহলে তুমি কর্তব্যভ্রষ্ট হবে, তোমার কীর্তি নষ্ট হবে ও পাপ হবে।

যখন ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে, তখন মিথ্যা ভাবপ্রবণতা, দুর্বলতা বা কাপুরুষতার জন্য যে তাতে যোগদানে বিরত থাকে, সে পাপী।

৩৪। অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥

(৩৪) তাছাড়া লোকে চিরকাল তোমার এই অকীর্তির কথা আলোচনা করবে। মানী ব্যক্তির অখ্যাতি মরণের চেয়েও হানিকর।

৩৫। ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম॥

(৩৫) বড় বড় বীরেরা মনে করবেন যে তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত আছ। যাঁরা তোমাকে উচ্চ সম্মান দিয়ে আসছেন তাঁরা তোমাকে হেয় মনে করবেন।

৩৬। অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম॥

(৩৬) তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে তোমার শত্রুরা অনেক অকথা কথা বলবে। তার থেকে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে?

গীতায় যে মর্মকথা অর্থাৎ প্রশংসা ও নিন্দাকে সমান ভাবে দেখা তার সঙ্গে এই শ্লোকের কথার কত পার্থক্য।

৩৭। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

(৩৭) যুদ্ধে হত হলে তোমার স্বর্গলাভ হবে আর জয়ী হলে পৃথিবী তোমার অধিকারে আসবে, অতএব হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), তুমি যুদ্ধ সম্পর্কে স্থিরসংকল্প হয়ে উত্থান কর।

পরাতাত্ত্বিক সত্যের দিক থেকেই দেখি বা সাংসারিক কর্তব্যের দিক থেকেই দেখি আমাদের পথ স্পষ্ট। ঠিক মনোভাব নিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারলেও আমাদের উন্নতি হতে পারে, কৃষ্ণ পরের শ্লোকে সেই ভাবের কথা বলছেন।

৩৮। সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
তততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥

(৩৮) সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান ভাবে দেখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তাহলে তোমার পাপ হবে না।

অথচ আগের শ্লোকে কৃষ্ণ নিন্দাজনিত লজ্জা, স্বর্গলাভ, মর্তে রাজ্যলাভ প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। সাংসারিক বিচার-বিবেচনার কথা বলার পর এইবার তিনি ঘোষণা করছেন যে সমভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। অবস্থান্তরের বাসনায় অধীর না হয়ে হৃদয়াবেগের হ্রাসবৃদ্ধির দোলায় অসহায় ভাবে না দুলে, আমরা যে অবস্থায়ই না স্থিত হই, নিজের কর্তব্যকর্মে যেন রত থাকি। যদি শাশ্বতের উপর নিষ্ঠা থাকে এবং তার সত্তা যদি উপলব্ধি করতে পারি তো সংসারের দুঃখ আমাদের বিচলিত করতে পারবে না।[১] যিনি জীবনের আসল লক্ষ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাতেই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তিনিই মহাত্মা। তাঁর যদি আর সমস্ত কেড়ে নেওয়া হয়, তিনি যদি নিঃসঙ্গ, শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেও বেড়ান, তিনি যদি কোনও মানুষের কাছ থেকেই সহানুভূতি না পান, তাহলেও তিনি হাসিমুখে নিজ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবেন, কেননা তিনি আন্তরিক মুক্তিলাভ করেছেন।

যোগের অন্তর্দৃষ্টি।

৩৯। এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥

(৩৯) হে পার্থ (অর্জুন), তোমাকে সাংখ্যের উপদেশ শোনানো হল। এইবারে যোগের উপদেশ শোন। তুমি যদি বুদ্ধি দ্বারা তাকে গ্রহণ করতে পার, তাহলে তোমার কর্মবন্ধন ছিন্ন হবে।

গীতায় ব্যবহৃত সাংখ্য শব্দ ঐ নামে অভিহিত দার্শনিক মতবাদ অর্থে ব্যবহৃত নয়, আর যোগ মানেও পাতঞ্জল যোগ নয়। সাংখ্যের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায় পুরুষ (আত্ম) ও প্রকৃতি (অনাত্ম)-র দ্বিত্ব স্পষ্ট। গীতা কিন্তু

১। লুথারের কথা তুলনীয় "এবং যদিও তারা আমাদের জীবন, ঐশ্বর্য, মান, স্ত্রী-পুত্র সব হরণ করে, তবু তাতে তাদের সামান্যই লাভ হবে, কেননা এ সবই নশ্বর, ঈশ্বরের রাজত্বই চিরকাল থাকবে।"

তার উর্ধ্বে উঠে, সর্বেশ্বর এক পরমাত্মার সত্তা ঘোষণা করেছে। সাংখ্যে অচ্যুতের[১] অপরোক্ষানুভূতির একটা বুদ্ধিগত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সে হল জ্ঞানযোগ। কাজ করার যোগ কর্মযোগ। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। এ পর্যন্ত যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা পণ্ডিতী তর্কের বা আলোচনার বিষয় নয়। সে অন্তর্লোকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত হওয়া চাই। গীতায় সাংখ্যের ঝোঁক জ্ঞান ও বাসনা ত্যাগের উপর আর যোগের ঝোঁক কর্মের উপর। যে দেহ ও আত্মাকে পৃথক বলে জানে এবং জানে যে আত্ম অবিনাশী এবং সাংসারিক ঘটনা দ্বারা অবিচলিত, তার কি কর্তব্য? উপদেষ্টা বুদ্ধিযোগ বা বুদ্ধির একাগ্রতার কথা ক্রমশঃ প্রকাশ করছেন। কতকগুলি ধারণা রচনা করার ক্ষমতাই বুদ্ধি নয়। প্রত্যভিজ্ঞা ও বিনিশ্চয়ও তার ক্রিয়া। বুদ্ধিকে এমনভাবে শানিত করতে হবে যাতে অন্তর্দৃষ্টি, স্থৈর্য ও সমতা বোধ আসে। মনকে ইন্দ্রিয়বশ না রেখে বুদ্ধি দ্বারা চালিত করতে হবে, কেননা বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তৃতীয় অধ্যায়, ৪২। মনকে বুদ্ধিযুক্ত করতে হবে।

গীতা রচনার সময়ে সম্প্রদায়গত সাংখ্যের সংগঠনের সময়, তার প্রভাব এখানে স্পষ্ট। তার মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং বন্ধন ও মুক্তি আসলে তাঁর সম্বন্ধে খাটে না। মূলতঃ তারা জাগতিক চব্বিশটি ভাবের অন্যতম, বুদ্ধির কাজ। প্রকৃতি থেকে জড়ের পাঁচটি মৌলিক অবস্থার ক্রমোন্মেষ হয়, ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, জড়ের পাঁচটি সূক্ষ্ম ধর্ম আসে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, বুদ্ধি বা মহৎ অর্থাৎ বিনিশ্চয়কারী ক্ষমতা, সংকল্প, অহঙ্কার, মন ও তার পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারলেই মোক্ষ। গীতার ঈশ্বরবাদ এই মতের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। মনরূপ বল্গা দ্বারা চালিত ইন্দ্রিয়াশ্বযুক্ত দেহ রথের চালক বুদ্ধি। আত্ম বুদ্ধির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। সারথি বুদ্ধি মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রিত করে আত্মকে জানতে সহায়তা করে, এই কথা কঠ উপনিষদে আছে।[২] বুদ্ধি যদি আত্মচেতনা দ্বারা

১। মধ্বাচার্য ব্যাসদেবের এই কথাটি উদ্ধৃত করেছেন :

শুদ্ধাত্মতত্ত্ববিজ্ঞানং সাংখ্যমিত্যভিধীয়তে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "সাংখ্যযোগাধিগম্যম্", ষষ্ঠ ১৩ দ্রষ্টব্য।

২। তৃতীয়, ৩।

উদ্বুদ্ধ হয়, এবং তাকেই জীবনপথের পথপ্রদর্শক করে, তাহলে বুদ্ধির পথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ্যের সঙ্গে মিলে যাবে। আত্মার আলোক যদি বুদ্ধিতে উপযুক্তভাবে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি যদি সকল প্রকার অস্পষ্ট করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়, তাহলে সে আলোক অবিকৃত থাকবে ও বুদ্ধি ও আত্মার মিলন ঘটবে। অহমিকা ও ভেদবোধের স্থলে এমন ঐক্যের বোধ জন্মাবে যাতে সকলের মধ্যে প্রত্যেককে এবং প্রত্যেকের মধ্যে সকলের দর্শন পাওয়া যাবে।

গীতায় সাংখ্য আর যোগে কোন অমিল নেই। তাদের লক্ষ্য একই, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় ভিন্ন।

৪০। নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

(৪০) এ পথে কোন চেষ্টাই বিফল হয় না এবং কোন বিঘ্নই অনিষ্ট করতে পারে না। এ ধর্মের সামান্য আচরণও মহৎ ভয় থেকে উদ্ধার করে।

কোন পদক্ষেপই বিফল হয় না, প্রত্যেক মুহূর্তই লাভ। এই সংগ্রামে প্রত্যেক প্রয়াসই গুণ বলে বিবেচিত হয়।

৪১। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

(৪১) হে কুরুনন্দন (অর্জুন), (স্থির) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই, কিন্তু অস্থিরচিত্ত অনিশ্চিত ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহু শাখাবিশাখায় বিভক্ত ও অনন্ত দিকে প্রসারিত।

অনিশ্চিত বুদ্ধি নানা দিকে প্রধাবিত হয় কিন্তু অপর পক্ষে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধি একমুখী ও একাগ্র। এক মহান, চিত্তাকর্ষক লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ দ্বারাই মনুষ্যজীবন সিদ্ধ হয়, অনন্ত সম্ভাব্যতার দিকে অসংযত ছুটাছুটি করে লাভ হয় না। একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। চিত্তবিক্ষেপ আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা, এ থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে পরম সত্তার সত্যকার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, প্রকৃতি, লিঙ্গ, জাতি ও ফুলের রহস্যের মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। ঐ প্রকার অভিজ্ঞতা সমর্থিত একাগ্রতাই পরম গুণ, তাকে গোঁড়ামিতে বিকৃত করা যায় না।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অজ্ঞ

৪২। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থঃ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥

৪৩। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥

(৪২-৪৩) যারা সবিশেষ বিচারে অভ্যস্ত নয়, তারা বেদের শব্দার্থকেই একমাত্র সত্য বলে জানে। যারা বলে আর কিছু নেই তাদের প্রকৃতি কামনাপূর্ণ ও স্বর্গলাভের জন্য ব্যাকুল। তারা নানা ক্রিয়াকর্মের ফলকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করে, অথচ ঐ সব ক্রিয়াকর্মে জন্মান্তরের পথই সুগম হয়। তাবা ভোগৈশ্বর্যেব জন্য নানা বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানের বিধান দেয়।

উপদেষ্টা এখানে আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের সঙ্গে বিশুদ্ধ কর্মের পার্থক্যও দেখাচ্ছেন। বৈদিক যাগযজ্ঞ বাস্তব ফললাভের আশায় করা হয়, কিন্তু গীতার লক্ষ্য সর্বপ্রকার স্বার্থজড়িত কামনা ও কর্মত্যাগের দিকে। এতে সমস্ত জীবনকেই সত্যকার শ্রদ্ধাযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান বলে ধরতে হয়।

মুণ্ডক উপনিষদ, প্রথম, ২, ১০-এ আছে: "এই নির্বোধরা মনে করে যাগ-যজ্ঞ (ইষ্টাপূর্তম) করাই একমাত্র ধর্ম, তাছাড়া আর কোনও গুণের প্রয়োজন নেই। এরা স্বর্গে সুখভোগ কবে আবার মর্তে ফিরে আসে।" এই প্রসঙ্গে ঈশ উপনিষদ ৯, ১২; কঠোপনিষদ দ্বিতীয়, ৫-ও দ্রষ্টব্য। বৈদিক আর্যবা মহিমান্বিত শিশুর মতই জীবনকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। তারা মানবজাতির যৌবনের প্রতীক, তখন জীবন ছিল সতেজ ও সুমিষ্ট, কোনরকম দুঃস্বপ্নের ছায়া তার উপর পড়ে নি। অথচ তাদের পরিণত বয়সের স্থিরবুদ্ধিরও অভাব ছিল না। এখানে অবশ্য গীতা রচয়িতা বেদ বলতে বেদের কর্মকাণ্ডের কথাই বলেছেন, তার মধ্যে বেদের সমস্ত উপদেশ সীমাবদ্ধ নয়। যাই হোক বেদ আমাদের ফললাভের আশায়ই কর্মে প্রবৃত্ত হতে বলে, তা সে অস্থায়ী স্বর্গবাসই হোক, বা নূতন উন্নততর জীবনে জন্মলাভ করেই হোক, কিন্তু বুদ্ধিযোগ আমাদের মোক্ষ-লাভের পথ দেখায়।

৪৪। ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াহৃপহৃতচেতসাম্‌
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

(৪৪) যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত এবং যাদের মন বেদের ঐ সকল

বাক্য দ্বারা আপ্লুত, ন্যায় ও অন্যায় নিশ্চিতভাবে নির্ণয়ক্ষম বিচারশক্তি তাদের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না।

তারা ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হবে না।[১] যে বুদ্ধির যথোচিত শিক্ষা প্রয়োজন তা তার স্বধর্ম থেকে বিচলিত হয়।

৪৫। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

(৪৫) বেদের বিষয় হল ত্রিগুণবিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি, কিন্তু হে অর্জুন, তুমি এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হও, সমস্ত দ্বৈতভাব (বিপরীত ভাব) দূর কর, বিশুদ্ধিতে সদা স্থির থাক, আহরণ ও রক্ষণে যত্ন ত্যাগ করে আত্মস্থ হও।

নিত্যসত্ত্ব—অর্জুনকে ত্রিগুণাতীত হয়ে সত্ত্বগুণে স্থির থাকতে বলা হচ্ছে। ত্রিগুণের অন্যতম সত্ত্বগুণের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, কেননা আগেই তো তাঁকে ত্রিগুণকে অতিক্রম করে যেতে উপদেশ দেওয়া হল। এখানে সত্ত্ব মানে শাশ্বত সত্য। কিন্তু শঙ্কর ও রামানুজ একে সত্ত্বগুণ অর্থেই নিয়েছেন। বৈষয়িক জীবনধারণ কবার জন্য যেসব আচাব-অনুষ্ঠান দরকার তা ত্রিগুণ সমন্বিত। কিন্তু সিদ্ধিরূপ উন্নততর সুফলের জন্য আমাদের পরম সত্যের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখতে হবে। কিন্তু মুক্তপুরুষের বাহ্যিক ব্যবহার সত্ত্বগুণবিশিষ্টদের মত হবে। তার কর্ম ধীব ও নিরাসক্ত। তার কর্মফলে লোভ নেই, কিন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ড যারা অনুসরণ করে, তারা নিষ্কাম কর্ম করে না।

যোগক্ষেম অর্থে নূতনের আহরণ ও পুরাতনের রক্ষণ।[২]

আত্মবান—আত্মস্থ, সদাজাগ্রত।[৩] আপস্তম্ব বলেন আত্মলাভের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।[৪] যিনি অনাদি ও অব্যয়, যিনি অমর, যিনি অজ্ঞাত তাঁকে জানাই মানুষের আসল পবিণতি। এই পরিণতির থেকে যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই তাহলে উপনিষদের ভাষায় আমরা আত্মঘাতী হব।[৫]

১। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যম্, পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ; তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে। ইতি শ্রীধরাচার্য।

২। অনুপাত্তস্য উপাদানং যোগঃ, উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ।

৩। অপ্রমত্তশ্চ ভব। শঙ্কর।

৪। আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে। ধর্মসূত্র, প্রথম, ৭, ২।

৫। আত্মহনো জনাঃ।

৪৬। যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

(৪৬) সর্বত্র প্রচুর জলপ্লাবিত অঞ্চলে যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়সমূহের প্রয়োজন হয় না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেদোক্ত ফলের প্রয়োজন থাকে না।

"যে নদী থেকে জল পায়, সে যেমন কূপাদিকে কোন গুরুত্ব দেয় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানী যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকে গুরুত্ব দেন না।[1] বুদ্ধচিত্তদের কাছে অনুষ্ঠানাদির মূল্য নগণ্য।

নিষ্কাম কর্ম

৪৭। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

(৪৭) কর্মে মাত্র তোমার অধিকার আছে, তার ফলে কখনও নয়। কর্মফল লাভ যেন তোমার উদ্দেশ্য না হয়; আবার কর্ম বর্জনেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।

এই বিখ্যাত শ্লোকেই অনাসক্তির সারমর্ম। আমরা যখন কাজ করি, চাষ করি বা ছবি আঁকি, গান করি বা চিন্তা ক'রি, তখন যদি আমরা যশ, ধন ইত্যাদি বাহ্য ফললাভের কথা চিন্তা করি, তাহলেই আমরা নিরাসক্তি থেকে ভ্রষ্ট হব। সৎ সংকল্প ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাব্রতী হওয়া ছাড়া আর কিছুরই কোন মূল্য নেই। সফলতা ও বিফলতা সম্পূর্ণরূপে পাত্রের উপর নির্ভর করে না, আরও অনেক বিষয় দ্বারা তা প্রভাবিত হতে পারে। জর্দানো ব্রিউনো (Giordano Bruno) বলেন, "আমি সংগ্রাম করেছি এই যথেষ্ট, জয় নিয়তির হাতে।"

৪৮। যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

(৪৮) হে ধনঞ্জয়, আসক্তি পরিত্যাগ করে সফলতা ও বিফলতাকে সমান চোখে দেখে যোগস্থ হয়ে কাজ করে যাও। মনের সমভাবকেই যোগ বলে।

১। ন তে (জ্ঞানিনঃ) কর্ম প্রশংসন্তি কূপং নদ্যাং পিবন্নিব।
মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪০, ১০।

যোগস্থ—আন্তরিক স্থৈর্যে অচঞ্চল। সমত্বং—আন্তরিক ভারসাম্য। এই হল আত্মজয়। ক্রোধ, অভিমান, গর্ব ও দুরভিলাষকে জয় করা।

সম্পূর্ণ প্রশান্তভাবে ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন থেকে আমাদের কাজ করা উচিত। যিনি আন্তরিক বিধির প্রেরণায় কাজ করেন, তাঁর থেকে যে খেয়ালমত কাজ করে সে নিকৃষ্ট।

যে ফললাভের আশায় কাজ করে সে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, আর যে প্রজ্ঞার সাধনা করে সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়।[১]

৪৯। দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

(৪৯) হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা শুধু কর্ম নিকৃষ্ট অতএব বুদ্ধির শরণাপন্ন হও। যে ফললাভের আশায় কর্ম করে, সে কৃপার্হ।

বুদ্ধিযোগ—অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৭ সংখ্যক শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

৫০। বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥

(৫০) যিনি (ঈশ্বরে) তার বুদ্ধি যুক্ত করেছেন (অর্থাৎ যিনি স্থিতধীঃ) তিনি এখানেই শুভাশুভ উভয়ই বর্জন করেন। অতএব যোগযুক্ত হবার চেষ্টা কর, যোগ কর্মেরই কৌশল।

নীতিজ্ঞ কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ এ বিচার করেন, কিন্তু যোগী তার থেকেও উচ্চস্তরে। তিনি স্বার্থবর্জিত বলেই অকল্যাণে অপারগ। শঙ্করাচার্যের মতে সফলতা বিফলতায় সম মনোভাবই যোগ। যিনি ঈশ্বরে মনসংযোগ করে তাঁর যথাকর্তব্য পালন করেন, তাঁর সেই প্রকার মনোভাবই থাকে।[২]

৫১। কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥

(৫১) জ্ঞানীরা বুদ্ধিকে (ঈশ্বরে) সংযুক্ত করে কর্মফল ত্যাগ করেন

১। শঙ্করাচার্যের উক্তি "দ্বিপ্রকারং চ বিত্তং মানুষং দৈবং চ. তত্র মানুষং বিত্তং কর্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনম্, বিদ্যা চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তিসাধনম্। দ্বিতীয়, ১১।

২। স্বধর্মাখ্যেষু কর্মসু বর্তমানস্য যা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া।

শ্রীধরও বলেছেন, "কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কর্মকুর্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্মুক্তাঃ।

এবং জন্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে সর্বপ্রকার দুঃখবিহীন অবস্থা প্রাপ্ত হন।

বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁরা জন্ম-মৃত্যু বন্ধনমুক্ত হন এবং মোক্ষ নামক বিষ্ণুর উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হন। সে অবস্থা সর্বপ্রকার সন্তাপবিহীন।[১]

৫২। যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥

(৫২) যখন তোমার বুদ্ধি মোহজনিত আবিলতাকে অতিক্রম করে যাবে, তখন যা শোনা হয়েছে এবং যা পরে শোনা যাবে, উভয় সম্বন্ধেই উদাসীন হয়ে পড়বে।

যিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে শাস্ত্র অপ্রয়োজনীয়। (দ্বিতীয় ৪৬, ষষ্ঠ ৪৪ দ্রষ্টব্য)। পরম জ্ঞান লাভ করলে মানুষ বেদ-উপনিষদের গণ্ডীর বাহিরে চলে যায়। শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ততে।

৫৩। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলাবুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥

(৫৩) যখন তোমার বুদ্ধি বেদের নানা অর্থজনিত বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে স্থির ও সমাধিমগ্ন হবে তখন তুমি অন্তর্দৃষ্টি (যোগ) লাভ করবে।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—বেদ বচন দ্বারা বিভ্রান্ত। বহু চিন্তাধারা ও আচরণ বৈদিক প্রমাণের সমর্থন দাবী করে, কাজেই তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

সমাধি—আপাতদৃষ্টিতে চেতনাহীনতা মনে হলেও, আসলে এ সর্বোত্তম সংবিৎ।[২] সে অবস্থায় মন পরমাত্মায় লগ্ন হয়। বুদ্ধিযোগ দ্বারা আমরা বৈদিক কর্মকাণ্ডকে অতিক্রম করে ফলাসক্তি ত্যাগ করে নিজকর্তব্যে রত হই। কাজ করতে হবে কিন্তু শান্ত, অবিচলিত ভাবে, সেটা কাজের চেয়েও বড। কি করব, সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন কেমন করে করব, কি মনোভাব নিয়ে আমরা কাজে লিপ্ত হব।

১। জীবন্ত এব জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ পদং পরমং বিষ্ণোর্মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্বোপদ্রবরহিতম্।

—শঙ্করাচার্য।

২। প্লেটো যখন "আত্মাকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের উপর একাগ্র" করতে বলেন, তখন এই কথাই বলেছেন। Phaedo, 83 A.

সিদ্ধ প্রাজ্ঞের লক্ষণ

অর্জুন উবাচ

৫৪। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌॥

(৫৪) অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ ব্যক্তিদের লক্ষণ কি কি? হে কেশব (কৃষ্ণ), স্থিরবুদ্ধি লোক কিভাবে কথা বলেন, কি ভাবে বসেন, কিভাবেই বা চলাফেরা করেন?

হিন্দু জীবনাদর্শের শেষ আশ্রম সন্ন্যাসে আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ ত্যাগ ও সামাজিক কর্তব্য বিসর্জন। প্রথম আশ্রম শিষ্যত্ব গ্রহণ (ব্রহ্মচর্য), দ্বিতীয় গার্হস্থ্যধর্ম পালন, তৃতীয় বানপ্রস্থ অবলম্বন, চতুর্থ ও শেষ আশ্রমে সর্বত্যাগ। যাঁরা গার্হস্থ্য জীবন বর্জন করে নিরাশ্রয় জীবন অবলম্বন করেন, তাঁরাই ত্যাগী। এ অবস্থায় যে কোন সময়েই যাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ অন্য তিন স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েই এখানে পৌঁছয়। সন্ন্যাসীরা বাচ্যার্থে সংসারে মৃত, এমন কি তাঁরা যখন সংসার ত্যাগ করে পরিব্রাজক (নিরাশ্রয় ভ্রাম্যমান) ব্রত নেন, তখন তাঁদের শাস্ত্রসম্মত ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়। এই উন্নত আত্মারা সংসারে না থেকেও, নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা সংসারকে প্রভাবান্বিত করে যান। তাঁরাই সামাজিক বিবেকের আধার। তাঁদের ভাষা দ্বিধাহীন ও দৃষ্টি স্বচ্ছ। হিন্দু ধর্মীয় সংস্থায় উৎপন্ন হলেও, তাঁরা তাকে অতিক্রম করে যান এবং তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী প্রভুত্ববাদীদের ভ্রষ্টাচারী ক্ষমতা ও আদর্শবর্জিত সমাজনীতির অবাধ প্রয়োগে বাধা। যে চরম মূল্যবোধ থেকে অন্য সামাজিক মূল্যবোধ উদ্ভূত হয়, তার সার্থকতার সাক্ষ্য তাঁদের অতিসামাজিক জীবন। তাঁরাই প্রাজ্ঞ এবং অর্জুন সেই সব লোকেদের সহজবোধ্য বিশিষ্ট লক্ষণের কথা জানতে চাইছেন।

শ্রীভগবান উবাচ

৫৫। প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

(৫৫) শ্রীভগবান বললেন, হে পার্থ, যখন কেউ মনের সমস্ত বাসনা ত্যাগ করেন, যখন কেউ নিজ অন্তরেই তৃপ্তিলাভ করেন তখন তাঁকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলে।

নেতিবাচক ভাবে বলতে গেলে এ অবস্থা স্বার্থবুদ্ধিহীনতা, আর সোজা-সুজি বলতে গেলে ব্রহ্মে একাগ্র নিবেদন।

৫৬। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

(৫৬) যার মন দুঃখে বিচলিত হয় না, সুখেও উল্লসিত হয় না, যিনি কাম ক্রোধ ভয় বর্জিত, তাঁকেই স্থিতধী মুনি বলে।

এখানে বাসনা ও প্রবৃত্তির দমন ও আত্মজয়ের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।[১]

৫৭। যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

(৫৭) যাঁর কোথাও আকর্ষণ নেই, যাঁর শুভ হলেও আনন্দ নেই, অশুভের উপরও বিদ্বেষ নেই, তার বুদ্ধি স্থির (প্রজ্ঞায়)।

ফুল ফোটে ও শুকিয়ে যায়। তার জন্য প্রথমকে প্রশংসা করা বা দ্বিতীয়কে নিন্দা করা চলে না। যা কিছু ঘটছে তাকেই বিনা উত্তেজনা, ব্যথা বা বাধায় গ্রহণ করতে হবে।

৫৮। যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

(৫৮) কচ্ছপ যেমন নিজের দেহাংশ খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে, তেমনি যিনি সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে গুটিয়ে নিতে পারেন তাঁরই বুদ্ধি স্থির (প্রজ্ঞায়)

৫৯। বিষয়াবিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

(৫৯) দেহী যদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের উপর ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার না করেন তাহলে সে-সব বিষয়ে নিবৃত্ত হন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগের স্বাদ থেকে যায়। কিন্তু পরমের দর্শন পেলে সে স্বাদও চলে যায়।

এখানে গীতা-রচয়িতা বাহ্য বৈরাগ্য ও আন্তরিক ত্যাগের পার্থক্য বোঝাচ্ছেন। আমরা ভোগে নিবৃত্ত হতে পারি কিন্তু ভোগবাসনা থেকে

১। লুক্রেসিয়াস বলেছেন,—"আচ্ছাদিত প্রস্তরের দিকে অবিরাম চেয়ে থাকা বা সমস্ত বেদীর কাছে যাওয়া, জমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হওয়া বা দেবমন্দিরের দিকে হাত তুলে অর্চনা করা বা পশুরক্তে মন্দির আপ্লুত করা কিম্বা নানারূপ মানত করাকে ধর্মাচরণ বলে না। সকলকে শান্ত চিত্তে দেখাকেই ধর্ম বলে।" De Rerum Natura.

যেতে পারে। কিন্তু পরমের দর্শনে বাসনাও থাকে না।[১] দেহ ও মন উভয়কেই সংযত করতে হবে। দেহের স্বেচ্ছাচার মুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়, বাসনার স্বেচ্ছাচার থেকেও পরিত্রাণ চাই।

৬০। যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

(৬০) হে কৌন্তেয় (অর্জুন), যে মানুষ বিচক্ষণ ও যত্নসহকারে প্রয়াসী (সিদ্ধিলাভের জন্য), চিত্তবিভ্রমকারী ইন্দ্রিয়েরা তার মনকেও জোর করে বিচলিত করে।

৬১। তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(৬১) সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করে আমাতে একাগ্রভাবে মনকে সংযুক্ত করা উচিত, কেননা যিনি ইন্দ্রিয়কে বশে আনতে পেরেছেন, তাঁর বুদ্ধিই স্থির (প্রজ্ঞায়)।

মৎপর—পাঠান্তরে তৎপর।

আত্মসংযম বুদ্ধির ব্যাপার নয়। সে হল সংকল্প ও আবেগের ব্যাপার। সর্বোচ্চের দর্শন পেলে আত্মসংযম সহজ হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক দ্রষ্টব্য। আদি যোগশাস্ত্র ঈশ্বরবাদী ছিল। যোগসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ২৪ সং শ্লোক তুলনীয়। ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

৬২। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

(৬২) ইন্দ্রিয়বিষয়সকলে মনোসন্নিবেশ করলে তাতে আকর্ষণ হয়, আকর্ষণ থেকে কাম জন্মায়, কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হয়।

কাম—বাসনা। অতি প্রবল বাহ্যজগতের শক্তির মতই বাসনা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে। তার দ্বারা আমরা মহিমামণ্ডিত কাজেও প্রবৃত্ত হতে পারি, আবার অশ্রদ্ধেয় কাজেও লিপ্ত হতে পারি।

১। কালিদাসের উক্তি—উত্তেজনার হেতু সামনে থাকা সত্ত্বেও যার মন উত্তেজিত হয় না, সেই সত্য সাহসী।

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ। কুমারসম্ভব, প্রথম, ৫৯।

৬৩। ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

(৬৩) ক্রোধ থেকে মোহ আসে, মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে, স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিনাশ হয়, আর বুদ্ধি নষ্ট হলে সর্বনাশ হয়।

বুদ্ধিনাশ—ন্যায়ান্যায় বোধ লোপ হওয়া।

আত্মা যখন প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত হয়, তখন তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি অস্পষ্ট হয়, আর মানুষের সর্বনাশ হয়। এর প্রতিকারের জন্য সংসার থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা ইন্দ্রিয় নিরোধ করা নয়, অন্তরের মধ্যে ডুবে যাওয়াই প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ঘৃণা করাও যেমন অন্যায় তাতে অনুরক্ত হওয়াও তেমনি অন্যায়। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে মনোরথ থেকে খুলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাকে উপযুক্ত বল্গা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করাই প্রয়োজন।

৬৪। রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

(৬৪) সংযতমনা ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহের মধ্যে বিচরণ করেন এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষ উভয়কেই বর্জন করে পূতভাব লাভ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। স্থিতপ্রজ্ঞের কোন স্বার্থ-বিজড়িত লক্ষ্য থাকে না বা ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তিনি বিচলিত হন না। যা ঘটে তাকে তিনি অনুরাগ বা বিদ্বেষ ব্যতিরেকেই বরণ করে নেন। কিছুর উপরই তাঁর লোভ নেই, কারুকে তিনি হিংসাও করেন না। তাঁর বাসনাও নেই, দাবীও নেই।[১]

৬৫। প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥

(৬৫) ভাব শুদ্ধ হলে সকল দুঃখের অবসান হয়; এইরূপ পবিত্র-ভাবাপন্ন মানুষের বুদ্ধি স্থির হয় (আত্মপ্রশান্তির মধ্যে)।

১। ঋষিদের নিম্নলিখিত বর্ণনা তুলনীয়।

ঊর্দ্ধরেতাস্তপস্যুগ্রো নিয়তাশী চ সংযমী
শাপানুগ্রহয়োঃ শক্তঃ সত্যসন্ধো ভবেদ্ ঋষিঃ
তপোনির্ধূতপাপমানঃ যথা তথ্যাস্তি
বেদবেদান্তভত্ত্বজ্ঞার্থয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ।

৬৬। নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥

(৬৬) অসংযত ব্যক্তির বুদ্ধি থাকে না, চিন্তায় একগ্রতার ক্ষমতা লোপ পায়, একাগ্রতাবিহীন লোকের শান্তি থাকে না এবং অশান্তচিত্তে সুখ কোথায় ?

৬৭। ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥

(৬৭) মন যখন চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের পিছনে ধাবমান হয়, তখন তা প্রজ্ঞা হরণ করে, যেমন জলে ভাসমান পোতকে হাওয়ায় চালিয়ে নিয়ে যায়।

৬৮। তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

(৬৮) অতএব হে মহাবাহো (অর্জুন), যাঁর ইন্দ্রিয়গণ তাদের সকল বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত, তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৬৯। যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

(৬৯) যখন অন্য সকলের রাত, তখন সংযমী আত্মা জাগ্রত থাকেন আর অন্য সবাই যা দেখে জেগে ওঠে তাতে তত্ত্বদর্শী মুনিরা রাত্রির (অন্ধকার) দেখেন।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের জাঁকজমক দ্বারা অন্য সকলে যখন আকৃষ্ট তখন ঋষি সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত। অজ্ঞানীরা যে বিষয়ে নিদ্রামগ্ন বা উদাসীন, সেই সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি সজাগ। অজ্ঞদের বৈপরীত্যময় জীবনই কর্মের সময় বা দিন, তত্ত্বজ্ঞানীরা সেই আত্মার অন্ধকারকে রাত্রি বলে বিবেচনা করেন। গ্যয়েটের (Goethe) উক্তি স্মরণীয় : "নিদ্রার সঙ্গে জাগরণের যে সম্পর্ক, ভ্রমের সঙ্গে সত্যেরও তাই।"

৭০। আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

(৭০) পরিপূর্ণ সমুদ্রে যেমন জলরাশি অনবরত পড়লেও তা অচঞ্চল, তেমনি কামনাসকল অন্তরে প্রবেশ করলেও যিনি বিচলিত হন না, তিনিই শান্তি পান। যে বাসনাতেই রত হয়, সে শান্তি পায় না।

৭১। বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

(৭১) যিনি সমস্ত কামনা বিসর্জন করে নিস্পৃহ নিরহঙ্কার হয়ে কর্ম করেন, তিনিই শান্তি পান।

উপনিষদের সেই সুখ্যাত বাক্যটি স্মরণীয়ঃ "মানুষের মন দুই প্রকার, পবিত্র ও অপবিত্র। যে শুধু বাসনা চরিতার্থ করার জন্য উদ্গ্রীব, সে মন অপবিত্র, আর বাসনার আকর্ষণ যার নেই সেই মন পবিত্র।"[১]

চরতি—কর্ম করেন। স্বজ্ঞাতে যাকে বৃহৎ ও মহৎ বলে বুঝতে পারা যায়, তারই সাধনে তিনি স্বতঃ ও তৎপরতার সঙ্গে নিজেকে অপরিমেয় ভাবে উৎসর্গ করেন।

শান্তিম্—মর্তলোকেব সকলপ্রকার সন্তাপের অবসান।[২]

৭২। এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥

(৭২) হে পার্থ (অর্জুন), এই হল দিব্য অবস্থা (ব্রাহ্মীস্থিতি)। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হলে আর মোহ থাকে না। অন্তিম সময়ে (মৃত্যুকালে)-ও যদি কেহ এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহলেও তিনি দিব্যানন্দ লাভ করেন (ব্রহ্মনির্বাণ)।

ব্রাহ্মীস্থিতি—অনন্ত জীবন।

নির্বাণম্—মোক্ষম্ ইতি শঙ্করাচার্য।

নির্গতং বানং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্যে ব্রহ্মণি তন্ নির্বাণম্। নীলকণ্ঠ।

বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধাবস্থা বোঝাবার জন্য নির্বাণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ধম্মপদে আছেঃ "স্বাস্থ্যই সব চেয়ে বড় লাভ, সন্তোষ সব থেকে বড় ঐশ্বর্য, শ্রদ্ধাই সর্বোত্তম বন্ধু এবং নির্বাণ সব চেয়ে বড় সুখ।"[৩]

১। মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধং এব চ, অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কাম-বিবর্জিতম্।,

২। সর্বসংসারদুঃখোপরমস্তলক্ষণাং, নির্বাণাখ্যাম্। শঙ্কর।

৩। ২০৪। মহাভারতের ১৪, ৫৪৩৩ দ্রষ্টব্য।

বিহায় সর্বসংকল্পান বুদ্ধ্যা শারীরমানসান্
স বৈ নির্বাণমাপ্নোতি নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥

প্লেটোর উক্তি তুলনীয়ঃ "জীবনের পথে যে সমস্ত ক্লেদ লেগেছে, যা সে ইচ্ছা করে

নীট্‌শের অতিমানব ও আলেক্‌জাণ্ডারের দেববাহকদের সঙ্গে উপরোক্ত মুনিদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। আনন্দ, প্রসন্নতা, আন্তরিক শক্তি এবং মোক্ষ সম্বন্ধে চেতনা, সাহস, উদ্দেশ্যসাধনে তৎপরতা এবং ঈশ্বরে স্থিত জীবন এই সব তাঁদের লক্ষণ। মানবিক অভিব্যক্তির উন্মেষশালী বৃত্তিগুলির তাঁরা দ্যোতক। তাঁদের অস্তিত্ব, চরিত্র এবং সংজ্ঞান দ্বারা তাঁরা ঘোষণা করেন যে মানবতা তার অনুমিত সীমার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে এবং অভিব্যক্তির উচ্ছ্বাস নবীন উচ্চতর স্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা আমাদের সৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে আশা করছেন যে আমরা আমাদের বর্তমান স্বার্থপরতা ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারব।

প্রজ্ঞাই মোক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কিন্তু এই প্রজ্ঞার সঙ্গে ঈশ্বরে ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মপ্রবৃত্তির কোন বিরোধ নেই। জীবিত অবস্থায়ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মে স্থিত থাকেন ও পার্থিব অশান্তি থেকে নিস্তার পান। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিঃস্বার্থ সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন।

ইতি............সাংখ্যযোগোনাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই হল জ্ঞানযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

লাগায় নি, যাকে এড়িয়ে যাবার সর্বদা চেষ্টা করেছে, তাকে ফেলে দিয়ে, নিজেকে নিজের মধ্যে সংহৃত করে, পবিত্র অবস্থায় যে আত্মা বিগত হয়, এবং দেহ থেকে নিজের বিচ্ছেদ যার লক্ষ্য ও বিচারের বিষয় হয়, সেই রকম প্রস্তুত আত্মা সেই অদৃশ্যলোকে যান, যা দিব্য, অমর ও জ্ঞানালোকিত।" Phaedo, sec 68,

আদর্শপুরুষ, জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগারূঢ়, গুণাতীত বা ভক্ত এঁদের বর্ণনা মূলতঃ একই রূপ। ষষ্ঠ ৪-৩২, দশম ৯-১০, দ্বাদশ ১৩-২০, ত্রয়োদশ ৭-১১, চতুর্দশ ২১-২৫, ষোড়শ ১-৩; অষ্টাদশ ৫০-৬০ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ বা কর্মপদ্ধতি

অতএব কাজ করাই বা কেন ?

অর্জুন উবাচ

১। জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব॥

(১) হে জনার্দন, যদি তোমার মতে বুদ্ধির (পথ) কর্মের (পথ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে হে কেশব, তুমি আমাকে এই হিংস্র কাজে প্রবৃত্ত হতে কেন বলছ ?

বিশেষ ফললাভের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা যায় তা যে নিষ্কাম নিরাসক্ত কর্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট এই উপদেশের ঠিক অর্থ অর্জুন বুঝতে পারেন নি, সেইজন্যই তিনি ভেবেছেন সকল কর্মের অপেক্ষাই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাই জিজ্ঞাসা করছেন যে জ্ঞান যদি কর্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তবে এই ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত হতে আমাকে উপদেশ দিচ্ছ কেন ? জ্ঞানলাভের সাংখ্যপদ্ধতি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে কর্ম অবান্তর।

২। ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

(২) আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বাক্য দ্বারা তুমি আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করছ। এখন নিশ্চিত করে বল যে কোন্ একটি উপায়ে (আমি) সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গললাভ করব।

ইব—অসঙ্গতি শুধু আপাতদৃষ্টিতে। উপদেষ্টা অর্জুনকে বিভ্রান্ত করতে চান নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্জুনের বোধে অসুবিধা হচ্ছে।[১]

জীবনই কর্ম ; ফললাভে নিরাসক্তি প্রয়োজন।

শ্রীভগবান উবাচ

৩। লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥

১। পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি আত্মানমৈবম্ ভাতীতি বশব্দেনোক্তম্। শ্রীধরাচার্য।

(৩) শ্রীভগবান বললেন: "হে নিষ্পাপ, এ জগতে জীবনযাপনের দুই প্রকার পদ্ধতি আছে তা আমি আগেই বলেছি, ধ্যানক্ষম লোকেদের জন্য জ্ঞানযোগ আর কর্মক্ষম লোকেদের জন্য কর্মযোগ।

আধুনিক মনোবিদ্‌দের মত গীতাকার ও সাধকদের দুই প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন, অন্তর্বৃ'ত (Introverts) যাদের অন্তরের ভাবজগতে ভ্রমণ করার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, আর বহির্বৃ'ত (Entroverts) যাদের বহির্জগতে কর্মলিপ্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে যাদের অন্তর্লোক গভীর আত্মিক ভাবনায় মগ্ন থাকতে চায় তাদের জন্য জ্ঞানযোগ, আর তেজস্বী কর্মপ্রিয় লোকদের জন্য কর্মযোগ। কিন্তু এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ চূড়ান্ত নয়, কেননা প্রত্যেক মানুষই অল্পবিস্তর একই সঙ্গে অন্তর্বৃ'ত ও বহির্বৃ'ত।

গীতানুসারে মোক্ষলাভের উপায়রূপে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই সমান উপযোগী, এবং কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য সেটা উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগের উপর নির্ভর করে। তা বলে এর একটা পথ বেছে নিলে, অন্য পথটা বর্জনীয় নয়, উভয় পথই পরস্পরের পরিপূরক। পথ একই, ভিন্ন ভিন্ন অংশ। "দুই ধরনের জীবনেরই বেদে সমর্থন পাওয়া যায়, কর্মের পথ ও ত্যাগের পথ"[১]। দুই জীবনের ধরণেরই মূল্য সমান। আচার্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিসংবাদী নয়। শঙ্করাচার্য স্বীকার করেছেন কর্মে ও ব্রহ্মজ্ঞানে অসঙ্গতি নেই। প্রজ্ঞালাভের উপায়রূপে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই সাধকের, লোকদের কাছে আদর্শ স্থাপনের জন্য কর্ম করতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী এবং গীতার উপদেষ্টা উভয়ের কাছেই কর্মে অহং জ্ঞান ও ও ফলাসক্তি বর্জনীয়।[২]

১। দ্বাবিমবথ পন্থানো যস্মিন্ বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
প্রবৃত্তিলক্ষণোধর্মঃ নিবৃত্তিশ্চ বিভাবিত।"
মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪০, ৬।

২। অভিনবগুপ্ত এই শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন:
ন ক্রিয়ারহিতং জ্ঞানং ন জ্ঞানরহিতা ক্রিয়া
জ্ঞানক্রিয়াবিনিষ্পন্নঃ আচার্যঃ প উপাশহা।
ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্য, দ্বিতীয়, ১১

৪। ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

(৪) কর্মবিরতি দ্বারাই লোক কর্ম থেকে মুক্তি পায় না। আবার ত্যাগ দ্বারাই কেহ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।

নৈষ্কর্ম—সেই অবস্থা যখন কর্মের কোন প্রভাব থাকে না।

স্বাভাবিক বিধি অনুসারে আমরা কর্মফল দ্বারা আবদ্ধ। প্রত্যেক ক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আছে, সেইজন্য তা পরিণামী জগতে আত্মাকে বন্ধন করার কারণ। কাজেই তা থেকে সংসারের উর্দ্ধে উঠে পরমে লীন হওয়ার পক্ষে বাধা জন্মায়। কিন্তু প্রয়োজন কাজ ত্যাগ করা নয়, স্বার্থপর বাসনা ত্যাগ।

৫। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

(৫) কেননা কাজ না করে কেউ ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না, স্বভাবজ উদ্যমে সকলকেই অসহায় হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হয়।

যতদিন দেহ ধারণ করছি, ততদিন কর্ম থেকে নিস্তার নেই। ক্রিয়া ছাড়া জীবন রক্ষা করা যায় না।[১] আনন্দগিরি দেখিয়েছেন আত্মবেত্তা গুণ দ্বারা চালিত হন না কিন্তু যে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে বশে আনতে পারে নি সে গুণ দ্বারা কর্মে চালিত হয়।

মুক্তপুরুষ মাত্রই কর্মে বিরত হন, কেননা কর্ম পরম অবস্থা থেকে চ্যুতি, মূঢ়তায় প্রত্যাবর্তন করা, এই যে মত, তা এখানে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। জীবন যত দিন আছে, ক্রিয়া অনিবার্য। ভাবনাও একটা ক্রিয়া, বাঁচাও এক ক্রিয়া এবং এই সব ক্রিয়ারই নানা ফল আছে। বাসনা-মুক্ত হওয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহ থেকে মুক্ত হওয়াই আসল অক্রিয়তা, সকল প্রকার ক্রিয়া থেকে বাস্তব ভাবে নিবৃত্ত থাকা নয়। মুক্তপুরুষের কর্ম থাকে না এ কথা যখন বলাই হয়, তখন তার অর্থ এই যে তাঁর কর্মের

১। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার তুলনায়—চোখ না দেখে পারে না (The eye cannot choose but see), কানকে বন্ধ করে রাখতে পারি না (We cannot bid the ear be still), যেখানেই তারা থাকে আমাদের দেহ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় অনুভব করে। (Our bodies feel where'er they be against or with our will)

ব্যক্তিগত প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এ অর্থ নয় যে তিনি কর্মবিমুখ হয়ে নিষ্ক্রিয়তার পরম সুখে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর যেভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিও সেইভাবে কর্ম করেন। অর্থাৎ প্রয়োজন বা অজ্ঞতা দ্বারা বাধ্য না হয়ে এবং কাজ করার সময়ও তাতে জড়িয়ে না পড়ে। যখন অহং জ্ঞান থাকে না, তখন কর্মের উৎস অন্তরের গভীরে থাকে যেখানে গোপনে থেকে ব্রহ্ম তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মুক্তপুরুষ নিষ্কাম, নিরাসক্তভাবে সর্বভূতে এক হয়ে যখন কর্মে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি তাঁর অমর দিব্য পরমাত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অন্তর্লোকের গভীরতম প্রদেশের প্রেরণা দ্বারা চালিত হ'ন।

৬। কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

(৬) যিনি কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়বিষয়ের চিন্তা করতে থাকেন, তিনি মিথ্যাচারী ভণ্ড ও বিমূঢ়।

আমরা বাহ্যতঃ কাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, কিন্তু কাজের উৎস যে সব বাসনা তাকে যদি নিবৃত্ত না করি তাহলে সংযমের আসল অর্থ বুঝতেই বিফল হব।

৭। যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥

(৭) হে অর্জুন, যিনি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন এবং অনাসক্ত হয়ে কর্মেন্দ্রিয়গুলি দিয়ে কর্মযোগে প্রবৃত্ত হন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

মানুষের সংকল্প বিধিনিষেধের কঠোরতার উপর জয়ী হতে পারে। ঐহিক বস্তুসকলকে আমাদের তৃপ্তিসাধনের যন্ত্র বলে ভাবলে চলবে না। আমাদের যে শান্তি সাধুতা ও নিরীহতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, তা যদি আমাদের ফিরে পেতে হয় ত সমস্ত বস্তুকে পরমসত্তার বিভিন্ন প্রকাশ বলে দেখতে হবে এবং তাকে গ্রাস করার ও অধিকার করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে এই অনাসক্ত ভাবের বিকাশের জন্য ধ্যান প্রয়োজন।

৬ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান মাত্র বাহ্যত্যাগের নিন্দা করেছেন এবং আন্তরিক নিরাসক্তি-রূপ আসল ভাবকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

যজ্ঞের গুরুত্ব

৮। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাঽপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥

(৮) তুমি তোমার নির্দিষ্ট কর্ম করে যাও, কেননা নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে সক্রিয়তা ভাল, এমন কি নিষ্ক্রিয়ভাবে জীবনযাত্রাও নির্বাহ করা চলে না।

৯। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

(৯) যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ছাড়া অন্য কর্ম দ্বারা লোকে আবদ্ধ হয়। অতএব হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), অনাসক্ত হয়ে কর্মরূপ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও।

শঙ্করাচার্য এখানে যজ্ঞকে বিষ্ণুর সঙ্গে সমার্থক বলেছেন। রামানুজ যজ্ঞের বাচ্যার্থই গ্রহণ করেছেন। সমস্ত কার্য ঈশ্বরে উৎসর্গ করে আত্ম-বলিদানের ভাবে করতে হবে। মীমাংসা দর্শনে যে যজ্ঞের জন্য মাত্র কার্য করতে বলা হয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়ে গীতায় আর একটু যোগ করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ কাজ করার সময় ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করতে হবে। এইভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হলে, অপ্রতিরোধ্য কর্মের বন্ধনক্ষমতা থাকবে না। যজ্ঞকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদের মনের নিকৃষ্ট অংশকে প্রকৃষ্ট অংশের কাছে বলি দিতে হবে। বৈদিক দেবতাদের জন্য অনুষ্ঠেয় ধর্মাচরণ এখানে ব্রহ্মের নামে সৃষ্ট জগতের সেবায় পরিণত হয়েছে।

১০। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥

(১০) পুরাকালে প্রজাপতি মানুষকে যজ্ঞের সঙ্গেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "এই দিয়ে তোমরা বংশবৃদ্ধি কর এবং এ তোমাদের কামধেনুর মত অভীষ্ট ফল দিক।

কামধুক্—পুরানোল্লিখিত ইন্দ্রধেনু, যার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। নিজের কর্তব্য-কর্ম করলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

১১। দেবান্ ভাবয়তাঽনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

(১১) এইগুলি (যজ্ঞ) দ্বারা তোমরা দেবতাদের পোষণ কর এবং দেবতারাও তোমাদের পোষণ করুন, পরস্পরের পোষণ দ্বারা তোমরা পরম শ্রেয় লাভ করবে।

মহাভারতের শান্তি-পর্বে, ৩৪০, ৫৯-৬২ শ্লোকে দেব-মানবের পরস্পর নির্ভরতার কথা প্রায় এই ভাষায়ই বর্ণনা করা হয়েছে।

১২। ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ॥

(১২) যজ্ঞদ্বারা পুষ্ট দেবগণ তোমাদের অভীষ্ট ফলদান করবেন। যে এই সমস্ত দান ভোগ করে প্রতিদানে কিছুই দেয় না, সে চোর।

১৩। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

(১৩) যে সৎ লোকেরা যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, তাদের সর্বপাপ মোচন হয়, কিন্তু যে দুষ্ট লোকেরা নিজেরা খাবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে তারা পাপই ভোজন করে।

মনুসংহিতার তৃতীয়, ৭৬, ১১৮ তুলনীয়।[১]

১৪। অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥

(১৪) অন্ন থেকে জীবের উৎপত্তি, বৃষ্টি থেকে অন্নের উৎপত্তি, যজ্ঞ বৃষ্টি নিয়ে আসে এবং কর্ম থেকে যজ্ঞের উদ্ভব হয়।

মনুসংহিতার তৃতীয়, ৭৬ তুলনীয়।

১৫। কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

(১৫) জেনো, কর্ম (যজ্ঞাদি) ব্রহ্ম (বেদ) থেকে উৎপন্ন, আর ব্রহ্ম অবিনশ্বর থেকে উদ্ভূত। অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন।

কর্মের মূল অবিনশ্বরের মধ্যে। পরমব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় হলে জগৎ ধ্বংস পাবে। জগৎই এক বিরাট যজ্ঞ। আমরা ঋগ্বেদে (দশম, ৯০) পড়ি যে এক পুরুষকে বলি দিয়ে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হল। এই মহাযজ্ঞ দ্বারা জগতের পরিকল্পনা রক্ষা করা হয়। দেহীদের কর্ম যেমন ভৌতিক প্রয়োজন, তেমনি নৈতিক প্রয়োজনও।[২]

ব্রহ্মকে আবার প্রকৃতি বলে ধরা হয়েছে যেমন চতুর্দশ অধ্যায়ে ৩-৪

১। কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি। ঋগ্বেদ, দশম, ১১৭, ৬।

২। শ্রীধর বলেন, "যজমানাদি ব্যাপাররূপং কর্ম ব্রহ্ম বেদঃ, কর্ম তস্মাৎ প্রবৃত্তম্।

সংখ্যক শ্লোকে। প্রকৃতি ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত এবং সমস্ত জাগতিক প্রক্রিয়ার মূল তারই মধ্যে।

১৬। এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি॥

(১৬) এই জগতে এইভাবে যে চক্র ঘুরতে আরম্ভ হ'ল তাকে যে সহায়তা না করে সে দুষ্টপ্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। হে পার্থ, তার জীবনই বৃথা।

এই শ্লোক কয়টিতে দেব ও মানবের মধ্যে আদান-প্রদান রূপ যজ্ঞ সম্বন্ধে যে বৈদিক ধারণা, তাকেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবেদের পরস্পর নির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হয়েছে। যজ্ঞভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ ভগবানের প্রিয়। ঈশ্বর সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা[1] "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"।[2] যজ্ঞই পরম। যজ্ঞ আবার জীবনেরও বিধি। প্রাতিস্বিক ও ব্রহ্মাণ্ড পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। মানবিক জীবন ও জাগতিক জীবনের মধ্যে অনবরত আদান-প্রদান হচ্ছে। যে মাত্র নিজের জন্য জীবনযাপন করে, তার জীবন বৃথা। দেবতা ও মানবের সহযোগিতা আছে বলেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। কেবল যজ্ঞ দেবতাদের অর্চনার জন্য নয়, ব্রহ্মে নিবেদনের জন্য, দেবতারা ব্রহ্মেরই বিবিধ রূপ। চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে যজ্ঞের ক্রিয়া ও উপাদান, দাতা ও গ্রহীতা, লক্ষ্য ও বিষয় সবই ব্রহ্ম।

আত্মতৃপ্তি

১৭। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥

(১৭) কিন্তু যে আত্মেই প্রীত, আত্মেই তৃপ্ত ও আত্মেই সন্তুষ্ট, তার কোন কর্তব্য-কার্য নেই।

সে কর্তব্য-ভাব থেকে মুক্ত। সে কর্তব্যবোধ থেকে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না বা তার অস্তিত্বের ক্রমোন্নতির জন্যও কাজ করে না। তার সিদ্ধ প্রকৃতি স্বতঃই কর্মলীলায় বিকশিত হয়।

১। পঞ্চম, ২৯

২। তৈত্তিরীয় সংহিতা, প্রথম, ৭, ৪।

১৮। নৈব তস্য কৃতেনার্থ নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

(১৮) সেইরূপ ইহলোকে কৃতকার্যের জন্য তার কোন লভ্য নাই, এবং অকৃতকার্য দ্বারাও কিছু সিদ্ধ হবে না। তার কোন স্বার্থের জন্য সর্বভূতের কারুর উপরই নির্ভর করতে হয় না।

পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে যদিও মুক্ত আত্মার সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা কিছুই অর্জন করার নেই এবং তিনি আত্মরতি ও আত্ম-তৃপ্তিতে সম্পূর্ণ সুখী, তবু জগতের কল্যাণের জন্য তিনি নিষ্কাম কর্মে লিপ্ত হতে পারেন।

১৯। তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্মসমাচার।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

(১৯) অতএব অনাসক্ত ভাবে সর্বদা কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন করে যাও, কেননা নিরাসক্ত কর্ম দ্বারাই মানুষ পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে নিরাসক্ত কর্ম যজ্ঞাদিভাবাপন্ন কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার শেষোক্ত কর্ম স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন কি উপলক্ষ হলে মুক্ত পুরুষরাও কর্মে প্রবৃত্ত হন।[১] যদিও এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে অনাসক্ত কর্ম করে পরমকে পাওয়া যায়, শঙ্কর বলেন যে কর্ম দ্বারা আমাদের মন পূত হয়, এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ কর্ম দ্বারা মনের পবিত্রতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সিদ্ধিলাভ হয়।[২]

১। যোগবাশিষ্ঠ তুলনীয়ঃ "তত্ত্বজ্ঞানীর ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হওয়া বা নিবৃত্ত হওয়ায় কিছু আসে যায় না। অতএব কাজের উপলক্ষ ঘটলে তিনি কাজ করে যান।" আবার, "কিছু কাজ হোক বা না হোক, আমার পক্ষে সবই সমান। কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলব কেন? আমি ত উপলক্ষ্য পেলে কাজ করে যাই।"

জ্ঞাস্তনার্থঃ কর্মত্যাগৈঃ নার্থঃ কর্ম সমাশ্রয়ৈঃ।
তেন স্থিতং যথা যদ যৎতৎ তথৈব করোত্যসৌ॥ ষষ্ঠ, ১৯৯।
মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন
যথা প্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্মণি ক আগ্রহঃ। ঐ ২১৬।

২। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ। ভগবদগীতার শঙ্করভাষ্যের, তৃতীয়, ৪-ও দ্রষ্টব্য।

অন্যের আদর্শ স্বরূপ হও।

২০। কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥

(২০) জনকাদি কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। জগৎকে রক্ষা করার জন্যও তোমার কাজ করা উচিত।

জনক মিথিলার রাজা ও রামপত্নী সীতার পিতা। তিনি ব্যক্তিগত কর্মবোধ পরিত্যাগ করেই রাজত্ব করতেন। শঙ্করও বলেছেন যে সাধারণ লোকেরা পাছে বিপথগামী হন, এই ভেবেই জনকাদি কর্মে প্রবৃত্ত হতেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি কর্মে রত হয়েছে গুণা গুণেষু বর্তন্তে। এমন কি যাদের সত্যদর্শন ঘটেনি তারাও আত্মশুদ্ধির জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, ১০।

লোকসংগ্রহ—জগৎ রক্ষা। লোকসংগ্রহ দ্বারা জগতের ঐক্য, সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ সূচিত হচ্ছে। সংসার যদি ভৌতিক দুঃখ ও নৈতিক অবনতির সাগরে ডুবতে না চায়, যদি সাধারণ জীবন-যাত্রা শিষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়া কাম্য হয়, তাহলে সামাজিক ক্রিয়া ধর্মীয় নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। ধর্মের লক্ষ্য হল সমাজকে পরমার্থের দিকে আকর্ষণ করা ও পৃথিবীতে সৌভ্রাত্র স্থাপন করা। পার্থিব প্রতিষ্ঠানসমূহে আদর্শকে মূর্ত করার আশায় আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। ভারতীয় সমাজ যখন তার তারুণ্য হারিয়ে ফেললে, তখন সে পরলোকের ভাবনায় মগ্ন হল। শ্রান্তির সময় আমরা ত্যাগ ও সহনশীলতার মন্ত্র গ্রহণ করি। আশা ও তেজের সময় আমরা জগতে সক্রিয়তার উপর জোর দিই ও সভ্যতাকে রক্ষা করার প্রয়াস করি। বোয়েটিউস (Boethius) বলেন, "যে একলা যেতে চায় সে কখনও স্বর্গ পাবে না।"

২১। যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

(২১) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা যা করেন, সাধারণ লোকেরা তাই করে থাকে। তাঁরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, সংসার তারই অনুসরণ করে।

নেতৃস্থানীয় লোকেরা যা করেন সাধারণ লোকেরা তাকেই আদর্শ রূপে দেখে। শ্রেষ্ঠ লোক অবিশ্বাসের পাত্র হওয়াতে গণতন্ত্র বিভ্রান্ত হয়েছে। গীতা দেখাচ্ছে যে শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎদেরই সাধারণ লোকেরা অনুসরণ করে।

সমাজের থেকে যাঁরা এগিয়ে থাকেন তাঁদের কাছ থেকেই আলো আসে। যখন তাঁদের সহচররা নিম্ন উপত্যকায় নিদ্রাচ্ছন্ন তখন তাঁরা পর্বতচূড়ায় উষার জ্যোতি দেখতে পান। যীশুর ভাষায় তাঁরাই মানব সমাজের "লবণ" "খমির" ও "আলোক"। আলোর জ্যোতির কথা যখন তাঁরা ঘোষণা করেন, তখন কিছু অল্পসংখ্যক লোক তা ধরতে পারে এবং ধীরে ধীরে অধিকসংখ্যক লোক তাঁদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়।

২২। ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

(২২) হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার এমন কোন কর্তব্য নেই যা না করলেই নয়, এমন কিছু পাবার নেই যা আমি পাই নি, তবু আমি কর্মে প্রবৃত্ত।

দিব্য জীবন ও সাংসারিক জীবন পরস্পরবিরোধী নয়।[১]

২৩। যদি হ্যহং ন বর্তেয় জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্বশঃ॥

(২৩) কেননা, আমি যদি অবিশ্রান্ত কাজ না করে যাই, তো, হে পার্থ, মানুষে সব দিক দিয়ে আমারই অনুসরণ করবে।

২৪। উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

(২৪) আমি যদি কর্মে বিরত হই, তা হলে এই জগৎ সকল উৎসন্নে যাবে, আমি বিশৃঙ্খল জীবনের ও লোকধ্বংসের কারণ হব।

ঈশ্বর তাঁর অবিরাম কর্ম দ্বারা জগৎকে পালন করছেন এবং তাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করছেন।[২]

১। মহাভারতে আছে, প্রভুত্বের নামে আমি সমস্ত সংসারের দাসত্ব করছি। দাস্য-মৈশ্বর্যবাদেন জগতীনাং তু করোম্যহং।

মহাভারত, তৃতীয়, ২১৩, ১৭ তুলনীয়।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো মুনির্যস্য বচঃ প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

২। সেন্ট টমাসের উক্তি তুলনীয়: "বস্তুর উৎপত্তি যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তার রক্ষাও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, কাজেই তিনি যদি তাদের উপর থেকে তাঁর কর্ম তুলে নেন, ত সমস্ত বস্তুই আবার অস্তিত্ববিহীন হবে।" Summa, Theol. I, IX. 20.

২৫। সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত !
কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥

(২৫) হে ভারত (অর্জুন), মূর্খগণ কর্মে আসক্ত হয়ে যা করে, বিদ্বান্‌দের জগতের কল্যাণার্থে অনাসক্ত হয়ে সেইরূপ কাজ করা উচিত।

যদিও জ্যোতির্কেন্দ্রে অবস্থিত আত্মার নিজের জন্য কিছু করা আবশ্যক নয়, তবু ঈশ্বরের মতই সে ব্রহ্মাণ্ডলীলায় যোগ দেয়। তার ক্রিয়া ব্রহ্মের আনন্দ ও জ্যোতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।

২৬। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েদ্ সর্বকর্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

(২৬) জ্ঞানীরা কর্মাসক্ত মূর্খদের যেন বুদ্ধিভ্রংশ না ঘটান। তাঁরা যোগসমাহিত হয়ে সকল কর্ম করে অন্যদেরও কর্মে প্রবৃত্ত করাবেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ—তিনি যেন কোন মনকে বিচলিত না করেন। কোনপ্রকার ধর্মানুরাগকেই দুর্বল করা উচিত নয়। প্রত্যেক ধর্মের ভিত্তি কর্তব্য, আত্মোৎসর্গ ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নতব পর্যায়ে সেগুলি হয়তো বোঝাই যায় না, এবং যে মূল ভাবকে তারা পোষণ করে তাদের কয়েকটি প্রতীকের চতুর্দিকে কেন্দ্র করে তাদের স্থিতি। যারা সেই সব প্রতীকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু সেগুলি যাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তাদের উপর জোর করে তাদের চাপাতে গেলে এবং তাদের মানবচিন্তার পরম ও চরম আকার বলে প্রচার করলেই তা অসহ্য হয়ে ওঠে। ধর্মতত্ত্বীয় মতবাদকে অভ্রান্ত মনে করার সঙ্গে ধর্মীয় সত্যের রহস্যময় রূপের সঙ্গতি নেই। শ্রদ্ধা প্রত্যয়ের চেয়ে বিস্তৃততর। আবার আমরা যদি যেটা ভাল, সেটা জেনেও তাকে অনুসরণ না করি ত প্রত্যবায়-ভাগী হই।

নিরক্ষর লোকেরা যখন প্রাকৃতিক শক্তিদের কাছে নত হয়, তখন আমরা জানি যে তারা ভুল বস্তুর কাছে নতিস্বীকার করছে এবং ঈশ্বরের প্রশস্ততর ঐক্য সম্বন্ধে তারা অন্ধ। তবু তারা এমন এক বস্তুকে অর্চনা করছে যা তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নয়। যে নরনারী ন্যায়সঙ্গত পথে জীবন অতিবাহিত করতে চায় তারা স্থূল ধর্মমত থেকেও কিছু সহায়তা পায়। ইতিহাসজড়িত পরম্পরাগত আকারগুলি অকথিত প্রত্যয়ের বাহন, যদিও তাদের সবগুলি হয়ত ভাল বোঝা যায় না। উৎস ধর্মীয় কিনা সেটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে

না, কি মনোভাব নিয়ে তা দেখা হয় তার উপর নির্ভর করে। একথা সত্য যে সকলকেই সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে হবে, কিন্তু সেটা লাফ দিয়ে পারা যায় না, ধীর পদক্ষেপেই তা অধিগম্য। তাছাড়া ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দ্বারা নির্বাচিত নয়। আমাদের পুরুষানুক্রম শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিবেশ দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। তাদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত নয়। যারা সরল বিশ্বাস অনুসরণ করে তাদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত, কেননা সরল বিশ্বাসের প্রায়োগিক মূল্য আছে এবং আধ্যাত্মিক আবেদন আছে, কাজেই সব দিক না ভেবে সে-সব বিশ্বাসকে বিচলিত করা ঠিক নয়। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌রাও বলেন যে আদিবাসীদের "উন্নত" করার আগ্রহে তাদেব নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, ভোজ ও উৎসব থেকে বঞ্চিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। তাদের জন্য আমরা যা করতে চাই তা শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে করা উচিত। তাদের সীমিত বোধকে বিস্তৃততর দৃষ্টিভঙ্গীর সোপানরূপে ব্যবহার করতে হবে।

যতক্ষণ না পরিষ্কার জল পাচ্ছি ততক্ষণ ময়লা জলও বর্জন করব না, এই মতানুসারে হিন্দু দেবমণ্ডলীতে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর দেবতারা স্থান পেয়েছেন, জল, আকাশ, স্রোতস্বতী ও বৃক্ষকুঞ্জের কল্পিত অধিষ্ঠাতারা, দূর অতীতের রূপকথার নায়করা, গ্রামের অভিবাবকরূপে কল্পিত দেব-দেবীরা ইত্যাদি। কালযাত্রায় কিছুই না হারিয়ে যায়, প্রত্যেক আন্তরিক বিশ্বাসকে বর্জন না করে যাতে সমন্বয় করা যায়, এই ভাবকে গ্রহণ করার আগ্রহে হিন্দু ধর্ম নিজের মধ্যে নানা উপাদান ও উদ্দেশ্যের বিরাট সংশ্লেষণে পরিণত হয়েছে। অতএব আশ্চর্য নয় যে তার মধ্যে অনেক অন্ধকার ও আদিম কুসংস্কার ঢুকে পড়েছে।

আত্ম কর্তা নয়।

২৭। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢাত্মা কর্তাহহমিতি মন্যতে ॥

(২৭) প্রাকৃতিক গুণে যে সকল প্রকার কার্য ঘটে যাচ্ছে, তাকে মোহগ্রস্ত লোকেরা "আমি করছি" এই বলে অহঙ্কার করে।

প্রকৃতি সাংখ্যের প্রধান।[১] মায়ার শক্তি[২] বা পরমেশ্বরের শক্তি।[৩] বিমূঢ় আত্মা প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলিকে নিজের উপর আরোপ করে।[৪]

আমাদের চিন্ময় সত্তার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে এবং অহং রূপে আত্ম নিজেকে ক্রিয়ার কর্তা রূপে কল্পনা করে, প্রকৃতি যে নিয়তি অনুগামী সেকথা ভুলে যায়। গীতানুসারে, অহং রূপ আত্মা যখন প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন তখন সে স্বাধীনভাবে কাজ করে না। দেহ প্রাণ মন প্রতিবেশের অন্তর্গত হয়ে থাকে।

২৮। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো ! গুণকর্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥

(২৮) হে মহাবাহো (অর্জুন), যিনি প্রকৃতির গুণ ও কর্ম থেকে (আত্মার) দুইটি বৈশিষ্ট্যের আসল রূপ অবগত আছেন, তিনি গুণই গুণের উপর কার্য কবছেন বুঝে আসক্ত হন না।

প্রকৃতি ও তার গুণ মানুষের স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে, যেমন বংশগতি ও প্রতিবেশের শক্তি। কারণ সকলের ক্রিয়ার ফলে যেমন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়া উদ্ভূত তেমনি প্রায়োগিক আত্মও ক্রিয়াজাত।

২৯। প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥

(২৯) প্রকৃতির গুণ দ্বারা বিমুগ্ধ ব্যক্তিরা ঐ গুণসঞ্জাত কর্মে আসক্ত হয়। কিন্তু যে এক অংশ মাত্র জানে তার মনকে যে সম্পূর্ণ জানে সে যেন বিচলিত না করে।

প্রাকৃতিক আবেগ দ্বারা যারা চালিত হয়, তাদের বিচলিত করা ঠিক নয়। প্রকৃতিচালিত অহং-এর সঙ্গে তারা নিজেকে যে ভুল করে অভিন্ন মনে করে, সেই ভ্রম থেকে তাদের ধীরে ধীরে উদ্ধার করতে হবে। আসল আত্ম দিব্য, নিত্য, মুক্ত ও চিৎস্বরূপ। মেকি আত্ম হল প্রকৃতির অংশ অহং, তার মধ্যে প্রাকৃতিক লীলাই প্রতিফলিত হয়। এখানে সাংখ্য বিশ্লেষণে আসল

১। প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা। ইতি শঙ্কর।

২। প্রধানা শব্দেন মায়া শক্তিরুচ্যতে। আনন্দগিরি।

৩। প্রকৃতেঃ পরমেশ্বর্যাঃ সত্ত্বরজস্তমগুণাত্মিকায়াঃ, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়মিতি শ্রুতি প্রসিদ্ধায়াঃ শক্তের্গুণৈঃ কার্যকারণ সংঘাটাত্মকৈঃ। নীলকণ্ঠ।
প্রকৃতির্মায়া সত্ত্বরজস্তমগুণময়ী মিথ্যা জ্ঞানাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তি। মধুসূদন।

৪। অনাত্মন্যাত্মাভিমানী। মধুসূদন।

আত্ম বা পুরুষ যে নিষ্ক্রিয় বলা হয়, আর প্রকৃতিকে সক্রিয় ধরা হয়, পুরুষ যখন নিজেকে প্রকৃতির ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে তখন সক্রিয় অস্মিতার উদ্ভব হয়। পুরুষ যে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা দ্বারা নিজেকে বিযুক্ত করেন, সাংখ্যের এই মতের সমর্থন গীতায় নেই। বিচক্ষণতা মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, বরং এমন ভাবে কাজ করা যাতে মোক্ষলাভে বিঘ্ন না ঘটে। আমরা যদি বুঝতে পারি যে আসল আত্ম স্বতন্ত্র, অক্ষুব্ধ ও নিরপেক্ষ সাক্ষী, তাহলে কোন কর্মই আমাদের বন্ধনের কারণ হবে না, যদিও আমরা অসম্পূর্ণতা ও কষ্টের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রামে লিপ্ত হই এবং জাগতিক সংহতির জন্য সচেষ্ট হই।

৩০। ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।

(৩০) সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, চেতনা আত্মে নিবদ্ধ করে অহং জ্ঞান পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে জ্বরমুক্ত হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

যে ঈশ্বর জাগতিক অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা, তাঁর কাছে আত্মোৎসর্গ করে, আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। সকল কর্ম সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব হবে "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। কাজের সময় আমরা ঈশ্বরের সেবক এই মনোভাব যেন থাকে। (১) অষ্টাদশ, ৫৯-৬০, ও ৬৬ দ্রষ্টব্য।

৩১। যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥

(৩১) যারা শ্রদ্ধার সহিত ও দ্বেষরহিত হয়ে সর্বদা আমার এই উপদেশ অনুসারে কাজ করে যাবে তারা কর্ম (বন্ধন) থেকে মুক্তি পাবে।

৩২। যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব জ্ঞান বিমূঢ়াংস্তান বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥

(৩২) যারা আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করে, তার অনুসরণ করে না, তারা সমস্ত জ্ঞান সম্বন্ধে অন্ধ, নষ্ট ও চেতনাবর্জিত বলে জানবে।

১। অহং কর্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীতি অনয়া বুদ্ধ্যা। শঙ্কর।
ঈশ্বর প্রেরিতোহহং করোমীতি অনয়া বুদ্ধ্যা। নীলকণ্ঠ।
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নাহং কর্তেতি সংন্যস্য স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বর এব সর্বকর্তা নাহং কশ্চিদিতি নিশ্চিত্য। অভিনব গুপ্ত।

স্বভাব ও কর্তব্য

৩৩। সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

(৩৩) জ্ঞানবানরাও নিজের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করেন। লোকে তাদের স্বভাবানুযায়ী চলে, তাদের নিগ্রহ করে কি লাভ ?

পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে যে মানসিক উপাদান নিয়ে লোকে জন্মায় তাকেই প্রকৃতি বলে।[১] সে তার নিজ পথ অনুসরণ করবেই। শঙ্করের মতে ভগবানও তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন না। তাঁরও নির্দেশ এই যে পূর্ব কর্মের স্বাভাবিক ফল ভোগ করতেই হবে।[২]

বাধা দিয়ে ফল হয় না, কেননা কর্ম প্রকৃতি থেকে অনিবার্যরূপে উৎপন্ন, আত্ম শুধু নিরপেক্ষ সাক্ষী। এই শ্লোকটি যেন বলতে চাচ্ছে যে আত্মার উপর প্রকৃতির ক্ষমতা সর্বব্যাপী এবং আমাদের নিজ প্রকৃতি ও স্বধর্ম অনুসারে কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছে। অবশ্য তার মানে এ নয় যে আমাদের যখন যা খেয়াল হবে তাই করে যাব। এতে আমাদের স্বধর্ম নির্ণয় করে, তাকে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। আমাদেব ইচ্ছা থাকলেও তাকে আমরা দমন কবতে পারব না। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করলে সে তার শোধ নেবেই।

৩৪। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

(৩৪) (প্রত্যেক) ইন্দ্রিয়ের (তার) বিষয়ে (সম্বন্ধে) আসক্তি ও বিদ্বেষ নির্দিষ্ট আছে। তাদের বশে আসা ঠিক নয়, কেননা তারা (দুইই) পথের বিঘ্ন।

মানুষ বুদ্ধি দ্বারা কাজ করবে। আমরা যদি আমাদের প্রবৃত্তির ঝোঁকে কাজ করে যাই তো আমাদের জীবন লক্ষ্যহীন ও পশুদের মত বুদ্ধিরহিত। আমরা যদি বাধা না দিই তো অনুরাগ-বিরাগ দ্বারাই আমাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত যে কাজটা পছন্দ হয়, সেইটা করব, আর পছন্দ না হলে করব না, এই মনোভাব থাকবে ততক্ষণ আমরা কর্মাবদ্ধ। এই সকল আবেগ

১। প্রকৃতির্নাম পূর্বকৃত ধর্মাধর্মাদিসংস্কারো বর্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ। শঙ্কর।

২। অহমপি পূর্বকর্মাপেক্ষৈব তান্ প্রবর্তয়মীতি ভাবঃ। নীলকণ্ঠ।

এড়িয়ে যদি কর্তব্যবোধ নিয়ে কাজ করি তা হলে আমরা প্রকৃতির লীলার অসহায় দাস হব না। মানুষের স্বাধীন আচরণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনসাপেক্ষ বটে, তবে তার দ্বারা একেবারে বাতিল নয়।

৩৫। শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

(৩৫) ত্রুটিহীন পরধর্মাচরণের চেয়ে ত্রুটিপূর্ণ স্বধর্মাচরণ ভাল। স্বধর্মে (পালনে) মৃত্যুও শ্রেয়, পরধর্ম পালন করতে যাওয়া ভয়াবহ।

অন্যের কর্তব্য ভাল করে পালন করতে যাওয়ার থেকে নিজের কাজ নিখুঁতরূপে না করতে পারলেও সুখ আছে। প্রত্যেকেরই উচিত নিজের মানস ভৌতিক সংগঠন বুঝতে চেষ্টা করা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। অধিবিদ্যার কোন বিশেষ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা বা মহৎ ভাবনাকে অমর ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমাদের সকলের নাও থাকতে পারে। আমাদের সকলের দক্ষতা সমান হয় না, আমাদের পাঁচ রকমের স্বাভাবিক নিপুণতা আছে কি এক রকমের মাত্র আছে, সেটা বড় কথা নয়, আমাদের উপর যেটুকু ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে তার কতখানি সদ্ব্যবহার করেছি, সেইটাই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা। বড় হোক, ছোট হোক, যে ভূমিকা আমাদের দেওয়া হয়েছে, সেইটেই মানুষের মত পালন করতে হবে। সততা মানেই গুণের চরমোৎকর্ষ। নিজের কর্তব্য যতই অরুচিকর হোক, আমরণ তা বিশ্বস্তভাবে পালন করতে হবে।

কাম-ক্রোধই শত্রু।

অর্জুন উবাচ

৩৬। অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় ! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥

(৩৬) অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে বৃষ্ণি-বংশোদ্ভব (কৃষ্ণ), তবে কিসে মানুষকে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করে, পাপে লিপ্ত করায়?

অনিচ্ছন্নপি—ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। অর্জুন অনুভব করছেন যে মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। মানুষের মৌন সম্মতি থাকেই, পরের শ্লোকে উপদেষ্টা কর্তৃক কাম বা বাসনা শব্দের ব্যবহারে

তা স্পষ্ট হচ্ছে। শঙ্করাচার্য বলেন, যাকে আমরা মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব বলি তা আমাদের তার নির্দিষ্ট পথে অনুরাগ-বিরাগ দ্বারাই চালিত করে।[১]

শ্রীভগবান্ উবাচ

৩৭। কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মাবিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

(৩৭) শ্রীভগবান বললেন—এই যে কাম, এই যে ক্রোধ, এ রজোগুণ থেকে জাত; সর্বভুক ও অত্যন্ত পাপাত্মক। ইহজগতে ওদেরই শত্রু বলে জানবে।

৩৮। ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥

(৩৮) বহ্নি যেমন ধূমাবৃত থাকে, দর্পণ ধূলায় ঢাকা থাকে, ভ্রূণ যেমন জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, এও তেমনি তার (প্রবৃত্তি) দ্বারা ঢাকা পড়ে যায়।

ইদম্—এই অর্থাৎ এই জ্ঞান। শঙ্কর।

প্রত্যেক বস্তুই আবেগ (রজোগুণ) দ্বারা আচ্ছন্ন হয়।

৩৯। আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ॥

(৩৯) হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), কামরূপ দুঃতৃপ্য অনলে জ্ঞান সর্বদা আবৃত থাকে, তাই এ জ্ঞানীদের চিরশত্রু।

"কামনা কখনও কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা প্রশমিত হয় না, আগুনে ইন্ধন দিলে যেমন সে বেড়ে যায়, কামও ভোগের দ্বারা বেড়েই যায়" মনুর এই বাক্য স্মরণীয়।[২]

১। যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্যে পুরুষম্ প্রবর্তয়তি। ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্য, তৃতীয়, ৩৪।

২। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।

মনু, দ্বিতীয়, ৯৪

স্পিনোৎসার উক্তি তুলনীয়।

"মানুষের কার্যধারা বিচার করলে মনে হয়, ঐশ্বর্য, যশ ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগকেই মানুষ সব চেয়ে

৪০। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥

(৪০) ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে এর আসন। এই সব দিয়ে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে দেহী (আত্মা)কে বিমুগ্ধ করে।

৪১। তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥

(৪১) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), গোড়া থেকেই তোমার ইন্দ্রিয়দের সংযত করে জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশকারী এই পাপকে বধ কর।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলতে বেদান্তের বাণী ও সাংখ্যের বিশিষ্ট জ্ঞানকে বোধ হয় বোঝায়। শঙ্কর জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছেন "আত্মজ্ঞান ও শাস্ত্র ও গুরু থেকে লব্ধ বিদ্যা" এবং বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছেন "ঐ লব্ধ বিদ্যার ব্যক্তিগত অনুভব"। রামানুজের মতে জ্ঞান "আত্মস্বরূপ" এবং বিজ্ঞান "আত্ম-বিবেক অর্থাৎ আত্মের বিনির্ণয়কারী জ্ঞান"। এখানে অনুবাদে জ্ঞানকে পারমার্থিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে যুক্তিসম্মত বিদ্যা বলে ধরা হয়েছে।

শ্রীধর দুই রকম ব্যাখ্যাই সমর্থন করেন।[১]

শ্রেয় বলে মানে। এগুলির মধ্যে শেষোক্তটির পরিণাম পরিতৃপ্তি ও অনুতাপ, কিন্তু অন্য দুটি কখনও তৃপ্ত হয় না। যত পাই ততই চাই, আর যশোলোভে আমরা নিজেদের জীবন অন্যের মতামত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি। কিন্তু কোন জিনিসে আসক্তি না থাকলে, তা নিয়ে বিবাদও উঠবে না, তা ধ্বংস হলে শোকও হবে না, অন্যে তা লাভ করলে হিংসাও হবে না, এক কথায় মন কোনরকমে বিচলিত হবে না। এই সমস্তই ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি আসক্তি থেকে আসে। কিন্তু যা শাশ্বত ও অনন্ত তার প্রতি অনুরাগ মনকে সম্পূর্ণভাবে আনন্দাপ্লুত করে, এবং তার মধ্যে দুঃখের সংমিশ্রণ থাকে না। অতএব তাই সব চেয়ে কাম্য, এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তারই সন্ধান করতে হবে।" De Intellectus Emendations. যে আকারেই হোক, শ্রেণী-সুযোগ, বা জাতিবৈষম্য বা জাতীয় দম্ভ, আত্মসাৎ করণই মূল সামাজিক অপরাধ। কেননা তাতে অন্যকে ব্যথা দেওয়া হয়।

Never to blend our pleasure or our pride with sorrw of the meanest thing that feels.

(আমাদের আমোদের বা অহংকারের জন্য ক্ষুদ্রতম বোধবিশিষ্ট বস্তর ও দুঃখের কারণ না হই) ওয়ার্ডসওয়ার্থের হার্ট লীপ ওয়েলের এই শ্লোকটির কোন খণ্ডন নেই।

১। জ্ঞানমাত্মবিষয়ং, বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্......যদ্ বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজম্। অমরকোষ দ্রষ্টব্য : মোক্ষে ধীঃ জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

৪২। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

(৪২) লোকে বলে ইন্দ্রিয় বড়, ইন্দ্রিয়ের থেকে মন বড়, মনের থেকে বুদ্ধি বড়, আর বুদ্ধির থেকে তিনি বড়।

কঠ উপনিষদের তৃতীয়, ১০ আর ষষ্ঠ, ৭-ও দ্রষ্টব্য। চেতনাকে ধাপে ধাপে তুলতে হবে। যত উঁচুতে উঠব ততই মুক্ত হব। ইন্দ্রিয়চালিত হলে আমরা সব চেয়ে কম স্বাধীন। মন দ্বারা চালিত হলে তার চেয়ে বেশী স্বাধীন, আবার মন ও বুদ্ধি উভয় দ্বারা চালিত হলে তার থেকেও বেশী অবাধ, আর বুদ্ধি যদি আত্মজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন তার দ্বারা চালিত কর্ম আমাদের সব চেয়ে অবাধ স্বাধীনতা দেবে।

এই শ্লোকে চৈতন্যের স্তরপর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৩। এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

(৪৩) যিনি বুদ্ধির অতীত তাঁকে জেনে আত্মদ্বারা (নিকৃষ্ট) আত্মাকে সম্বরণ করে, হে মহাবাহো (অর্জুন), যে কামরূপ শত্রুকে সহজে ধরা যায় না তাকে আঘাত কর।

কাম—বাসনা[১]। নিত্য পরমাত্মার জ্যোতি দ্বারা অস্থির অহংকে নিয়ন্ত্রিত কর। যিনি জানেন তিনিই আসলে স্বাধীন এবং তাঁর অন্তরের আলো ছাড়া আর কারুর কাছে নির্দেশ চান না।

এই অধ্যায়ে ফলের উপর স্বার্থসংশ্লিষ্ট আসক্তি না রেখে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হয়েছে। এতেই জগতের কল্যাণ হয়, বুঝতে হয় যে প্রকৃতির গুণ বা ঈশ্বর স্বয়ংই কর্তা। যমুনাচার্যের এই ব্যাখ্যা।[২]

ইতি…কর্মযোগ নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। এই হল কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়।

১। "কামময় এবায়ম্ পুরুষঃ" দ্রষ্টব্য।

২। অসক্ত্যা লোকরক্ষার্থৈ গুণেষ্বারোপ্য কর্তৃতাম্
সর্বেশ্বরে বা ন্যস্যোক্তা তৃতীয়ে কর্মকার্য্যতা॥

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানমার্গ

জ্ঞানযোগের ঐতিহ্য

শ্রীভগবান উবাচ

১। ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

(১) শ্রীভগবান বললেন—এই অব্যয় যোগের কথা আমি বিবস্বানকে বলি, বিবস্বান মনুকে বলে, মনু আবার ইক্ষ্বাকুকে বলে।[১]

২। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

(২) পরম্পরাক্রমে এইভাবে রাজর্ষিরা এই যোগের কথা জেনেছিলেন, সম্প্রতি, হে শত্রুমর্দন (অর্জুন), এই যোগ সুদীর্ঘ কালপ্রভাবে পৃথিবীতে লোপ পেয়েছে।

রাজর্ষয়ঃ—যাঁরা রাজা থেকেও ঋষির মত। রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ রাজবংশীয় হয়েও শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে গেছেন।

কালেন মহতা—বহুকাল গতে। বহু যুগ গত হওয়াতে এই বিদ্যা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মানুষের কল্যাণে লোকের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য মহান্ গুরুদের আবির্ভাব হয়। কৃষ্ণ এখন তাঁর শিষ্যকে সেই লুপ্তপ্রায় বিদ্যা দিচ্ছেন যাতে তার মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় ও তার অজ্ঞতা দূর হয়।

ঐতিহ্য ততদিনই প্রামাণিক যতদিন যে সত্যের সে প্রতীক তা লোকের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। যখন আমাদের মন তার দ্বারা অনুরণিত ও অনুপ্রাণিত হয়, তখনই সে সার্থক। সেই উদ্দেশ্যে যখন সে বিফল হয়, তখন তা আবার শেখানোর জন্য নূতন নূতন গুরুর আবির্ভাব হয়।

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪৮,৫১-৫২

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মানবে দদৌ
মনুশ্চ লোকভৃত্যার্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।

৩। স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্‌ ॥

(৩) সেই প্রাচীন যোগের কথাই আজ আমি তোমাকে বলেছি কেননা তুমি আমার ভক্ত ও সখা। এ হল পরম গূঢ় তত্ত্ব।

যোগঃ পুরাতনঃ—প্রাচীন যোগ। গুরু বলছেন যে তিনি কোন নূতন বিধান দিচ্ছেন না, পুরাতন ঐতিহ্যেরই পুনরুদ্ধার করছেন। এই পুরাতন ঐতিহ্য শাশ্বত সত্য এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ব্যাখ্যাত। এ উপদেশ এক নবীকরণ, পুনরাবিষ্কার, বহুদিন বিস্মৃত জ্ঞানের পুনরুদ্ধার। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর, শঙ্কর ও রামানুজ আদি সমস্ত মহান গুরু এইটুকু বলেই সন্তুষ্ট যে তাঁরা তাঁদের পূর্বতন গুরুদের উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করছেন। মিলিন্দপন্‌হতে বলা হয়েছে যে এক প্রাচীন পন্থা লুপ্ত হয়েছিল, বুদ্ধ তাকে আবার মুক্ত করলেন।[১] বুদ্ধ যখন পিতার রাজধানীতে সন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে ফিরে এলেন তাঁর পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কেন?" উত্তর এল, "পিতঃ, এ আমাদের কুলপ্রথা।" রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্‌ কুলের কথা বলছ?" বুদ্ধ উত্তর দিলেন—

"যে বুদ্ধেরা গত হয়েছেন এবং যারা ভবিষ্যতে আসবেন,
আমি তাঁদেরই একজন, তাঁরা যা করেছেন, আমিও তাই করি
এবং এখন যা ঘটছে, তা আগেও ঘটে গেছে,
যে নিজ বাটির দ্বারে রণসাজে সজ্জিত রাজার
সঙ্গে সন্ন্যাসীবেশে সজ্জিত পুত্রের সাক্ষাৎ হবে।"

মহান গুরুরা মৌলিকতার দাবী করেন নি, তাঁরা বলেছেন যে তাঁরা প্রাচীন সত্যেরই ব্যাখ্যা করেছেন। সমস্ত শিক্ষা যে আদর্শের মাপকাটিতে বিচার করা হবে সেই সনাতন সত্য। তাই হল সমস্ত ধর্ম ও দর্শনের শাশ্বত উৎস, Philosophia perennis, সনাতন ধর্ম, যার সম্বন্ধে অগস্তাইন বলেছেন, "যে জ্ঞান কখনও সৃষ্ট হয় নি তা চিরকালই ছিল, এখনও আছে, পরেও চিরকাল থাকবে।"[২]

ভক্তোসি মে সখা চেতি—তুমি আমার ভক্ত ও সখা। প্রত্যাদেশ কখনও

১। ২১৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সকল।

২। Confessions, IX, ১০।

বন্ধ হয়ে যায় না। মানুষের অন্তরে যতদিন ভক্তি ও সখ্যভাব বজায় থাকবে ততদিন ঈশ্বর তাদের কাছে তাঁর গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করবেন। যখনই আমাদের ঐকান্তিকতা ও প্রয়োজনবোধ থাকবে তখনই দিব্যের সঙ্গে আত্মসংযোগ সম্ভব হবে। ধর্মীয় প্রত্যাদেশ অতীত ঘটনা নয়, এ সর্বদা ঘটে চলেছে। প্রত্যাদেশ পাওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, তা অল্প সংখ্যকের বিশেষ অধিকার বলে মনে করার কারণ নেই। যীশু পাইলেটকে বলেছিলেন, "সত্যাশ্রয়ীরা প্রত্যেকে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে।"

অর্জুন উবাচ

৪। অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥

(৪) অর্জুন বললেন, বিবস্বত ত তোমার আগে জন্মেছেন। তাঁকে তুমি আদিতে এসব কথা বলেছিলে, তা কি করে সম্ভব হয়?

বুদ্ধ প্রাচীন যুগের অসংখ্য বোধিসত্ত্বের গুরু ছিলেন বলে দাবী করেছিলেন। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক, পঞ্চদশ, ১। যীশু বলেছিলেন, "আব্রাহামের আগেও আমি ছিলাম।" জন, অষ্টম, ৫৮।

অবতার-বাদ

শ্রীভগবান উবাচ

৫। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

(৫) শ্রীভগবান বললেন, হে শত্রুপীড়ক (অর্জুন), আমার ও তোমার উভয়েরই বহু জন্ম অতীত হয়েছে, আমি তাদের সকলের কথাই মনে রেখেছি, তুমি ভুলে গেছ।

৬। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

(৬) (আমি) যদিও অজ এবং আমার আত্মা অবিনশ্বর এবং যদিও (আমি) সর্বভূতের প্রভু, তবু আমি নিজ প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজ শক্তি (মায়া) দ্বারা (প্রয়োগজ) রূপে আবির্ভূত হই।

মানুষের দেহধারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রকৃতি দ্বারা

চালিত হয়ে তাদের পুনঃ পুনঃ জন্মাতে হয়। প্রকৃতি কিন্তু ঈশ্বরাধীন, কাজেই তিনি যখন দেহধারণ করেন, তখন স্বেচ্ছায়ই করেন। জীবেদের সাধারণ জন্ম প্রাকৃত শক্তি দ্বারা ঘটে, "অবশং প্রকৃতের্বশাৎ"[১]; কিন্তু ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন নিজ শক্তিতে, "আত্মমায়য়া"।

প্রকৃতিমধিষ্ঠায়—নিজ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে। তিনি তাঁর স্বভাবকে এমন ভাবে ব্যবহার করেন যাতে কর্মের অধীনতা না আসে।[২] এখানে এমন কোনও ইঙ্গিত নেই যে তাঁর দেহধারণ একটা আপাত প্রতীয়মান ঘটনা মাত্র। বাস্তবতাই উদ্দেশ্য। মায়াজাত বাস্তবতা। মায়াকে "অসম্ভবকে বাস্তব করার ক্ষমতা" বলা হয়।

এ শ্লোকের শঙ্কর যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন "আমি নিজ শক্তিতে আপাত-দৃষ্টিতে জন্মগ্রহণ করে দেহধারণ করি, অন্যদের মত বাস্তবে নয়"[৩], তা সন্তোষজনক নয়। যোগমায়া মানে ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছা, তাঁর স্বেচ্ছা, তাঁর অবোধ্য শক্তি। উৎকৃষ্টের নিকৃষ্ট, মহতের ইতর, শক্তিমানের দুর্বল ভূমিকা গ্রহণ বিশ্বজগতের রহস্য। যুক্তিসঙ্গত অর্থে তাই মায়া।

৭। যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

(৭) হে ভারত (অর্জুন), যখনই ধর্মে আবিলতা আসে, অধর্মের প্রাবল্য হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি (অবতারত্ব গ্রহণ করি)।

"যখনই ধর্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হয়, তখনই সর্বশক্তিমান হরি নিজেকে সৃষ্টি করেন।"[৪] যখনই সংসারে গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি হয়, যখনই মানুষের অন্তরে সর্বব্যাপী জড়বাদের আক্রমণ ঘটে, তখনই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রতিক্রিয়া রূপে জ্ঞান ও সততার উন্মেষ অবশ্যম্ভাবী। পরমব্রহ্ম অজ ও অমর হলেও অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতাকে দমন করার জন্য মনুষ্যশরীর ধারণ করেন।[৫]

১। নবম, ৮

২। কর্মপারতন্ত্র্যরহিত। শ্রীধর।

৩। সম্ভবামি দেহবানিব, জাত ইব, আত্মমায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ।

৪। যদা যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ। ভাগবত, নবম, ২৪, ৫৬।

৫। বিষ্ণুপুরাণেও আছে—
যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।

অবতার মানে অবতরণ অর্থাৎ যিনি নেমে এসেছেন। দিব্য পার্থিব স্তরে নেমে আসেন তাকে উচ্চতর মর্যাদা দেবার জন্য। ঈশ্বর নামলে মানুষ ওঠে। অবতারের উদ্দেশ্য নবীন জগৎ, নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি দেখিয়ে দেন মানুষ কি ভাবে নিজেকে উন্নততর জীবনধারায় ওঠাতে পারে। ন্যায়ান্যায়ের প্রশ্নই আসল নির্ধারক। ঈশ্বব ন্যায়ের দিকে কার্য করেন। ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতার অপেক্ষা প্রেম ও করুণা একান্তভাবে বেশী শক্তিশালী। ধর্ম অধর্মকে, সত্য মিথ্যাকে পরাজিত করবেই। মৃত্যু, জরা ও পাপের পিছনে যে শক্তি সক্রিয় তাকে যে সত্তা সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তার কাছে হার মানতেই হবে।

ধর্ম শব্দার্থে ভবের রীতি। যে কোন ভূতের আসল স্বভাব দ্বারা তার আচরণবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। যতক্ষণ আমাদের আচরণ আমাদের মূল প্রকৃতি অনুযায়ী ততদিন আমরা ন্যায্য কাজ করছি। অধর্ম আমাদেব প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। জগতে যেখানে সমন্বয় আছে সেখানে সকলে তার নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী আচরণ করছে বুঝতে হবে, যেখানে সংঘর্ষ সেখানেই বুঝতে হবে লোকে স্বভাবানুযায়ী কাজ করছে না। যখন আমরা আমাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করি ও তার সাম্য নষ্ট করি, তখন ঈশ্বর উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি জগৎটাকে শুধু দম দিয়ে ঠিক পথে চলতে শুরু করিয়ে ছেড়ে দেন না। তাঁর স্নেহার্দ্র হস্ত তাকে সর্বদা পথ-প্রদর্শনে নিয়োজিত।

ঋগ্‌বেদে জাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলাসূচক যে ঋত শব্দটি আছে তা থেকেই ধর্মের ধারণার উৎপত্তি। ঋত জগৎকে যুক্তিসঙ্গত অর্থ ও নৈতিক মর্যাদা দেয় এবং তা বরুণের রক্ষণাধীনে। গীতায় ভগবান সাধুতার সমর্থক, শাশ্বত ধর্মগোপ্তা (একাদশ, ১৮)। এ ভগবান শুভাশুভের অতীত, দূরবর্তী ও অন্যায়ের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম সম্বন্ধে উদাসীন নন।

৮। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(৮) সৎ লোকের রক্ষার জন্য, দুষ্ট লোকেদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

জগতের পালক বিষ্ণুরূপে ভগবানের কর্তব্য জগৎকে ধর্মপথে চালিত

রাখা। যখন অন্যায়ের প্রাবল্য হয় তখনই তিনি ন্যায়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জন্মগ্রহণ করেন।

৯। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

(৯) হে অর্জুন, আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের আসল প্রকৃতি যে জানে, দেহ ত্যাগ করার পর তার পুনর্জন্ম হয় না, সে আমাতেই প্রত্যাবর্তন করে।

অবতার বা মানবজগতে দিব্যের অবতরণ-রূপে কৃষ্ণ মানবাত্মাকে যে অবস্থায় উঠতে হবে তাই ব্যক্ত করছেন। জন্মবিহীন অজের জন্ম মানেই মানুষের আত্মার রহস্যের উদ্‌ঘাটন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে অবতারের নানা ভূমিকা আছে। অবতারের ধারণা থেকে বোঝা যায় যে পারমার্থিক জীবন ও ঐহিক জীবনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। সংসার যদি ত্রুটিপূর্ণ এবং শয়তান ও দেহের বশ হয়, তাহলে আমাদের কর্তব্য তাকে আত্মার কল্যাণে উদ্ধার করা। মানুষ অস্তিত্বের জান্তব ধারা থেকে কিভাবে আত্মিক ধারায় উঠতে পারে, অবতাররা আধ্যাত্মিক জীবনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে স্থাপন করে সেই পথ দেখিয়ে দেন। দেহধারণ দ্বারা দিব্য প্রকৃতি তার অনাবৃত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত না হয়ে মানবযন্ত্রের মাধ্যমে প্রকট হয়। দিব্য মহত্ত্ব এই মহান্ ব্যক্তিদের মধ্যে ও মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছায়। মানবজীবনের পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে হলে যে অপরিহার্য উপাদানগুলি প্রয়োজন তাই অবতারদের জীবনে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ হয়। ভাগবত বলছেন, "সর্বব্যাপী ভগবান জগতে যে শুধু আসুরিক শক্তিকে বিনাশ করার জন্যই আবির্ভূত হন তাই নয়, মানুষকে শিক্ষাও দেন। তা নইলে যে ভগবান আনন্দ স্বরূপ, তিনি সীতার জন্য উদ্বেগ অনুভব করবেন কেন ইত্যাদি।[১] তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-শোক, নিঃসঙ্গতা ও পরিত্যাজ্যতা উপলব্ধি করেন। তিনি এ সমস্তকে দমন করে তাঁর দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের সাহস দেন। যে সৎ জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের স্বতন্ত্র অনিত্য স্বার্থকে বিনাশ করে কালজয়ী পরমাত্মার সঙ্গে

১। মর্ত্যাবতারাস্ত্বিহ মর্ত্যশিক্ষণং
রক্ষো বধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ
কুতোঽন্যথা স্যাদ্ রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য। পঞ্চম, ১৯, ৫।

মিলিত হতে পারি, তিনি যে তাই শেখান তা নয় তিনি নিজেকে দিব্য প্রসাদের বাহন করে উপস্থিত হন। লোককে তাঁকে বিশ্বাস করতে ও ভালবাসতে আহ্বান করে, তিনি তাদের পরম জ্ঞানলাভের পথ প্রদর্শন করার অঙ্গীকার করেন। মানুষের অন্তরে যে ঘটনা নিয়ত ঘটছে ঐতিহাসিক তথ্য তারই এক চিত্র। আমাদের সম্ভাব্যতাকে বাস্তবে পরিণত করতে অবতার আমাদের সাহায্য করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তাধারায় কোন এক বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্যের স্বীকৃতির স্থান নেই। আমরা সকলেই দিব্যাবস্থা পেতে পারি এবং অবতাররা আমাদের সেই অন্তর্জগতের উপলব্ধির সাধনায় সহায়তা করেন। গৌতম বুদ্ধের উক্তি তুলনীয়।" তখন ভগবান বললেন, "বসেথ, জেনো যে সময়ে সময়ে পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ, ভাগ্যবান ও যোগ্য তথাগতরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা জ্ঞান ও সততায় পূর্ণ, সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা সুখী, ভ্রান্ত মানবের অভ্রান্ত পথিপ্রদর্শক, দেব ও মানবের গুরু মহাপুণ্যবান বুদ্ধ। আদিতে সুন্দর, অগ্রগতিতে সুন্দর, সিদ্ধিতে সুন্দর যে সত্য তা শব্দার্থে ও লক্ষ্যার্থে তাঁরা ঘোষণা করেন। পূর্ণ পূত উন্নত জীবনের নিশানা তাঁদের কাছে পাই।"[১] মহাযান বৌদ্ধদের মতে অনেক বুদ্ধ আগে জন্মগ্রহণ করেছেন, গৌতমের পর মেত্রেয় (মৈত্রেয়) নামে আর একজন বুদ্ধ জন্মাবেন। গৌতম নিজে জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সেই গুণ-গুলি অর্জন করেছিলেন, যা থাকায় তাঁর পক্ষে সত্যদর্শন সম্ভব হয়েছিল। অন্যদের পক্ষেও তা করা সম্ভব। এরকম দেখা যায় যে শিষ্যরা বুদ্ধত্ব লাভের সাধনা করার শপথ নিচ্ছে। এই সম্প্রদায়রা এক বিশেষ মুহূর্তে একমাত্র প্রত্যাদেশের কথা স্বীকার করে না।

১০। বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥

(১০) ভয়, ক্রোধ ও অনুরাগ বর্জিত হয়ে, চিত্ত আমা-ময় হয়ে আমাকে আশ্রয় করে, জ্ঞান-রূপ তপ দ্বারা শুদ্ধ হয়ে অনেকে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়েছে।

১। তেবিজ্জ সুত্ত। বাইবেলের রোমানসের কথা তুলনীয়: "তাঁর মত মৃত্যুর যদি আমরা যোগ্য হতে পারি, তাহলে তাঁর মতই আমরা পুনরুত্থানের যোগ্য হব। একথা জানব যে আমাদের পাপপূর্ণ দেহযুক্ত আমাদের পুরাতন আত্মকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে।"
ষষ্ঠ, ৬ Moffatt-এর ইংরাজী অনুবাদ।

মদ্ভাবম্—আমার অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব।

অবতরণের উদ্দেশ্য শুধু সংসারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়, মানুষকে তার নিজ প্রকৃতির উৎকর্ষ লাভে সাহায্য করাও। মুক্ত আত্মা পৃথিবীতেই অনন্তের মূর্ত প্রতিরূপ। মানুষের মধ্যে ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য মানুষকে ভগবানে উন্নয়নও। ধর্মের উদ্দেশ্যই হল মানুষের উৎকর্ষের পূর্ণতা আনা এবং অবতার সাধারণতঃ ঘোষণা করেন যে তিনিই সত্য, তিনিই পন্থা, তিনিই জীবন (He is the truth, the way and the life—Bible তুলনীয়—অনুবাদক)

১১। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

(১১) হে পার্থ (অর্জুন), যেভাবে মানুষ আমার কাছে আসে, সেইভাবেই আমি তাকে গ্রহণ করি ; সবদিকে মানুষ আমার পথ অনুসরণ করে।

মম বর্ত্ম—আমার পথ, আমাকে ভজনা করার উপায়।[১]

সর্বশঃ -সবদিকে, পাঠান্তর সর্বপ্রকারে—সব উপায়ে।

এই শ্লোকে গীতোক্ত ধর্মের বিস্তৃত ঔদার্য স্পষ্ট হচ্ছে। ঈশ্বর প্রত্যেক সাধককে প্রসাদ দেন এবং প্রত্যেকের আন্তরিক অভিলাষ পূরণ করেন। তিনি কারুর আশাকেই বিলুপ্ত হতে দেন না, সমস্ত আশাকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়তে দিতে সাহায্য করেন। এমন কি যারা ফলের প্রত্যাশায় বৈদিক দেবতাদের যাগযজ্ঞাদি দিয়ে অর্চনা করেন তারাও ব্রহ্মকৃপায় তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে। যেসব সাধারণ লোক সত্যের অনাবৃত তীব্রতা সহ্য করতে পারে না, তাদের কাছে যাঁদের সত্যদর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা সেই সত্যকে প্রতীক ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেন। নিরাকারকে পাবার জন্য নাম ও রূপ ব্যবহার করা হয়। যে কোন পছন্দমত রূপের ধ্যান অবলম্বন করা যায়।[২] পরমপ্রাপ্তির যে কত বিস্ময়কর বিচিত্র উপায় আছে হিন্দু চিন্তাধারা সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ এবং সকল প্রকারের সার্থকতাই তাতে স্বীকৃত। হিন্দু চিন্তাশীলরা জানতেন যে চরম সত্তার সঠিক চিত্র কোন যুক্তিসম্মত প্রয়াস দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়। পারমার্থিক

১। মমভজনমার্গম্। শ্রীধরাচার্য। ২। যথাভিমতধ্যান।

দিক দিয়ে দেখতে গেলে কোন অভিব্যক্তিকেই পরম সত্য বলে স্বীকার করা যায় না, আবার ব্যবহারিক দিক দিয়ে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু সার্থকতা আছে। যেসব আকৃতিকে আমরা অর্চনা করি তারা আমাদের অন্তরতম আত্ম সম্বন্ধে সচেতন হতে সহায়তা করে। অর্চিত বস্তু যতক্ষণ আত্মার মনোনিবেশকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে রাখতে পারে, ততক্ষণ সে আমাদের মন ও অন্তর পূর্ণ করে রাখে এবং তাকে নূতন আকার দেয়। আকৃতির গুরুত্ব বিচার করতে হলে বুঝতে হবে তা চরম সার্থকতার কতখানি ব্যক্ত করতে পেরেছে।

গীতা বিশেষ কোন ধর্মীয় আকারের কথা আলোচনা করে নি। সকল প্রকার ধর্মের পিছনে যে আবেগ আছে, ঈশ্বরকে দর্শন ও তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করার অভিলাষের মধ্যে যার উৎস, তার কথাই বলা হয়েছে।[১]

সকলেই একই ভগবানের উপাসনা করে। ধারণা ও পথের বিভিন্নতার জন্য স্থানীয় পরিবেশ ও সামাজিক উপযোগ দায়ী। একই ব্রহ্মের বহুধা প্রকাশ। "বিষ্ণুই শিব, আবার শিবই বিষ্ণু, যে অন্যরকম ভাবে সে নরকস্থ হবে।"[২] "বিষ্ণুরূপে যিনি জাত তিনিই রুদ্র, আবার যিনি রুদ্র তিনিই ব্রহ্মা। একই সত্তা তিনভাবে সক্রিয়, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা।"[৩] উদয়নাচার্য বলেন, "শৈবরা যাঁকে শিব বলে অর্চনা করে, বেদান্তীরা ব্রহ্ম বলে, বৌদ্ধরা বুদ্ধ বলে,

---

১। "তাঁর কাছে সকল উপাসনাই পবিত্র, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে সব থেকে অজ্ঞ ও নির্বোধ উপাসকদের মধ্যেও, তাদের উপাসনার সব চেয়ে অপকৃষ্ট পদ্ধতিব মধ্যেও, ঈশ্বরকে পাবার কিছু সত্যকার প্রয়াস আছে এবং এদের সঙ্গে সব চেয়ে জাঁকজমকশালী অর্চনাবিধি বা সর্বোচ্চ দার্শনিক প্রত্যয়েব এত সামান্য পার্থক্য যে স্বর্গের সন্তরা তা স ন্য উপেক্ষা করেন।"

এলিজাবেথ ওয়াটার হাউসের Thoughts of a Tartiary, এভলিন আণ্ডারহিলের Worship (১৯৩৭)এর প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২। হরিরূপী মহাদেবো লিঙ্গরূপী জনার্দনঃ।
ঈষদপ্যন্তরং নাস্তি ভেদকৃন্নরকং ব্রজেৎ॥ বৃহন্নারদীয়।

মৈত্রায়নী উপনিষদের "স বা এষ একস্ত্রিধাভূতাঃ" তুলনীয়। অথর্ব বেদের "একং জ্যোতির্বহুধা বিভাতি" "একই আলো নানা আলোকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে" দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ, ৩, ১৭।

৩। যো বৈ বিষ্ণুঃ স বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ স পিতামহঃ
এক মূর্তিস্ত্রয়ো দেবা রুদ্র বিষ্ণু পিতামহঃ॥

জ্ঞানার্জনের সূত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞ নৈয়ায়িকরা যাঁকে প্রধান কর্তা বলে, জিনরা যাঁকে নিত্যমুক্ত বলে, আনুষ্ঠানিকরা যাকে বিধিনিয়মের সার বলে, ত্রিভুবনেশ্বর সেই হরি যেন আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।"[১] তিনি যদি এযুগে লিখতেন ত ওর সঙ্গে যোগ করতেন "খ্রীষ্টানরা যাকে খ্রীষ্ট বলে এবং মুসলমানরা আল্লা বলে।"[২] ঈশ্বরকে যেভাবেই দেখুক না কেন যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে খোঁজে তিনি তাদের উপর প্রসন্ন হন। পরমার্থ বিষয়ে যারা অপরিণত তারা নিজেদের দেবতা ছাড়া অন্যকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। তাদের নিজেদের মতবাদের আকর্ষণে তারা ঈশ্বরের বিস্তৃততর একত্ব সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে যায়। ধর্মীয় ধারণার রাজ্যে অহঙ্কার থেকে এর উৎপত্তি। গীতায় এর বিপরীত ভাবে বলা হয়েছে যে যদিও বিশ্বাস ও আচার বিভিন্ন এবং বহুধা হতে পারে তবু এগুলি যে পারমার্থিক উপলব্ধির উপায় তা একই।

আমাদের অধিকারেই সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর কিছু নেই এইপ্রকার প্রবল বোধ আর তার সঙ্গে যারা বাহিরে অন্ধকারে পড়ে আছে তাদের সম্বন্ধে অনুকম্পামিশ্রিত উদ্বেগ থেকে যে মনোভাবের জন্ম হয়, তার মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা গঠিত বিচারকমণ্ডলীর মনোভাবের সঙ্গে খুব দূরত্ব নেই।

১। যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবেতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধেতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্য নাথো হরিঃ॥

২। ত্রৈষ্ট্যাঃ ক্রীষ্ট ইতি ক্রিয়াপররতাঃ আল্লেতি মহম্মদাঃ।

আকবরের সর্বজাগতিক নিষ্ঠার সারমর্ম আবুল ফজল এইভাবে বর্ণনা করেছেন, "হে ঈশ্বর, সমস্ত মন্দিরেই আমি দেখি যে লোক তোমাকে চাইছে, আমি যে সমস্ত ভাষা শুনেছি, তার প্রত্যেকটিতেই লোকে তোমার প্রশংসা করেছে। বহুদেববাদী ও ইসলাম উভয়েই তোমার কথা অনুভব করে, প্রত্যেই ধর্মই বলে "তুমি এক ও অদ্বিতীয়"। মসজিদে পবিত্র প্রার্থনার অস্ফুট আওয়াজ ওঠে, গীর্জায় লোকে ঘণ্টাধ্বনি করে তোমার প্রতি অনুরাগে। আমি কখনও খ্রীষ্টানদের গীর্জায় যাই, কখনও মসজিদে, কিন্তু মন্দির থেকে মন্দিরান্তরে আমি তোমাকেই খুঁজি।

যাঁরা তোমার প্রিয় তাঁরা ধর্মান্ধতা বা ধর্মদ্রোহিতা, কোনটার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখেন না কেননা তাঁরা তোমার সত্যের যবনিকার পিছনে কখনও যান না। ধর্মদ্রোহীর বিদ্রোহ, ধর্মান্ধের ধর্ম। কিন্তু গোলাপপাপড়ির রেণু সুগন্ধি বিক্রেতার অন্তরের বস্তু। ব্লকম্যানের আইন-ই-আকবরি, ত্রিংশৎ পৃষ্ঠা।

১২। কাঙ্‌ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥

(১২) যারা ইহলোকেই তাদের কর্মফল ভোগ করতে চায়, তারা নানা দেবতার (একই ঈশ্বরের নানা রূপ) উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে, কেননা ইহলোকে কর্মজনিত সিদ্ধি তাড়াতাড়ি লাভ করা যায়।

ঈশ্বরের কর্মের নিষ্কাম প্রকৃতি

১৩। চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥

(১৩) আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে চারবর্ণের সৃষ্টি করেছি। যদিও আমি তাদের স্রষ্টা, তবু আমাকে নিষ্ক্রিয় ও অপরিবর্তী বলে জানবে।

চাতুর্বর্ণ্যম্—চারি শ্রেণীর সংগঠন। এখানে গুণ ও কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, জাতির (জন্ম) কথা নেই। যে বর্ণ বা শ্রেণীতে আমরা থাকি তা লিঙ্গ, জন্ম বা কুল নিরপেক্ষ। প্রকৃতি ও বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণী স্থির করা আর জন্ম ও বংশগতি দ্বারা শ্রেণী নির্ণয় করা এক নয়। মহাভারতে বলে যে একসময় সমস্ত জগতে একই শ্রেণী ছিল, পরে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের ফলে চার শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়।[১] জাত ও বেজাতের পার্থক্য অপ্রাকৃত ও অনাত্মিক। এক প্রাচীন শ্লোকে ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজকে সহোদর বলা হয়েছিল।[২] মহাভারতে যুধিষ্ঠির এক জায়গায় বলেছেন যে বর্ণসংকরের জন্য কার কি বর্ণ তা জানা মুশকিল। পুরুষেরা সকল বর্ণের নারীতে সন্তান উৎপাদন করেছে। এইজন্য তত্ত্বদর্শীদের মতে আচরণই বর্ণ নির্ধারণের একমাত্র উপায়।[৩]

চতুর্বর্ণ মানবিক অভিব্যক্তির জন্য পরিকল্পিত। বর্ণাশ্রমে একেবারে বাঁধাবাঁধি কিছু নেই, ইতিহাসে তার বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে

১। একবর্ণমিদং পূর্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির
কর্ম ক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্বর্ণ্যম্ প্রতিষ্ঠিতম্॥

২। অন্ত্যজো বিপ্রজাতিশ্চ এক এব সহোদরঃ
একযোনি প্রসূতশ্চ এক শাখেন জায়তে॥

৩। সংকরাৎ সর্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ
সর্বে সর্বাস্বপত্যানি জনায়ন্তি সদা নরাঃ
তস্মাৎ শীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ॥

সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের বিবিধ পন্থার অন্যতম বলে বিবেচনা করা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বৃত্তিমূলক মণ্ডলী বরাবরই আছে ও থাকবে এবং বিবাহের ব্যাপারেও অল্পবিস্তর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সমস্তরের মধ্যেই তা ঘটতে বাধ্য। গীতা সমাজকে আঙ্গিকরূপেই দেখেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু খণ্ডের সমষ্টিরূপে নয়, কাজেই বহু জাতি ও প্রজাতিতে খণ্ডিত অপ্রকৃতিস্থ ভারতের অবস্থা গীতার ধারণাসঙ্গত নয়।

অকর্তারম্—কর্মহীন। ব্রহ্ম যেহেতু অনাসক্ত, সেইহেতু তাকে কর্তা বলা যায় না। তাঁর অব্যয় অস্তিত্বের উপর কর্মের কোন প্রভাব পডতে পারে না, যদিও তিনি সকল কর্মের অদৃশ্য পশ্চাদ্‌পট।

অনাসক্ত কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না।

১৪। ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

(১৪) কর্ম আমাকে কলুষিত করে না, তার ফলেও আমার স্পৃহা নেই। যে আমার এই ভাব জানে তার কর্মবন্ধন থাকে না।

১৫। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥

(১৫) এই কথা জেনে পুরাকালেও মোক্ষপ্রয়াসীরা কর্ম করে গেছেন। অতএব পুরাকালের প্রাচীনেরা যা করেছেন সেই অনুসারে তুমিও কর্মে প্রবৃত্ত হও।

অজ্ঞেরা আত্মশুদ্ধির জন্য কর্মরত হয়, (আত্মশুদ্ধার্থম্) আর বিজ্ঞেরা কাজ করেন জগৎ পালনের জন্য। (লোকসংগ্রহার্থম)

প্রাচীনেরা যেমন পরম্পরানির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে গেছেন, অর্জুনকেও সেইরূপ তাঁর ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে বলা হচ্ছে। "হে বিশ্বেশ্বর, পরমাত্মা, মঙ্গলময় ঈশ্বর, তোমার আদেশেই আমি জীবেদের হিতার্থে এবং তোমার প্রীত্যর্থে জীবনের তীর্থযাত্রায় ব্রতী হব।"[১]

১। লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব মাঙ্গল্যবিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রামনুবর্তয়িষ্যে॥

কর্ম ও অকর্ম।

১৬। কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥

(১৬) কোনটা কর্ম আর কোনটা অকর্ম তা বিজ্ঞেরাই ঠিক করতে পারেন না, অতএব কর্ম কি আমি এইবার তোমাকে বলব। তা জেনে তুমি অশুভ থেকে মুক্তি পাবে।

১৭। কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥

(১৭) কোনটা কাজ আর কোনটা অন্যায় কাজ এ ভাল করে বোঝা দরকার আবার নিষ্কর্মই বা কি তাও বুঝতে হবে। কর্মের কথা দুর্বোধ্য।

কোনটা যে ঠিক পথ তা সহজে বোঝা যায় না। যুগধর্ম ঐতিহ্য, বিবেকের দংশন সব গুলিয়ে গিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করে। এসবের মধ্যে বিজ্ঞ লোকেরা শাশ্বত সত্যকে আশ্রয় করে সর্বোচ্চ যুক্তির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পথের সন্ধান করেন।

১৮। কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥

(১৮) যিনি কর্মে লিপ্ত থেকে অকর্মকে ও অকর্মের মধ্যে কর্মকে দেখতে পান, তিনিই প্রাজ্ঞ ও যোগী এবং তিনি তাঁর সমস্ত কর্মে সিদ্ধ হয়েছেন।

নিরাসক্তভাবে কাজ করলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় না। বাসনা প্রসূত কর্ম থেকে নিবৃত্ত থেকে আমরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের কর্তব্য সমাধান করে যাই। অতএব আসল নিষ্কর্ম হল নিজের অন্তরের সম্বরণ ও আসক্তিবর্জন। অনাসক্ত কর্মে কর্ম বন্ধন হয় না, তাই তা অকর্ম। যিনি আসক্তিহীন হয়ে কর্মে লিপ্ত হন, তাঁর বন্ধন থাকে না। যখন বাহ্যতঃ আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি তখন আমরা কর্মে রত। অষ্টাবক্র গীতায় আছে "মূর্খেরা যে বিমুখতা বা অজ্ঞতাবশতঃ কর্মবিরত থাকে তাও কর্মের সমান। বিজ্ঞের কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) কর্মনিবৃত্তিরই সমান।[১]

১। নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী। অষ্টাদশ, ৬১

শঙ্করাচার্য বুঝিয়েছেন যে আত্মার কোন কর্ম নেই, কিন্তু দেহ আপাতদৃষ্টিতে স্থির দেখালেও সর্বদা কর্মচঞ্চল।

রামানুজের মতে অকর্ম মানে আত্মজ্ঞান। প্রাজ্ঞেরা সৎকর্মের মধ্যে জ্ঞান দেখেন। তাঁদের কাছে জ্ঞান ও কর্ম যুক্তভাবে স্থিত।

মাধ্ব বলেন অকর্ম মানে আত্মার নিষ্ক্রিয়তা এবং বিষ্ণুর সক্রিয়তা। অতএব তিনিই বিজ্ঞ যিনি ঈশ্বরের ক্রিয়া দেখতে পান, লোক সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক।

১৯। যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

(১৯) যাঁর সকল কর্মপ্রয়াস কামনাজাত সংকল্প বর্জিত এবং যাঁর কর্ম জ্ঞানাগ্নিপূত, তাঁকেই বিজ্ঞেরা পণ্ডিত বলেন।

এইরকম কর্মীরা জ্ঞানজাত বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হন এবং স্বার্থবাসনা বিমুক্ত হন। তিনি কাজে লিপ্ত থাকলেও আসলে কিছুই করেন না।

২০। ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

(২০) কর্মফলে আসক্তি বর্জন করে, সর্বদা সন্তুষ্ট থেকে, কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে, তিনি সর্বদা কাজে লিপ্ত থেকেও কিছুই করছেন না।

অষ্টাবক্র গীতায় আছে: "যিনি সদসদ্ বর্জিত, প্রাজ্ঞ, তৃপ্ত ও নিষ্কাম, তিনি জগতের চোখে সক্রিয় দেখালেও আসলে নিষ্ক্রিয়।[১] যিনি শাস্ত্রোক্ত ধর্মাচরণগুলিকে নিরাসক্তভাবে ভগবানে সমর্পণ করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্যে সিদ্ধ হন; কাম্যফল শুধু আমাদের কর্মে আকৃষ্ট করার জন্য।"[২]

২১। নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

(২১) কামনারহিত হয়ে আত্ম ও চিত্তকে বশে রেখে, সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু পরিহার করে শুধু দেহ দ্বারা কর্ম করায় তিনি কোন অনিষ্ট করতে পারেন না।

১। অষ্টাদশ ১৯ । ২০-১ ও দ্রষ্টব্য

২। বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে
নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিং লভতে রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।

শারীরং কর্ম, শঙ্করাচার্য ও মধুসূদনের মতে দেহধারণের জন্য কর্ম। বেদান্তদেশিকা অনুসারে মাত্র দেহ যে কার্য করে।

বাহ্য কাজে দোষ-গুণ নেই। যখন মানুষ প্রবৃত্তি ও স্বৈরতা রহিত হয় তখন সে ঈশ্বরেচ্ছা প্রতিফলনের দর্পণ হয়। মানবাত্মা ঐশী শক্তির বিশুদ্ধ বাহন হয়।

২২। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

(২২) যিনি ঘটনাচক্রে যা পান তাতেই সন্তুষ্ট, (সুখ-দুঃখের) দ্বন্দ্বাতীত এবং ঈর্ষাবিহীন, সাফল্য ও বৈফল্যে যিনি সমভাবে থাকেন, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হলেও তাঁর বন্ধন থাকে না।

কর্মমাত্রই বন্ধন করে না। তা যদি করত, তা হলে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে একটা বিষম দ্বৈতের কথা স্বীকার করতেই হত এবং জগৎ একটা বিরাট ভ্রম বলে গণ্য করতে হত। ব্রহ্মাণ্ড পরমেরই প্রকাশ এবং ক্রিয়া বন্ধন নয়, ক্রিয়ার প্রতি স্বার্থান্ধ ভাবই বন্ধন। এবং আমরা এতগুলি স্বতন্ত্র প্রাতিস্বিক, প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ রাগ ও দ্বেষ আছে এইরূপ কল্পনা যে মূঢ়তা থেকে জন্মায় তাই থেকে সে ভাব আসে।

এইবার উপদেষ্টা বোঝাচ্ছেন যে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া, সবই এক ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ এবং যে কর্ম ব্রহ্মে উৎসর্গ করা হয়েছে, তা বন্ধনের কারণ হয় না।

যজ্ঞ ও তার প্রতীক মূল।

২৩। গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

(২৩) যিনি সমস্ত আসক্তি বর্জন করেছেন ও মুক্ত হয়েছেন এবং যাঁর মন প্রজ্ঞায় দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত এবং যিনি কর্মকেই যজ্ঞ-বিবেচনা করেন, তাঁর সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণ বিলীন হয়।

২৪। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

(২৪) তাঁর নৈবেদ্য ব্রহ্ম, ব্রহ্ম দ্বারা ব্রহ্মরূপ ঘৃত ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। যিনি তাঁর সকল কর্মের মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, ব্রহ্মই তাঁর লক্ষ্য।

এখানে বৈদিক যজ্ঞের বিস্তৃততর, পারমার্থিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যিনি যজ্ঞ করেন, তিনি কর্ম করেন বটে কিন্তু তার দ্বারা তিনি বদ্ধ নয়[১] কেননা তাঁর ইহজীবন অনন্ত ভাব দ্বারা পরিবৃত।[২]

২৫। দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥

(২৫) কোন কোন যোগী দেবতাদের যজ্ঞ দ্বারা উপাসনা করেন, কিন্তু অন্যেরা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞকেই আহুতি দিয়ে যজ্ঞ সমাধা করেন।

এই শ্লোকের দ্বিতীয়বার যজ্ঞ শব্দটিকে শঙ্কর আত্ম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। "অন্যেরা ব্রহ্মাগ্নিতে আত্ম দিয়ে আত্মাহুতি দেন"[৩]। যারা ঈশ্বরের নানা রূপ কল্পনা করেন, তারা উৎসর্গের আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা সেই সব দেবতাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যেরা সকল কর্ম ঈশ্বরেই অর্পণ করেন।

২৬। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।

(২৬) কেহ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়কে সংযমের অগ্নিতে আহুতি দেন, অন্যেরা শব্দাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন।

মনকে সংযত করা ও বশে আনার উপায় রূপে যজ্ঞকে এখানে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা দিয়ে আমাদের সমস্ত সত্তায় জ্ঞানের অনুপ্রবেশ

১। শ্রীধর বলেছেন "তদেবং পরমেশ্বরারাধন লক্ষণং কর্ম জ্ঞান-হেতুত্বেন বন্ধকত্বা-ভাবাদকর্মৈব।"

২। মাস্তিক্'ৎ-তায়ের, ফিট্‌জেরাল্ড কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ।

"তুমি যা হয়েছিলে, যা দেখেছ, করেছ বা ভেবেছ
সে তুমি নয়, আমিই দেখেছিলাম, ছিলাম, করেছিলাম......
তীর্থযাত্রী, তীর্থযাত্রা ও রাস্তা আমিই আমার দিকে
আর তোমার আসা, সে আমারই আসা আমার বাসায়...
ওগো পথভ্রান্ত পরমাণু, তোমরা তোমাদের কেন্দ্রে ফের...
যে আলোকরশ্মি বাহিরের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছ,
তারা ফের, ফিরে তোমাদের সূর্যে বিলীন হও।

আনন্দকুমারস্বামীর হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম (Hinduism and Buddhism) (1943) পৃষ্ঠা ৪২ থেকে উদ্ধৃত।

৩। নীলকণ্ঠ বলেন, "সোপাধিকং জীবং নিরুপাধিকাত্মরূপেণ জুহ্বতি।"

ঘটাবার চেষ্টা করি।[১] আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব অর্পিত ও পরিবর্তিত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের যথাযুক্ত উপভোগকে তুলনা করা হয়েছে যজ্ঞের সঙ্গে, যে যজ্ঞে ইন্দ্রিয়সকল হোমাগ্নি আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি ঘৃতাহুতি। যেখানে আমরা আত্মসর্বস্ব উপভোগকে উন্নততর আনন্দের কাছে অর্পণ করি, যেখানে আমাদের ইতর আবেগকে বর্জন করি, সেইরূপ সকল প্রকারের আত্মসংযমকেই যজ্ঞ বলা হয়েছে।

২৭। সর্বাণীন্দ্রিয় কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥

(২৭) কেউ আবার তাদের ইন্দ্রিয় কর্ম ও প্রাণকর্মকে জ্ঞানদ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমের যোগাগ্নিতে আহুতি দেন।

২৮। দ্রব্যযজ্ঞাস্তপো যজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥

(২৮) কেউ আবার তাঁদের ঐহিক সম্পত্তি, তাঁদের তপস্যা, যোগ ইত্যাদি যজ্ঞে আহুতি দেন, আবার সংযত মন ও দৃঢ়ব্রতীরা তাঁদের স্বাধ্যায় বিদ্যা ও প্রজ্ঞাকে আহুতি দেন।

২৯। অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥

(২৯) যাঁরা আবার প্রাণবায়ুর (ত্যক্তশ্বাস) পথ ও অপান বায়ুর (গৃহীত প্রশ্বাস) পথ নিরোধ করে প্রাণায়ামে পারদর্শী হয়েছেন, তাঁরা প্রাণকে অপানে ও অপানকে প্রাণে আহুতি দেন।

৩০। অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥

(৩০) আবার কেউ আহারকে সংযত করে প্রাণের কাছে প্রাণবায়ুই আহুতি দেন। এঁরা সকলেই যজ্ঞবিদ্ অর্থাৎ যজ্ঞ কাকে বলে তা জানেন এবং যজ্ঞ দ্বারা কলুষমুক্ত হন।

১। মধুসূদনঃ-ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি সংযম শব্দেনোচ্যতেঃ তথাহচাহ ভগবান পাতঞ্জলিঃ ; ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ইতি। তত্র হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ মনসশ্চিরকালস্থাপনং ধারণা ; এবমেকত্র ধৃতস্য চিত্তস্য ভগবদাকারবৃত্তিপ্রবাহোঽন্তরান্তরাকার প্রত্যয়ব্যবহিতো ধ্যানং। সর্বথা বিজাতীয় প্রত্যয়ান্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ।

সকল যজ্ঞের সংযমই সার, কাজেই সমস্ত যজ্ঞকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বলে ধরা যায়।

৩১। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥

(৩১) যাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট পূত অন্ন ভোজন করেন তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), যিনি যজ্ঞ করেন না, ইহলোকেই তিনি বঞ্চিত, পরলোকের তো কথাই নেই।

যজ্ঞই (ত্যাগ) হল জগতের নিয়ম, সে নিয়ম যে ভঙ্গ করে ইহলোক পরলোক কোনটাই তার আয়ত্তে আসে না।

৩২। এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥

(৩২) এইপ্রকার নানাপ্রকার যজ্ঞের কথা ব্রহ্মমুখে ব্যক্ত হয়েছে (অর্থাৎ পরমপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কথিত হয়েছে)। এগুলি সবই কর্মজাত বলে জেনো এবং জেনে তুমি মোক্ষলাভ করবে।

জ্ঞান ও কর্ম।

৩৩। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

(৩৩) হে পরন্তপ (অর্জুন), যে কোন বস্তু আহুতি দেওয়ার চেয়ে জ্ঞানাহুতিই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, যেহেতু সর্বপ্রকার কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

যে জীবনপ্রদ জ্ঞান আমাদের কর্মে স্বাধীনতা দেয় ও কর্মবন্ধন মোচন করে তাই লক্ষ্য।

৩৪। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(৩৪) বিনীত ভক্তি, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তত্ত্বদর্শী তাঁরা তোমাকে সেই জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন।

বিজ্ঞ লোকেরা তখনই আমাদের সত্যের সন্ধান দেবেন যখন আমরা তাঁদের কাছে সশ্রদ্ধ প্রশ্ন নিয়ে, সেবার মনোভাব নিয়ে যাব। যতক্ষণ আমরা নিজেদের অন্তর্যামী ভগবানকে উপলব্ধি না করছি, ততদিন যাঁদের সে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের উপদেশ মত চলতে হবে। শাস্ত্রে যা লেখা

আছে বা গুরু যে উপদেশ দিচ্ছেন তাকে চিন্তা না করে মেনে নেওয়া ঠিক নয়। তা যুক্তিসিদ্ধ হওয়া চাই। "যার ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা নেই, যে শুধু নানা কথা শুনেছে, সে শাস্ত্রবাক্যের অর্থ বুঝতে পারে না, যেমন হাতা রাঁধা বস্তুর আস্বাদ পায় না।"[১] গুরুভক্তির সঙ্গে স্বাধীন বিচার ও অনুসন্ধান করার সম্পূর্ণ অবাধ অধিকার থাকা চাই। বাহ্য প্রামাণিক বিধানের অন্ধ বাধ্যতা গ্রাহ্য নয়। বর্তমান যুগে অনেক গুরু আছেন যাঁরা তাঁদের অনুগামীদের কাছে তাঁদের আদেশের নির্বিচার বাধ্যতা চান। তাঁদের বিশ্বাস পারমার্থিক জীবনলাভের শর্ত হ'ল বুদ্ধির বিলোপ। তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির চেয়ে তাঁদের দালালদের প্রচারশক্তি ও নূতনত্ব, কৌতূহল ও উত্তেজনার প্রতি মানবসুলভ দুর্বলতা অনেক সরলমনা ও সহজবিশ্বাসী মানুষকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করে। এ হিন্দু ঐতিহ্যের বিরোধী। গীতার ভাষায় হিন্দুমতে জিজ্ঞাসা, মনন (চিন্তন) বা পরিপ্রশ্ন একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু শুধু বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা যথেষ্ট নয়। বুদ্ধির দ্বারা পরপারের খণ্ডিত দৃশ্যই চোখে পড়বে, তাব সম্পূর্ণ বোধ বা চেতনা পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিগত সংস্পর্শ লাভ করতে হলে আমাদের সমগ্র অন্তর্লোককে উন্মুক্ত করতে হবে। সাধককে আভ্যন্তরিক পথ অনুসরণ করতে হবে। অন্তরের জ্যোতিই চরম প্রমাণ, অবশ্য তাকে যদি আমরা বাসনাজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি। সেবাগুণ ও আত্মবিলুপ্তি দ্বারা পূর্বসঞ্জাত ধারণার বাধা ভেঙে দিয়ে আমরা অন্তরের জ্ঞানের আলোকপাতের পথ সুগম করি। আপ্ত সত্য আর আহরিত সত্যে পার্থক্য আছে। অন্তিমে শাস্ত্রবচন (প্রণিপাত-শ্রবণ) চিন্তন (পরিপ্রশ্ন-মনন) ও সেবা ও ধ্যান (সেবা-নিদিধ্যাসন) দ্বারা আত্মা যা উপলব্ধি করে এ তিনটি মিলে যাওয়া চাই।[২] অতীতের মহামনাদের

১। যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলং তু বহুশ্রুতঃ
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপরসমিব॥ মহাভারত, দ্বিতীয়, ৫৫, ১।

২ প্লেটো বলেছেন, "মানুষকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না সে দুটির একটিতে সিদ্ধ হয়েছে ; হয় তাকে নিজেকে নিজের সত্য আবিষ্কার করতে হবে, নয় সেটা অন্য কারুর কাছে শিখতে হবে, কিন্তু তা যদি অসম্ভব হয় তাহলে সর্বোত্তম ও সব চেয়ে অখণ্ডনীয় মানবিক মতবাদের ভেলায় জীবননদী পার হতে হবে।" Phaedo, 85. প্লটিনাস বলেছেন, "তর্ক থেকে দৃষ্টির দিকে আকর্ষণ করি, যারা দেখতে চায়, তাদের পথ দেখাই। আমাদের উপদেশ পথ-প্রদর্শন মাত্র, যে দেখতে চায়, দেখাটা তার একান্ত নিজস্ব।" Enneads, VI, 9, 4.

সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ স্থাপন করতে হবে, তাদের সম্বন্ধে বিচার করতে হবে এবং তাঁদের উপদেশের কতখানির স্থায়ী মূল্য আছে তা যত্ন দ্বারা বোঝবার চেষ্টা করতে হবে।

এই শ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথম শ্রদ্ধা, পরে জ্ঞান, শেষে উপলব্ধি।

যাঁরা সত্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের কাছে আমরা উপদেশ প্রত্যাশা করি। সত্যদ্রষ্টাদের তাঁদের চেয়ে কম সৌভাগ্যবান ভাইদের প্রতি কর্তব্য আছে। তাদের উচিত যে জ্যোতি তাঁরা দেখতে পেয়েছেন, তাই পাবার দিকে অন্যদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

জ্ঞান প্রশস্তি।

৩৫। যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥

(৩৫) হে পাণ্ডব, একবার তা জানলে আর তোমার কখনও মোহ হবে না, কেননা তখন তুমি বুঝতে পারবে যে সর্বভূতই আত্মের মধ্যে ও পরে আমার মধ্যে অবস্থিত।

যখন ভেদবোধ নষ্ট হয়ে যাবে তখন কর্মের বন্ধন আর থাকবে না, কেননা অজ্ঞতাই বন্ধনের কারণ, জীবাত্মা প্রজ্ঞালাভ করলে মুক্ত হয়ে যায়।

৩৬। অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্য পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

(৩৬) সর্বপাপীদের নিকৃষ্টতম পাপী হলেও, শুধু জ্ঞানতরণী দ্বারা তুমি সমস্ত অশুভের সমুদ্র পার হয়ে যাবে।

৩৭। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

(৩৭) অগ্নি প্রজ্বলিত হলে যেমন ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, তেমনি, হে অর্জুন, জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে।

৩৮। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

(৩৮) জ্ঞানের মত পবিত্র বস্তু পৃথিবীতে আর নেই। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি নিজেই নিজের মধ্যে যথাসময়ে এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন।

আত্মসংযম দ্বারা মানুষের অন্তিমে এই বোধ জন্মায়।

জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা আবশ্যক।

৩৯। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

(৩৯) শ্রদ্ধাবান, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সংযতেন্দ্রিয়েরা জ্ঞানলাভ করেন ও জ্ঞানলাভের পর পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন।

শ্রদ্ধা—জ্ঞানলাভের জন্য শ্রদ্ধা প্রয়োজন। শ্রদ্ধা মানে অন্ধবিশ্বাস নয়। জ্ঞানলাভে আত্মার সাধনাই শ্রদ্ধা। আমাদের গভীরতম অন্তরে যে প্রজ্ঞা আছে, প্রয়োগজ আত্মায় তার প্রতিফলনই শ্রদ্ধা। তা যদি অবিচল থাকে তবেই জ্ঞানোপলব্ধি সম্ভব। প্রজ্ঞা নিঃসংশয়, কিন্তু বুদ্ধিগত জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাত্ত ও যৌক্তিক অনুমিতির উপর নির্ভরশীল বলে, সংশয় ও সন্দেহবাদ আশ্রয় পায়। ওভাবে জ্ঞানলাভ করা যায় না। আমাদের অন্তর্জগতে বাস করে সত্যজ্ঞানে উন্নীত হতে হবে। শ্রদ্ধা ও আত্মসংযমের মধ্য দিয়েই তার কাছে পৌঁছবার পথ।

পরাং শান্তিম্—পরমা শান্তি। নীলকণ্ঠ বলেন যে আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন হলেই পরম শান্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১]

৪০। অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

(৪০) কিন্তু অজ্ঞ, শ্রদ্ধাবিহীন ও সন্দিগ্ধ স্বভাবের লোক বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধ আত্মার ইহলোক পরলোক কিছুই নেই, সুখও নেই।

জীবনের একটি নির্ব্যূঢ় ভিত্তি থাকা চাই, এমন এক অবিচলিত শ্রদ্ধা যা জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

৪১। যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥

(৪১) যিনি যোগ দ্বারা সমস্ত কর্ম বর্জন করেছেন, জ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় দূর করেছেন এবং যিনি সর্বদা আত্মবান, তাঁকে, হে ধনঞ্জয়, কর্ম বাঁধতে পারে না।

১। বিদেহ কৈবল্যম্‌……প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্তৌ সত্যাম্।

এই শ্লোকে সার্থক কর্ম, জ্ঞান ও আত্মতপের পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যোগ সংন্যস্ত কর্মাণম্—যোগ দ্বারা যিনি সর্বকর্ম বর্জন করেছেন। এর দ্বারা ভগবদারাধনার লক্ষণ স্বরূপ যাঁর সাম্যবোধের উন্মেষ হয়েছে, এবং যিনি সর্ব কর্ম ঈশ্বরে নিবেদন করেন তাঁকেও বোঝাতে পারে অথবা যিনি সর্বোচ্চ তত্ত্বদর্শন করে কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তাঁকেও বোঝাতে পারে। ইতি মধুসূদন।[১]

আত্মবন্তম্—নিজের আত্মা যার বশে আছে। অন্যের জন্য কর্ম করার সময়ও তিনি আত্মস্থ থাকেন। অন্যের কল্যাণার্থে কাজ করার আগ্রহে তিনি নিজ আত্মের সংযম হারান না।

৪২। তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

(৪২) অতএব হে ভারত (অর্জুন), তোমার মনের অজ্ঞতাপ্রসূত সংশয়কে জ্ঞানের তরবারি দিয়ে কেটে ফেলে, যোগাধিষ্ঠিত হয়ে উঠে দাঁড়াও।

অর্জুনকে জ্ঞান ও অভিনিবেশ সাহায্যে কর্মে প্রবৃত্ত হতে বলা হচ্ছে। যুদ্ধ করবেন কি করবেন না, এ সংশয় তাঁর অজ্ঞতা থেকে এসেছে। জ্ঞান লাভে সংশয়জাল ছিন্ন হবে। তখন তিনি কোনটা ঠিক তা বুঝতে পারবেন।

ইতি······জ্ঞানযোগ নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

এই হল দিব্য জ্ঞানযোগ শিরোনামায় চতুর্থ অধ্যায়।

কখনও কখনও এ অধ্যায়কে জ্ঞানকর্মসন্ন্যাস যোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও (আসল) কর্মনিবৃত্তি যোগও বলা হয়।

১। যোগেন ভগবদারাধনলক্ষণসমত্ববুদ্ধিরূপেণ সংন্যস্তানি ভগবতি সমর্পিতানি কর্মাণি যেন যদ্ বা পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সংন্যস্তানি ত্যক্তানি কর্মাণি যেন, তং যোগসংন্যস্তকর্মাণম্।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃত সন্ন্যাস

সাংখ্য ও যোগের লক্ষ্য একই

অর্জুন উবাচ

১। সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্‌॥

(১) অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম-নিবৃত্তির প্রশংসা করছ আবার নিঃস্বার্থভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ারও প্রশংসা করছ। ঠিক করে বল দেখি এর মধ্যে কোনটি শ্রেয়তর।

শঙ্করাচার্য বলেন যে এখানে প্রশ্নটি অজ্ঞ লোকেদের সম্বন্ধে উঠেছে। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে, তাঁর সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হয়েছে, কাজেই তাঁর লাভালাভের প্রশ্ন আর নেই। তৃতীয় অধ্যায়েব ১৭ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে তাঁর পালন করাব মত আর কোন কর্তব্য নেই। তৃতীয় অধ্যায়েব ৪ সংখ্যক শ্লোকে ও চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ সংখ্যক শ্লোকে কর্মযোগকে আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে সত্যকার জ্ঞানলাভ করলে কর্মের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না। আরও, চতুর্থ অধ্যায়ের ২১ সংখ্যক শ্লোকে দেহরক্ষার জন্য যা প্রয়োজন তা ছাড়া সমস্ত কর্ম থেকেই তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। যাঁর প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয়েছে, তাঁকে পঞ্চম অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক শ্লোকে একাগ্রচিত্তে সর্বদা এই কথাটি ধ্যান করতে বলা হয়েছে "আমি" কর্তা নয়। একথা স্বপ্নেও ভাবা সম্ভব নয় যে আত্মজ্ঞানী পুরুষ প্রকৃত জ্ঞানের বিরোধী ও সম্পূর্ণ অবিদ্যা-ভিত্তিক কর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারেন।[১] অতএব শঙ্করের মত এই যে যারা আত্মতত্ত্ব জানে না তাদের সম্পর্কেই অর্জুনের প্রশ্ন। অজ্ঞ লোকেদের পক্ষে সন্ন্যাসের থেকে কর্মই ভাল।

আগাগোড়াই গীতার অভিপ্রায় এইরকম মনে হয় যে সকাম কর্ম যা

১। আত্মতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্দর্শনবিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্মযোগঃ স্বপ্নেপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে।

আমাদের বন্ধনের কারণ তাই বর্জনীয়। সকল প্রকার ক্রিয়া বন্ধ করা উচিত নয়। শুধু কর্ম দ্বারাই আমরা মুক্তি পাব না কিন্তু মোক্ষদায়িনী জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের কোন বিরোধ নেই।

শ্রীভগবান উবাচ

২। সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥

(২) শ্রীভগবান বললেন, কর্মনিবৃত্তি ও নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন উভয় পথেই আত্মার মোক্ষলাভ হতে পারে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম কর্মবর্জনের থেকে ভাল।[১]

সাংখ্যমতে কর্মত্যাগই প্রয়োজন আবার যোগ উপযুক্ত মনোভাব নিয়ে কর্ম করার উপর জোর দেয়। শেষ পর্যন্ত দুই-ই এক তবে যোগনির্দিষ্ট প্রথা আমাদের স্বভাবতঃ উপযোগী মনে হয়। দুটি প্রথা পরস্পর অসঙ্গত নয়। সাংখ্য প্রজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর যোগে ইচ্ছাশক্তিপ্রণোদিত ক্রিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রথমটিতে ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুগুলিকে মনন দ্বারা দূর করে আত্মকে জানতে পারি, আর দ্বিতীয়টিতে ইচ্ছা বা সংকল্প দ্বারা সেই সব বাধাকে দূর করি।

৩। জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

(৩) যাঁর আকাঙ্ক্ষাও নেই বিতৃষ্ণাও নেই, তাঁকে চিরসন্ন্যাসী বলে জানবে। হে মহাবাহু (অর্জুন), তিনি দ্বৈতবোধ-মুক্ত বলে তাঁর মোক্ষলাভ সহজ হয়।

নিত্য সন্ন্যাসী—যিনি সর্বদা ত্যাগ ভাব দ্বারা চালিত। প্রকৃত কর্মী (কর্মযোগী)ই প্রকৃত ত্যাগী (নিত্য সন্ন্যাসী), কেননা তিনি অনাসক্ত ভাবে কাজ করেন।[২]

৪। সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥

(৪) অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সন্ন্যাস (সাংখ্য) ও কর্মমার্গ (যোগ)কে ভিন্ন

১। তৃতীয়, ৮

২। স কর্মণি প্রবৃত্তোপি নিত্যং সন্ন্যাসীতি জ্ঞেয়ঃ। মধুসূদন।

স্থলে, পণ্ডিতেরা কখনও তা বলেন না। যে কোন একটা মার্গ যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেন তিনি উভয়েরই ফললাভ করেন।

এই অধ্যায়ে যোগ মানেই কর্মযোগ আর সাংখ্য মানে কর্মনিবৃত্তিযুক্ত জ্ঞানমার্গ।

৫। যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

(৫) ত্যাগীরা যে অবস্থা প্রাপ্ত হন কর্মবীরেরাও সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হন। ত্যাগের পথ ও কর্মের পথ যে একই, সেকথা যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনিই (প্রকৃত) দৃষ্টিলাভ করেছেন।

মহাভারতের অন্যত্র শান্তিপর্বে ৩০৫, ১৯ ও ৩১৬, ৪-এও এই শ্লোকের শেষ পদের সমান কথা আছে।[১] নিরাসক্তভাবে যিনি কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, যিনি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় তিনি প্রকৃত কর্মত্যাগী নন। নিবৃত্তি একটা মানসিক ভঙ্গী, কর্মে কামনা বর্জন, সকলপ্রকার বাসনারহিত কর্মই প্রকৃত কর্ম। কাজেই উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। "প্রাজ্ঞ লোক ও মূর্খের কর্মে দেহ (বাহ্যক্রিয়া) একই কিন্তু আন্তরিক ভাব ভিন্ন।"[২] মহাভারতে আছে ভাগবত ধর্ম ও সাংখ্য ধর্ম সমগুণান্বিত।[৩]

৬। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥

(৬) হে মহাবাহু (অর্জুন), যোগবর্জিত সন্ন্যাস দুরূহ, যোগে নিষ্ঠাবান (কর্মপন্থী) মুনি সহজে ব্রহ্মলাভ করেন।

৭। যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥

(৭) কর্মমার্গে যিনি নিপুণ ও বিশুদ্ধাত্মা এবং যিনি আত্ম ও ইন্দ্রিয় উভয়কেই বশে আনতে পেরেছেন, যাঁর আত্মা সর্বভূতের আত্মের সঙ্গে এক হতে পেরেছে, তিনি কর্ম করেও লিপ্ত হন না।

১। যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি তৎ সাংখ্যৈরপি দৃশ্যতে
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ। তুলনীয়।

২। প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্যযোগে
সমত্বমভ্যেতি তনুর্ন বুদ্ধিঃ। অবিমার, পঞ্চম, ৫।০

৩। সাংখ্যযোগেন তুল্যো হি ধর্ম একান্ত সেবিতঃ। শান্তিপর্ব, ৩৪৮, ৭১।

তিনি বাহ্যত না হলেও ভিতরে ভিতরে সকল কর্ম বর্জন করেছেন। শঙ্করও স্বীকার করেছেন যে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এরকম কর্মের কোন অসঙ্গতি নেই। জগতের সংহতির জন্য কাজ করলেও তাঁর কর্মবন্ধন থাকে না।[১]

৮। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥

(৮) যিনি ব্রহ্মযুক্ত ও তত্ত্ববিৎ তিনি দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, ঘ্রাণে, আস্বাদনে, ভ্রমণে, নিদ্রায় ও নিশ্বাসে "আমি কিছুই করি না" এইরূপ চিন্তা করেন।

৯। প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

(৯) আলাপনে, (মলমূত্রাদি) ত্যাগে, গ্রহণে, উন্মীলনে (চক্ষু), নিমীলনে তিনি সর্বদা মনে রাখেন যে মাত্র ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।

আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের আত্ম পবিত্র ও মুক্ত এবং প্রকৃতি বা বৈষয়িক জগতের উপাদান থেকে ভিন্ন। অহংয়ের উপাদান সব অনিত্য, মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। এই সব বহিপ্র্রকৃতি, যাদের আত্ম বলে ভ্রম হয়, তাদের মধ্যে কোন অব্যয় বা অমর কেন্দ্র নেই।

১০। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

(১০) যিনি কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করে সকলপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করে কর্মে প্রবৃত্ত হন তাঁকে পাপ স্পর্শ করে না, যেমন পদ্মপত্র জল দ্বারা (আর্দ্র হয় না)।

গীতা আমাদের কর্মবর্জন করতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু যে পরমের মধ্যেই একমাত্র অমরত্ব নিহিত, তাঁকেই কর্ম করার সময় উৎসর্গ করে দিতে বলে। আসক্তি ও বিতৃষ্ণাযুক্ত সসীম অহংয়ের সঙ্গ বর্জন করে যখন আমাদের কর্ম শাশ্বতে অর্পণ করি তখনই আমরা প্রকৃত ত্যাগী, সংসারে স্বচ্ছন্দ ক্রিয়ার সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে। এরকম সন্ন্যাসী তাঁর নশ্বর সসীম আত্মের জন্য কর্মে ব্রতী হন না, তিনি সকলের মধ্যে যে পরমাত্মা বিরাজমান

১। সঃ......লোকসংগ্রহায় কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে, ন কর্মভির্বধ্যতে।

তাঁর জন্যই কর্মে লিপ্ত হন।[১] ব্রহ্মণি আধায় কর্মাণি—রামানুজ ব্রহ্মকে প্রকৃতির সমার্থক বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

১১। কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥

(১১) যোগীরা (কর্মবীরেরা) আত্মশুদ্ধির জন্য আসক্তি ত্যাগ করে শুধু দেহ, মন, বুদ্ধি অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কাজ করে যান।

১২। যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥

(১২) নিষ্ঠাবান (বা ভক্ত) সাধক কর্মফলাসক্তি ত্যাগ করে সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তি পান, কিন্তু যাদের আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয় নি, তারা বাসনা-তাড়িত হয়, (কর্ম) ফলের প্রত্যাশী হয়, (সেইজন্যই) তারা বদ্ধ থাকে।

যুক্ত—অর্থাৎ কর্মযোগী।

শান্তিম্—যখন ঐশী শান্তি আমাদের উপর বর্ষিত হয়, তখন আমাদের সমস্ত সত্তা দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় ও রূপান্তরিত হয়; পূর্বে যা অন্ধকার ও অস্পষ্ট ছিল, তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রাজ্ঞ আত্মা।

১৩। সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥

(১৩) যে দেহী (আত্মা) মন দিয়ে (ভিতরে ভিতরে) সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নিজ প্রকৃতিকে বশে এনেছেন, তিনি নবদ্বারযুক্ত দেহে স্বচ্ছন্দে বাস করেন, কর্ম করেনও না, করানও না।

কঠ উপনিষদের পঞ্চম, ১ তুলনীয়।

নবদ্বার অর্থে দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তৃতীয়, ১৮ দ্রষ্টব্য।

১। এমার্সনের উক্তি দ্রষ্টব্য।

হে সহনশীল তারকাপুঞ্জ, আমাকে তোমাদের ভাব শেখাও,
তোমরা প্রতিদিন পুরাতন আকাশে ওঠ,
অথচ শূন্যে কোন ছায়া, কোন ক্ষতচিহ্ন রাখো না,
সেখানে জরা বা মৃত্যুভয়ও দেখা দেয় না।

১৪। ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

(১৪) বিভু লোকের জন্য কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না। তিনি কর্মও করেন না, আবার কর্মকে তার ফলের সঙ্গে সংযুক্তও করেন না। (এগুলি) প্রকৃতির কাজ।

প্রভু জ্ঞাতার সার্বভৌম আত্মা ; প্রকৃত আত্মা যা সর্বভূতে এক।

১৫। নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

(১৫) সর্বময় আত্মা কারুর পাপও গ্রহণ করেন না, কারও সুকৃতিও গ্রহণ করেন না। জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত্ত হওয়াতেই জীবেরা বিভ্রান্ত হয়।

বিভু—সর্বব্যাপী। প্রাতিস্বিক আত্মা স্বতন্ত্র শাশ্বত ও নির্বিকার মোনাড (Monad) নয়। এখানে বিভু বলতে, হয় জ্ঞানীর আত্মাকে অথবা পরমাত্মাকে বোঝাচ্ছে, অদ্বৈত বেদান্তের মতে অবশ্য দুই অভিন্ন।

অজ্ঞানেন—অজ্ঞতা দ্বারা। শেষ পর্যন্ত বহুবিধ থাকে এই যে বিশ্বাস, এ অজ্ঞতাপ্রসূত।

জ্ঞানম্—জ্ঞানই সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের একমাত্র ভিত্তি।[১]

১৬। জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

(১৬) জ্ঞান দ্বারা যাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে, তাদের কাছে জ্ঞানালোকেই সূর্যালোকের মত পরমাত্মা উদ্ভাসিত হন।

তৎপরম্ :—পরমার্থ তত্ত্বম্, চরম সত্তা। ইতি শঙ্কর।

অহংয়ের অতিগ আত্মা পাপপুণ্য, সুখদুঃখ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। তিনি শুধু সকলের সাক্ষী।

১৭। তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥

(১৭) তাঁর কথা চিন্তা করে, সমস্ত চৈতন্যসত্তা তাঁর দিকে বিন্যস্ত

১। অজ্ঞানেনাবরণবিক্ষেপশক্তিমতা মায়াখ্যেনানৃতেন তমসা জ্ঞানং জীবেশ্বরজগদ্ভেদভ্রমাধিষ্ঠানভূতং নিত্যং স্বপ্রকাশং সচ্চিদানন্দরূপম-দ্বিতীয়ং পরমার্থসত্যম্। ইতি মধুসূদন।

করে, তাঁকেই সমগ্র লক্ষ্য ও তাঁকেই ভক্তির একমাত্র পাত্র করে, তাঁরা এমন অবস্থায় পৌঁছান যেখান থেকে ফেরা যায় না, তাঁদের সমস্ত কলুষ জ্ঞান দ্বারা ধৌত হয়ে যায়।

কর্ম দ্বারা যে মিথ্যা অহং বোধ জন্মায়, তা দূর হয় আর জীব পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য উপলব্ধি করে, সেই কেন্দ্র থেকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

১৮। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

(১৮) পণ্ডিতেরা বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও ব্রাত্যকে সমদৃষ্টিতে দেখেন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে— মহৎ বিদ্যা লোককে অতিবিনীত করে। আমাদের বিদ্যা যত বাড়ে ততই আমরা বেষ্টনকারী অন্ধকার সম্বন্ধে বেশী সচেতন হতে থাকি। প্রদীপ জ্বাললে তবেই বুঝতে পারি বাহিরে কত অন্ধকার। আমরা যা জানি না তার তুলনায় আমরা যা জানি তা অকিঞ্চিৎকর।[১] সামান্য জ্ঞান থেকে গোঁড়ামি আসে, আর একটু জ্ঞান হলে মনে নানা প্রশ্ন জাগে, আরও একটু জ্ঞান হলে আমরা প্রার্থনারত হই। এ ছাড়াও ঈশ্বরের প্রীতির দ্বারাই আমাদের অস্তিত্ব যে রক্ষা পাচ্ছে এই জ্ঞানও আমাদের বিনীত করে। সমস্ত কালের মহত্তম চিন্তাশীল ব্যক্তিরা গভীর ভাবে ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন।

বিনয়—নম্রতা বা শিষ্টতা, এ সদভ্যাস বা সংস্কৃতি থেকে আসে। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগকে বিনয় বা সদভ্যাস বলে। বিনয় গর্ব বা দম্ভের বিপরীত। মানবাতীত উপাদানের উপর আমাদের নির্ভরতা বুঝতে পারলে তা থেকে বিশ্বজাগতিক ধর্মভাব আসে। প্রকৃত বিদ্বানরা বিনয়ী।

সমদর্শিন :—এক দৃষ্টিতে দেখা। শাশ্বত বস্তু সকলের মধ্যেই এক, কি

১। নিউটনের সেই পরিচিত উক্তিই এর উদাহরণ :—"আমি জগতের কাছে কিভাবে পরিচিত তা জানি না; কিন্তু আমার নিজের কাছে আমাকে সমুদ্রবেলায় ক্রীড়ারত একটি বালকের মত মনে হয়, সেখানে খেলতে খেলতে সে একটি নুড়ি অন্যগুলির থেকে বেশী মসৃণ বা ভাল দেখতে বলে সেটা কুড়িয়ে নিচ্ছে, অথচ সামনে সত্যের মহাসমুদ্র অনাবিষ্কৃত পড়ে রয়েছে।"

হেনরি আডামসের একটা কথাও উদ্ধার করা যাক, "আসলে মানুষ অতি সামান্যই জানে এবং ভবিষ্যতে তার নিজের অজ্ঞতার সম্বন্ধে এইটুকু জানতে পারবে যাতে সে নতজানু হয়ে প্রার্থনারত হবে।"

জন্তুতে, কি মানুষে, কি বিদ্বান ব্রাহ্মণে, কি হেয় পতিতে। সকল দেহেই ব্রহ্মালোকের বসতি, এবং প্রতিভাস দেহের বিভিন্নতা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

ব্রহ্মের যা লক্ষণ, সৎ, চিৎ ও আনন্দ তা সকল ভূতেই বিরাজমান, তাদের নামে ও রূপে অর্থাৎ দেহ সংগঠনে যা কিছু তফাৎ।[১] সকলের মধ্যে যে চরম সত্তা আছেন, তাঁর দিক থেকে দেখলে আমরা "সমদর্শী"।[২] মৌলিক দ্বৈত হল পুরুষ ও প্রকৃতিতে, দেহ ও আত্মায় নয়। এ পার্থক্য বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে। বৈষয়িকতা, বিচ্ছিন্নতা ও নিয়তিবশ্যতার জগৎই হল প্রকৃতি। সেখানে আমাদের খনিজে, উদ্ভিদে, জন্তুতে ও মানুষে প্রভেদ আছে কিন্তু তাদের সকলের মধ্যেই একটা অভ্যন্তরীণ অবৈষয়িক সত্তা আছে। বিষয়ী সত্তার বাস সকলের মধ্যেই। প্রয়োগজ বহুবিধার সঙ্গে মৌলিক অভিন্নতার এই বচন অসঙ্গত নয়। এমন কি শঙ্করাচার্যও স্বীকার করেছেন যে এক শাশ্বত সত্তাই নিজেকে উচ্চ থেকে উচ্চতর আকারের স্তরপর্যায়ে নিজেকে প্রকট করেছেন।[৩] এই প্রয়োগজ বিভিন্নতা দেখে আমরা যেন ভুলে না যাই যে অধিবিদ্যার দৃষ্টিতে সমস্ত সত্তার ভিতরে একটা জিনিস আছে যা সকলের পক্ষে সমান। একথা মনে রাখলে সর্বভূতে আমরা দয়া ও অনুকম্পা অনুভব করতে পারি। প্রাজ্ঞেরা সর্বভূতে এক ঈশ্বরকে দেখেন ও ঈশ্বরের মত সর্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ করেন।

১৯। ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

(১৯) যাঁদের মন সাম্যে স্থিত তাঁরা ইহলোকেই সৃষ্ট (জগৎ)-কে জয় করেছেন। ঈশ্বর ত্রুটিহীন ও সকলের মধ্যেই সমান, অতএব তাঁরা ঈশ্বরে অধিষ্ঠিত।

ছান্দোগ্যোপনিষদ, দ্বিতীয়, ২৩,১ দ্রষ্টব্য।

মোক্ষ আমরা ইহলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে থেকেই অর্জন করতে পারি।

১। অস্তিভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্।

২। চরাচরং জগদ্ ব্রহ্মদৃষ্টৈব পশ্যতি। ইতি নীলকণ্ঠ।

৩। একস্যাপি কূটস্থস্য চিত্ত তারতম্যাৎ, জ্ঞানৈশ্বর্যাণামভিব্যক্তিঃ পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, প্রথম, ৩, ৩০।

২০। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥

(২০) প্রিয় জিনিস পেয়ে আনন্দ করাও উচিত নয়, আবার অপ্রিয় জিনিস পেয়ে ক্ষুব্ধ হওয়াও উচিত নয়। যিনি স্থিরবুদ্ধি ও মোহবর্জিত (সেইরূপ) ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মেতেই স্থিত থাকেন।

ব্রহ্মণি স্থিত :—ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত। তিনি তাকে পাবার চেষ্টা করেন, তাতে পৌঁছান, তার মধ্যে প্রবেশ করেন ও তাতেই প্রতিষ্ঠিত হন।

২১। বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্‌।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥

(২১) বাহ্য (বস্তু) সকলের সংস্পর্শ থেকে চ্যুত হলে আত্মে যে আনন্দের নিবাস, সেই সুখ পাওয়া যায়। এইরকম যিনি ব্রহ্মযোগে আত্মসমাহিত হয়েছেন তিনি অক্ষয় আনন্দ ভোগ করতে থাকেন।

ইন্দ্রিয়ের মায়াজালকে যিনি ছিন্ন করতে পেরেছেন এবং সনাতনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি দিব্যানন্দ প্রাপ্ত হন।[১]

২২। যে হি সংস্পর্শজাভোগা দুঃখ যো নয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥

(২২) (বিষয়) সংস্পর্শে যে সুখ জন্মায় তা দুঃখেরই উৎস, কেননা তার আদিও আছে, অন্তও আছে, অতএব হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), বিজ্ঞ লোক তাতে আনন্দিত হন না।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪ সংখক শ্লোকের নীচে মন্তব্য দর্শনীয়।[২]

২৩। শক্লোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্‌ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্ত স সুখী নরঃ ॥

(২৩) যিনি কাম-ক্রোধের আবেগ ইহজগতে দেহত্যাগের পূর্বেই প্রতিরোধ করতে পারেন, তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী মানুষ।

১। ব্রাদার লরেন্স বলেছেন, "আমি জানি, সদাচরণ করতে হলে অন্তর থেকে আর সব বস্তু বার করে দিতে হবে, কেননা ঈশ্বর অন্তরে একেশ্বর হতে চান এবং অন্য সব বিষয় বহির্ভূত না হলে তিনি তাকে সম্পূর্ণ পান না, কাজেই তার উপর তাঁর ক্রিয়াও চলতে পারে না। তিনি অন্তর খালি পেলেই তাতে সক্রিয় হন।" The Practice of the presence of God.

২। ভাগবতে আছে : "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্‌
চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে সুখদুঃখে নিরন্তরম্‌।

যে নিরাসক্তি থেকে আন্তরিক শান্তি, মুক্তি ও আনন্দ আসে তা শরীর ধারণ করে পৃথিবীতেই আয়ত্ত করা যায়। সংসারে মানবজীবন যাপন করেও আন্তরিক শান্তি পাওয়া যায়।

আন্তরিক শান্তি।

২৪। যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥

(২৪) যিনি নিজের অন্তরের মধ্যেই সুখ, আনন্দ ও জ্যোতি দেখতে পান, সেই যোগী ব্রহ্মত্ব লাভ করে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

যোগী সংবিতে নিজের মধ্যে যে শাশ্বত আছে তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যান। পরের শ্লোকে দেখা যাবে যে নির্বাণ মানে বিলুপ্তি নয়। প্রজ্ঞা ও আত্মস্থতা যুক্ত একটা সদর্থক অবস্থা।

২৫। লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥

(২৫) যে ঋষিদের পাপ নাশ হয়েছে, যাঁদের সংশয় (দ্বৈতভাব) দূর হয়েছে, যাঁদের মন সংযত এবং যাঁরা সকলের হিতের জন্য কার্য করে হৃষ্ট হন তাঁরাই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

সর্বভূতহিতে রতাঃ:—যে আত্মা তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তিলাভ করেছে তাতে প্রীতি ও অনুকম্পাও থাকে। যে ব্রহ্মে সর্বভূতের স্থিতি দেখে সে পতিত ও পাপীদের মধ্যেও ভগবানকে দেখতে পায় ও তাদের প্রতি গভীর প্রেম ও সহমর্মিতা অনুভব করে।

অন্যের মঙ্গল করা অর্থ তাদের ঐহিক আরাম দেওয়া বা তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা নয়। তাদের প্রকৃত স্বভাব ও প্রকৃত সুখলাভ করতে সহায়তা করাই তাদের মঙ্গল করা। যে শাশ্বত সত্তার মধ্যে আমরা সকলেই অবস্থিত তার ধ্যান আমাদের অন্য লোকের প্রতি সেবাবৃত্তিকে আন্তরিকতা ও সাহায্যদান করে। সমস্ত কর্মই পরমের জন্য, জগদ্‌হিতায় কৃষ্ণায়। জগৎকে বশে আনা মানে পরলোকরত হওয়া নয়, সামাজিক দায়িত্বস্খলন নয়।

গীতায় ধর্মের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুই দিকের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে তাঁর দ্বারা নরপ্রকৃতিকে আপ্লুত করতে হবে, আর সামাজিকভাবে সংসারে ঐশী

প্রতিমা স্থাপন করতে হবে। প্রাতিস্বিককে তার স্বাতন্ত্র্যে ও অদ্বিতীয়তায় উন্মেষিত করতে হবে এবং তাকে প্রত্যেক মানুষের, এমন কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষের মর্যাদাকেও স্বীকার করতে হবে। মানুষকে শুধু পারমার্থিক জগতে উঠলেই চলবে না, তাকে জীবজগতেও নেমে আসতে হবে।[১]

২৬। কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

(২৬) যে যতিরা কাম ক্রোধ বর্জন করে সংযতমনা হয়ে আত্মাকে জেনেছেন, তাঁদের কাছেই ব্রহ্মনির্বাণ থাকে।

তাঁরা আত্মচেতনায় বাস করেন। ইহলোকেই আনন্দময় স্থিতির সম্ভাব্যতার নির্দেশ এই শ্লোকে রয়েছে।

২৭। স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥

২৮। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥

(২৭-২৮) সমস্ত বাহ্য বিষয়কে বর্জন করে, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, নাসামধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসকে সমান করে যে মুনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করতে পেরেছেন ও মোক্ষলাভের জন্য উদগ্রীব হয়েছেন এবং কাম ক্রোধ ও ভয় দূর করতে পেরেছেন, তিনিই সর্বদা মুক্ত।

"যখন চিন্তাকে দুই চক্ষুর মধ্যবিন্দুতে নিবদ্ধ করা যায় তখন দিব্য-জ্যোতি স্বতঃ উচ্ছ্বরিত হয়" (The secret of the Golden flower-এর Wilhelm কৃত ইংরাজী অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত)। যে বুদ্ধিসংযোগে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তারই প্রতীক।

২৯। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

(২৯) আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর ও সর্বভূতের সুহৃদ জেনে, (ঋষি) শান্তিলাভ করেন।

তৃতীয় ভগবান সর্বভূতের প্রভু ও সুহৃদ, তিনি প্রতিফলের প্রত্যাশা না রেখে

১। দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা
পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ।

সকলের মঙ্গল করেন।[১] ঈশ্বর দূরস্থিত জগৎ-শাসক মাত্র নন, তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহায়ক। আমরা যদি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে পারি তো তিনি সকল অশুভকে দমন করতে আমাদের সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। ভাগবত বলছেন: "যার আমি প্রিয়, আত্মা, পুত্র, বন্ধু, গুরু, আত্মীয় ও ইষ্টদেবতা।"[২]

ইতি কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

কর্মসন্ন্যাস যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়ের সমাপ্তি।

১। সর্বপ্রাণিনাং প্রত্যুপকার নিরপেক্ষতয়া উপকারিণম্। ইতি শঙ্কর। ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্য নবম, ১৮-ও দ্রষ্টব্য।

২। যেষামহং প্রিয়, আত্মা, সুতশ্চ
সখা, গুরুঃ, সুহৃদো দৈবমিষ্টম্। তৃতীয়, ২৫, ৩৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শুদ্ধ যোগ

সন্ন্যাস ও কর্ম একই

শ্রীভগবান উবাচ

১। অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥

(১) শ্রীভগবান বললেন—যে তার কর্তব্য-কর্ম ফলের প্রত্যাশা না রেখে সম্পাদন করে সে একাধারে সন্ন্যাসী ও যোগী। হোমাগ্নি জ্বালা ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বর্জন করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

উপদেষ্টা স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছেন যে বাহ্য কর্মের সঙ্গে সন্ন্যাসের অল্পই সম্পর্ক আছে। সন্ন্যাস অন্তরের ভঙ্গী। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য হোম বা আহ্নিকাদি বর্জন করার প্রয়োজন নেই। মনে ত্যাগের ভাব না থাকলে শুধু ক্রিয়াকর্ম বিসর্জন নিরর্থক।

শঙ্করাচার্য কিন্তু "কেবলম্" কথাটি ব্যবহার করে এই রকম বোঝাতে চেয়েছেন "যিনি হোম করেন না বা অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কর্মাদি করেন না, তিনিই একমাত্র সন্ন্যাসী নন।" এইরকম ব্যাখ্যায় মূল শ্লোকের উপর সুবিচার করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

২। যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥

(২) হে পাণ্ডব (অর্জুন), যাকে সন্ন্যাস বলে তাকে তুমি যোগযুক্ত কর্ম বলেই জানবে, কেননা যে (স্বার্থপ্রণোদিত) উদ্দেশ্য ত্যাগ না করেছে সে কখন যোগী হতে পারে না।

সন্ন্যাস—ত্যাগ। ভিতরে ভিতরে পুরস্কারের প্রত্যাশা না রেখে প্রয়োজনীয় কর্ম সুসম্পন্ন করাই সন্ন্যাস। নিজেকে সম্পূর্ণ বশে আনা ও পূর্ণ আত্মহুতা, সেই প্রকৃত যোগ।

এই শ্লোকে সুনিয়ত কর্ম (যোগ)-কে ত্যাগের (সন্ন্যাস) সমান বলা হয়েছে।

পথ ও গন্তব্য

৩। আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

(৩) যে মুনি যোগী হতে চান কর্মই তাঁর পন্থা বলে কথিত আছে, আবার যোগারূঢ় অবস্থায় আত্মসংবরণজাতই প্রশান্তি সাধনের উপায় বলে বর্ণিত হয়েছে।

মোক্ষাভিলাষীর পক্ষে (সাধনাবস্থায়) অন্তরে ত্যাগ ভাব রেখে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াতে সুবিধা হয়। একবার আত্ম বশে এলে (সিদ্ধাবস্থায়) আমরা ঈশ্বর চেতনায় স্থিত হয়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়েই কর্মে প্রবৃত্ত হই। কাজ দিয়ে আমরা আত্মসংযমে প্রয়াসী হই, আত্মসংযম অভ্যস্ত হলে শান্তি আসে। তা বলে এমন কথা নেই যে আমরা তখন সমস্ত কর্ম ত্যাগ করব। কেননা এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে যে যিনি কর্মে প্রবৃত্ত তিনিই প্রকৃত যোগী, কর্মে নিবৃত্ত যিনি তিনি নন। শম মানে কর্মবর্জন নয়। তা তত্ত্ব-জ্ঞানের কারণ হতে পারে না কেননা সিদ্ধপুরুষ তো তত্ত্বজ্ঞান লাভই করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে কর্মফল-ত্যাগ করেই যোগী পরিপূর্ণ শান্তি পান। সম্পূর্ণ সমাহিত চিত্তে তিনি কর্ম সম্পাদন করেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতায় আপ্লুত থাকেন এবং নিজের অফুরন্ত শক্তি-সঞ্জাত ঔদার্যের সঙ্গে কাজ করে যান।

৪। যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥

(৪) যখন কেউ ইন্দ্রিয় বিষয়ে এবং কর্মে আসক্তি বর্জন করতে পেরেছেন এবং সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম থেকে বিরত হয়েছেন, তখন তাঁকে যোগারূঢ় বলা যায়।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী—সকল প্রকার সংকল্প যিনি ত্যাগ করেছেন। আমাদের অনুরাগ-বিরাগ বর্জন করতে হবে। নিজেদের ভুলে গিয়ে নিজেকে হিসাবের বাইরে রাখতে হবে। সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে, অহংকে শাসন করে, পরমের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সাধক মনের এমন অবস্থা আয়ত্ত করেন যা শাশ্বতের কাছাকাছি। যে নিরবচ্ছিন্ন কালজয়ী সংবিৎকে সাধক উপলব্ধি করতে চায় তারই কিছু অংশ সে এইভাবে ভোগ করে।

মুক্তপুরুষের কর্মে কামনা ও আসক্তি তো থাকেই না, যে অহমিকা-যুক্ত সংকল্প থেকে কামনা জন্মায় তাও থাকে না। মনু বলেন, "সংকল্প থেকেই সকল কামনার জন্ম।"[১] মহাভারত বলে, "হে কামনা, আমি তোমার মূল জানি। তুমি সংকল্প বা চিন্তা থেকে উদ্ভূত। আমি তোমার চিন্তা ত্যাগ করলেই তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।"[২]

৫। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

(৫) লোক নিজেকে দিয়েই নিজেকে উদ্ধার করুক, নিজেকে কখনও যেন সে অবনমিত করে না, কেননা আত্মের আত্মই বন্ধু এবং আত্মই আত্মের শত্রু।

ধম্মপদে আছে: "আত্মই আত্মের প্রভু"।[৩] "আত্মই আত্মের লক্ষ্য"।[৪]

আমাদের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজমান। সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের প্রাতিস্বিক চেতনার নিচেই যে অপরিমেয় চেতনা রয়েছে তাই ব্রহ্ম। এ দুই চেতনা ভিন্ন প্রকারের কিন্তু যে তাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ করতে পারে সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা নিজেদের মধ্যে পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন নই এই কারণে যে আমাদের মন অনুরাগ ও বিরাগের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের থেকে দূরে না এলে আমাদের মধ্যেকার দিব্য বিভূতি সম্বন্ধে আমাদের চেতনা আসবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিরর্থকতা, অসঙ্গতি ও মালিন্য সম্বন্ধে যদি বোধ না থাকে তো প্রকৃত আত্ম আমাদের সাধারণ জীবনের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাত্মা ও প্রাতিস্বিক আত্মা কিন্তু পরস্পরবিরোধী নয়। বিশ্বাত্মা প্রাতিস্বিক আত্মার শত্রু বা মিত্র দুই-ই হতে পারে। আমরা যদি আমাদের তুচ্ছ কামনা-বাসনাকে দমন করতে পারি, আমাদের স্বার্থপ্রণোদিত সংকল্প যদি না খাটাই, তাহলে আমরাই বিশ্বাত্মার বাহন হব। আমাদের আবেগগুলি যদি বশে থাকে এবং আমাদের ব্যক্তিগত আত্ম যদি নিজেকে বিশ্বাত্মার কাছে উৎসর্গ করে, তাহলে

১। সংকল্প মূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ। দ্বিতীয়, ৩।

২। কাম, জানামি তে মূলম্, সংকল্পাৎ ত্বং হি জায়সে
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি॥ শান্তিপর্ব, ১৭৭, ২৫

৩। অত্তাহি অত্তনো নাথো। ১৬০

৪ অত্তাহি অত্তনো গতি। ৩৮০।

বিশ্বাত্মাই আমাদের গুরু ও পথপ্রদর্শক হবে।[১] আমাদের প্রত্যেকেই উঠতেও পারি, পড়তেও পারি, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের নিজেদের হাতে।

৬। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

(৬) যে তার (ইতর) আত্মকে (মহৎ) আত্ম দ্বারা জয় করতে পেরেছে, আত্মই তার বন্ধু কিন্তু যে তার (মহৎ) আত্মকে আয়ত্তে আনতে পারে নি তার আত্মই তার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করে শত্রু হয়।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ইতর ভাব আছে, তাকে আমাদের মধ্যেকার মহৎ ভাব দ্বারা বশে আনতে হবে। প্রকৃতির নিয়তিকে প্রকৃতিকে বশে আনার ক্ষমতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আত্মের নীচ অংশকে বিনষ্ট করার প্রয়োজন হয় না, তাকে বশে রাখতে পারলে সে সহায়ক হয়।

৭। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥

(৭) নিজের আত্মকে (নীচাংশ) জয় করে আত্মবশের প্রশান্তি লাভ করলে, পরমাত্মা তাতে সমাহিত হন, গরম-ঠাণ্ডা, সুখ-দুঃখ মান-অপমান কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে না।

১। Boehme বলেন, "তোমার নিজেব সংকল্প, শ্রবণ ও দর্শন ছাড়া আর কিছুই সত্য সত্য তোমাকে তার থেকে দূরে রাখতে পাবে না, সেগুলিই তোমার ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় পৌঁছানোব বাধা। তুমি যার থেকে অবতীর্ণ ও উদ্ভূত হয়েছ, তারই বিরুদ্ধে প্রয়াসী হও বলেই তুমি নিজ সংকল্প দিয়ে ঈশ্বরেব ইচ্ছা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কর, নিজ দৃষ্টি দিয়ে ঈশ্বরেব দৃষ্টিকে ভিন্ন কবে দাও।" St. John of the Cross বলেছেন, "আত্মা যতই নিজের শক্তির দম্ভে, অভ্যাস ও অনুরাগবশে সৃষ্ট বস্তুগুলিকে আঁকড়ে রাখতে চায়, ততই তার সংযোগ থেকে অনুরাগ চলে যায়, কেননা সে তখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হাতে ছেড়ে দেয় না, যাতে ভগবান তাকে অতিপ্রাকৃত ভাবে রূপান্তরিত করতে পারেন।"

জামি তাঁর লাওয়ায়িতে লিখেছেন:

আমার অন্তঃকরণ পবিত্র কর, আমার আত্মাকে ভ্রমমুক্ত কর,
আমার দৈনিক জীবনে দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু নিত্যসাথী হোক,
আত্ম থেকে তোমার রাস্তায় আমাকে পথ দেখাও
যাতে আত্মের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার কাছে এগুতে পারি।

Whinfiedএর ইংরাজী অনুবাদ।

যিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পেরেছেন এ তাঁরই আনন্দময় অবস্থা। তিনি জিতাত্মা, বৈপরীত্যের সন্তাপ দিয়ে তাঁর স্তব্ধতা ও প্রশান্তি বিচলিত হয় না।

পরমাত্মা সমাহিত—শঙ্কর এর ব্যাখ্যা করেছেন যে পরমাত্মা তাকে নিজের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচনা করেন।[১] দেহস্থ আত্ম ঠাণ্ডা-গরম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বৈপরীত্যতে সাধারণতঃ মগ্ন থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়কে সংযত করে জগৎকে বশে আনতে পারলে সেই আত্মই মুক্ত হয়। (দেহস্থ আত্মা আর পরমাত্মা ভিন্ন নয়। আত্ম যখন প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা আবদ্ধ তখন তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে, তা থেকে মুক্ত হলে তখনই তাকে পরমাত্মা বলা হয়।[২] এ অবশ্যই অদ্বৈত বেদান্তের কথা।)

যাঁরা এ মত স্বীকার করেন না, তাঁরা পরমাত্মার সন্ধিবিচ্ছেদ করে পরমকে সমাহিত ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যাখ্যা করেন।

রামানুজ পরমকে ক্রিয়ার বিশেষণ ধরে বলেছেন যে আত্মই মহৎ ভাবে উপলব্ধ হয়।

শ্রীধর বলেন, যে লোক নিজের আত্মের মধ্যে ঘনীভূত হয়।[৩] আনন্দগিরি বলেন যে এরকম ব্যক্তির আত্ম সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হয়।[৪]

সমাহিত—সমতার দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ। এ অবশ্য প্রচলিত অর্থ নয়।

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥

(৮) যে যোগী জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত, যিনি নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি মাটি পাথর ও সোনাকে সমদৃষ্টিতে দেখেন তাঁকেই নিয়ত (যোগী) বলা যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান—তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক শ্লোকের উপর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

১। সাক্ষাৎ আত্মভাবেন বর্ততে।

২। আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রকৃতৈর্গুণৈঃ
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৮৭, ২৪।

৩। সমাহিতঃ আত্মনিষ্ঠঃ ভবতি।

৪। সম-আ-হিত, সমাধির সহিত তুলনীয়। জিতাত্মনঃ নির্বিকার চিত্তস্ত আত্মা, চিত্তং পরম উৎকর্ষেণ সমাহিতঃ সমাধিং প্রাপ্তঃ ভবতি।

কূটস্থ—শব্দার্থে উচ্চস্থানে স্থিত, অনড়, নির্বিকার, দৃঢ়, অবিচলিত, শান্ত।

জগতের পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মের উপর অভিনিবিষ্ট হলেই যোগীকে যোগযুক্ত বলা হয়। এই ধরনের যোগী বাহ্য দৃশ্যের অন্তরালে যে সত্তা আছে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তৃপ্ত। জগতের বস্তু ও ঘটনা দ্বারা তিনি বিচলিত হন না কাজেই পরিবর্তনশীল জগতের ঘটনাকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখেন এইরূপ বলা হয়।

৯। সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥

(৯) যিনি বন্ধু, সাথী ও শত্রুদের সমভাবে দেখেন। যারা উদাসীন ও নিরপেক্ষ, ঘৃণ্য ও আত্মীয়, সাধু ও পাপী—তাদের তিনি সমদৃষ্টিতে দেখে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন।

বিশিষ্যতের পাঠান্তর বিমুচ্যতে। ভগবদ্‌গীতার শঙ্করভাষ্য। এরকম যোগ কিভাবে আয়ত্ত করা যায়?

দেহ ও মনের উপর অবিরাম সতর্কতা প্রয়োজন।

১০। যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥

(১০) যোগী সর্বদা নির্জনে থেকে, একাকী, সংযতচিত্ত, কামনা-রহিত হয়ে ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে (প্রত্যাশা) ত্যাগ করে (পরমাত্মার) তাঁর চিত্ত সমাহিত করুন।

এখানে গীতার উপদেষ্টা পাতঞ্জলির যোগসূত্র অনুযায়ী মানসিক তপস্যার কৌশল বোঝাচ্ছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের চেতনাকে সাধারণ জাগ্রত অবস্থা থেকে উন্মেষিত করতে থাকা যতক্ষণ না ব্রহ্মের সঙ্গে তার মিলন ঘটে। মানুষের মন সাধারণতঃ বহির্মুখী। জীবনের যান্ত্রিক ও বৈষয়িক দিকে মন ব্যাপৃত থাকলে চেতনার এক অসম অবস্থা হয়। যোগ চেতনার অন্তরের জগতের মধ্যে অভিযান চালিয়ে চেতনার ও অন্তর্জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করে।

আমাদের মনকে ইন্দ্রিয়ঘটিত বাসনামুক্ত করে বাইরের বিষয়ের উপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে ধ্যানের বিষয়ের মধ্যে মগ্ন করাতে হবে।[১]

১। Boehme যাকে বলেছেন, "কল্পনার চক্রকে থামিয়ে দিয়ে আত্মচিন্তা বর্জন করা।"

ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭২ সংখ্যক শ্লোকে গুরু অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তাঁর উপদেশ তিনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করেছেন কিনা, একাগ্রেন চেতসা। দৃষ্টির নির্মলতাই যখন লক্ষ্য তখন মনের সূক্ষ্মতা ও স্থিরতা প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান পরিমাণই আমাদের সত্তার চরম সীমা নয়। মনের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে এক বিন্দুতে সংহত করলে, সম্বন্ধের স্তরকে প্রয়োগজ থেকে বাস্তবে, পর্যবেক্ষণ থেকে দৃষ্টিতে উন্নীত করি, সমস্ত সত্তাকে আত্মার হাতে সমর্পণ করি। বাইবেলের Book of Proverbsএ বলা হয়েছে "মানুষের আত্মা ঈশ্বরের বর্তিকা।" মানুষের অন্তরতম প্রদেশে এমন বস্তু আছে যা দিয়ে ভগবান শিখা প্রজ্বলিত করতে পারেন।

সততম্—অবিরাম। অভ্যাস অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। কালে-ভদ্রে ধ্যান করে লাভ নেই। চেতনায় যে উন্নততর, তীব্রতর রূপের উন্মেষ প্রয়োজন, তার জন্য অবিরাম সৃজনধর্মী সাধনা লাগে।

রহসি—নির্জনে। নদীতীর বা পর্বতশৃঙ্গের মত শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ যা আমাদের চিত্তকে উর্ধ্বগামী ও অন্তরকে উন্নীত করে, সাধকের সেইরূপ এক কোলাহলবিহীন স্থান তপস্যার জন্য নির্বাচন করা দরকার। পৃথিবীতে কলরব প্রত্যহ বেড়ে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে সভ্য মানুষের উচিত শুদ্ধ চিন্তার মুহূর্তগুলিকে আয়ত্ত করা। বাইবেলের নির্দেশ: "যখন প্রার্থনা করবে তখন তোমার কোটরে ঢুকে দরজা বন্ধ কর।"[১] নীরব স্থানে সরে গিয়ে বাইরের বিক্ষিপ্তিকে দূরে রাখতে হবে। Origen প্রথম তপস্বী (Hermit)-দের যা বর্ণনা দিয়েছেন তা এখানে তুলনীয়। "তাঁরা মরুভূমিতে বাস করতেন যেখানে বায়ু নির্মলতর, আকাশ বেশী খোলা আর ভগবান বেশী পরিচিত।"

একাকী—একা। উপদেষ্টা বিশেষভাবে বলছেন যে সাধককে একা থাকতে হবে তবেই সে শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, মৃদু স্পর্শ অনুভব করতে পারবে।

যতচিত্তাত্মা—আত্মজয়ী। তাঁর উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ বা উদ্বিগ্ন হলে চলবে না। ঈশ্বরসকাশে শান্ত হওয়া শিখতে হলে জীবনভোর অভ্যাস ও সংযম করতে হবে। শঙ্কর ও শ্রীধরের মতে এখানে "আত্মা" দেহার্থে প্রযুক্ত। খবরের কাগজ ও বৈষয়িক কাগজপত্র নিয়ে কোটরে ঢুকে লাভ নেই। এমন

১। ম্যাথিউ ষষ্ঠ, ৬।

কি সেগুলি বাইরে রেখে যদি আমাদের নির্জন কক্ষের দরজা-জানলা বন্ধও করে দিই তবু তাদের চিন্তা ও তাদের সম্বন্ধে উদ্বেগ আমাদের অস্থির করতে পারে। অস্থির বা সংক্ষুব্ধ হওয়া চলবে না। চিন্তার মধ্য দিয়ে আমরা বুদ্ধির আবাহন করি, আর নীরবতা দিয়ে আমরা আমাদের গভীরতর স্তরকে স্পর্শ করি। নির্মল হৃদয়বান লোকই ভগবানকে জানতে ও দেখতে পারে, কাজেই অন্তরকে নির্মল রাখতে হবে যাতে ভগবানের রূপ তাতে প্রতিফলিত হতে পারে। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে জ্যোতির প্রতীক্ষা করতে হবে। "তোমার পিতার সঙ্গে গোপনে মিলিত হও।" ঈশ্বরের সজীব উপস্থিতি প্রত্যেক আত্মার কাছে তার প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী নীরবে উন্মোচিত হয়।[১]

প্লেটোর মেনোর (Meno) প্রথমেই প্রশ্ন "সক্রেটিস, বলতে পার সদ্‌গুণ কি শেখানো যায়?" সক্রেটিসের উত্তর, সদ্‌গুণ শেখানো যায় না, "স্মরণ করতে" হয়। স্মরণ মানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মার মধ্যে প্রত্যাবর্তন। "স্মরণ" কথাটার ব্যবহার থেকে মনে হয় যে প্রত্যেককে নিজের মধ্যে সন্ধান করতে হবে। সে নিজেই নিজের কেন্দ্র এবং নিজের মধ্যেই তার সত্য আছে। শুধু তাকে অনুসরণ করার মত সংকল্প ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। গুরুকে শেখাতে হয় না, শিষ্যকে আত্মস্থ হতে সহায়তা করলেই যথেষ্ট। প্রশ্নকারীর নিজের মধ্যেই উত্তর লুকানো আছে, তাকে সেটা যদি শুধু ধরিয়ে দেওয়া যায়। সত্য প্রত্যেক মানুষের অধিকারেই আছে, সে শুধু বৈষয়িক জগতের জটিলতায় জড়িয়ে তা থেকে বিচ্যুত হয়। বৈষয়িক জগতের সঙ্গে নিজেকে এক করে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বভাব থেকে বহিষ্কৃত বা বিচ্ছিন্ন হই। বহির্জগতে হারিয়ে গিয়ে আমরা গভীরতাকে বিসর্জন দিই। ভৌতিক ও মানসিক বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেই আমরা মুক্তির রাজত্বে পৌঁছুতে পারব।

নিরাশী—বাসনারহিত। দৈনন্দিন নানা প্রয়োজন, অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের চিন্তা ধ্যানে বিঘ্ন ঘটায় ও আমাদের ভাবজীবন থেকে বিচ্যুত করে। অতএব আমাদের বাসনা ও তজ্জনিত উদ্বেগ, লোভ ও ভয় থেকে মুক্ত হতে

১। ওয়ার্ডসওয়ার্থের উক্তি: "ভাবাবেগের কথা শান্তচিত্তে স্মরণ করাই কবিতার উৎস।" তাঁর "তরুণ কবিদের কাছে চিঠি"তে রিলকে বলেছিলেন, "তুমি নিজের মধ্যে ডুবে যাও এবং যে গভীর থেকে তোমার জীবন উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, তার মধ্যে খোঁজ কর। আমি তোমাকে এ ছাড়া আর কোন পরামর্শ দিতে পারি না।"

বলা হয়েছে। সাধক এই সব মানসিক শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে সকলপ্রকার মনচাঞ্চল্য ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবে। মানসিক পক্ষপাতিত্ব, জীবনসংক্রান্ত লক্ষ্য, এবং পরিবার ও বন্ধুদের উপর আকর্ষণ, এসব তাকে বর্জন করতে হবে। যে কিছুরই প্রত্যাশা করবে না, কিছুই দাবী করবে না।

অপরিগ্রহ—ঐশ্বর্য-বাসনামুক্ত। এই মুক্তি মনের একটা অবস্থা, বৈষয়িক সম্বন্ধ নয়। ধনসম্পত্তির ক্ষুধাকে দমন করতে হবে, ঐশ্বর্যের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে হবে। কেউ যদি অস্থির ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে দম্ভ, স্বৈরতা ও স্বত্বাভিমান দ্বারা অভিভূত হয়, তাহলে ভগবানের বাণী তার কানে পৌঁছবে না। [গীতার নির্দেশ হচ্ছে যে প্রকৃত সুখ অন্তরের অবস্থা। আমাদের জীবনযাপনের প্রণালী, মানবিক চেতনার অবস্থা যা আমাদের বাহ্য জীবন-যন্ত্রের উপর নির্ভর করে না, তাদের দিকেই গীতা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।) দেহ মৃত হতে পারে, জগৎ বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু ভাবজীবন স্থায়ী। নশ্বর জগতের বস্তু আমাদের ঐশ্বর্য হতে পারে না, ঈশ্বরভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান নিত্য বলে তাই আমাদের প্রকৃত ঐশ্বর্য। বস্তুর দাসত্ব কাটিয়ে প্রফুল্ল ভাবমুক্তি অর্জন করতে হবে।[১]

১১। শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌॥

(১১) পরিষ্কার স্থানে তাকে সুস্থির আসন গ্রহণ করতে হবে, সে আসন খুব উঁচুও হবে না, খুব নীচুও হবে না, এবং তা কুশ, মৃগচর্ম ও বস্ত্রকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তৈরী করতে হবে।

১২। তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

(১২) উপরোক্ত রূপ আসন পরিগ্রহ করে একাগ্রমনে চিত্ত ও

১। যে ধনী লোক দাবী করেছিলেন যে ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞাই তিনি পালন করেছেন তাঁকে যীশু বলেন, "তবুও একটা জিনিস তোমার নেই; তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলেই স্বর্গে তোমার সম্পত্তি কায়েম হবে।" যীশু যখন দেখলেন যে এ কথায় ধনী লোকটি খুব বিমর্ষ হয়েছেন, তখন বললেন, "ধনী লোকেদের স্বর্গরাজ্য লাভ কঠিন ব্যাপার: ছুঁচের গর্ত দিয়ে বরং এক উটের ঢুকে যাওয়া সহজ, কিন্তু ধনী লোকের স্বর্গে যাওয়া তার থেকেও কঠিন।" St. Luke, অষ্টাদশ, ১৮–২৩।

ইন্দ্রিয়কে সংযত করে সাধকের আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করা উচিত।

এখানে যোগ মানে ধ্যানযোগ। সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের বাহ্য ও জড়জীবনের সহিত জড়িত ব্যবহারিক অভিলাষের গ্রাস থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। তার প্রধান উপায় হল অভ্যস্ত ঔদাসীন্য। স্বাধীন অবিকৃত বুদ্ধি দিয়ে বস্তুসকলকে যেমনভাবে দেখা যায় সেই রকম ভাবে দেখবার ক্ষমতা উন্মেষিত হওয়া চাই। এব জন্য আমাদের নিজেকে সরিয়ে দিতে হবে। পিথাগোরাসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি নিজেকে দার্শনিক বলেন কেন, তখন তিনি এই গল্পটি বলে তার জবাব দিয়েছিলেন: যে অলিম্পিয়ার মহোৎসবে যোগ দেবার জন্য সমগ্র জগৎ এক বিচিত্র জনতারূপে একাগ্র হয়, মনুষ্যজীবনকে তার সঙ্গে তিনি তুলনা করেন। কেউ মেলায় বাণিজ্য করে উপভোগ করতে চায়। অন্যেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়মাল্য অর্জন করতে চায়, আবার কেউ কেউ শুধু দর্শক এবং এই শেষোক্ত শ্রেণীই দার্শনিক। তাঁরা নিজেদের অব্যবহিত সমস্যার উদ্বেগ ও ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখেন। শঙ্করাচার্য দেখিয়েছেন যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের অপরিহার্য গুণ হল যে নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা, স্বর্গীয় বা পার্থিব কর্মফলভোগে নিবাসক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পারমার্থিক মোক্ষলাভের জন্য উদ্দীপ্ত আগ্রহ।[১] প্লেটোর মতে, সমস্ত জ্ঞানের উদ্দেশ্য হল সদ্ভাবের ধ্যানে আমাদের উন্নীত করা, যে ভাব অস্তিত্ব ও জ্ঞান উভয়েরই উৎস। তিনিই আদর্শ দার্শনিক, সমগ্র জীবন সম্পূর্ণভাবে ভোগ করাব শেষে যাঁর "সর্বদা লক্ষ্য শান্তি, আন্তরিক নিস্তব্ধতা, নির্জনতা ও নির্লিপ্তির জীবন যেখানে তিনিও সংসারকে ভুলতে পারবেন, সংসারও তাঁকে ভুলতে পারবে। এই রকম অবস্থায় তিনি 'শুভে'র নির্জন ধ্যানের মধ্যে নিজস্ব স্বর্গপ্রাপ্ত হন। এই হল একমাত্র প্রকৃত জীবন।" "অন্তর যাদের পবিত্র তারাই ধন্য, কেননা তারা ঈশ্বরের দর্শনলাভ করবে।" এই অন্তব পবিত্র করা অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি অভ্যাসের ব্যাপার। প্লটিনাস আমাদের বলেছেন যে, "অবিচলিত হয়ে থাকার একটা অবস্থা জ্ঞান।"[২]

১। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগঃ, সমাধি সাধন সম্পৎ, মুমুক্ষুত্বম্।

২। **Enneads, চতুর্থ, ৪, ১২।**

১৩। সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

(১৩) দেহ, মস্তক ও গলাকে সোজা ও স্থির রেখে, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অন্য কোন দিকে না দেখে (দৃষ্টি যেন ইতস্ততঃ ধাবিত না হয়)।

এখানে বসবার ভঙ্গী বা আসনের কথা বলা হয়েছে। পাতঞ্জলি দেখিয়ে দিয়েছেন যে বসবার ভঙ্গী স্থির ও স্বচ্ছন্দ হলেই একাগ্রতার সহায় হয়। উপযুক্ত ভঙ্গীতেই দেহ প্রশান্ত হয়। ঈশ্বরের সজীব প্রতিমা যদি দেহে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তো দেহকে অবশ্যই পবিত্র রাখতে হবে।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রম্—নাসিকার ঠিক চূড়ায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। দৃষ্টি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হলে একাগ্রতা আসে না।

১৪। প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥

(১৪) প্রশান্ত ভাবে নির্ভীক হয়ে ব্রহ্মচর্যে অবিচলিত থেকে সংযত মনে সংহত হয়ে আমার দিকে মনকে নিবদ্ধ করে আমাতেই একাগ্র হয়ে তিনি বসে থাকুন।

ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ—কৌমার্যব্রতে অবিচলিত। যোগসাধককে যৌন আবেগকে বশ করতে হবে। হিন্দু ঐতিহ্যের শুরু থেকেই ব্রহ্মচর্যের উপর ঝোঁক। প্রশ্ন উপনিষদে পিপ্পলাদ সাধকদের আরও এক বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করতে বলেছেন, তার পরে তিনি তাঁদের পরাজ্ঞানে দীক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়ে তবে সত্যজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। কায়-মনোবাক্যে, সর্ব অবস্থায়, সর্বস্থানে ও সর্বদা মৈথুন বর্জন করাই ব্রহ্মচর্যের সংজ্ঞার্থ।[১] কথিত আছে যে দেবতারা ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করেছিলেন।[২] জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে শিব বলেছেন যে ব্রহ্মচর্যই আসল তপ এবং যিনি অবিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তিনি মানুষ নয়

১। যাজ্ঞবল্ক্য লিখছেন,
কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্যং প্রচক্ষতে।

২। ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমুপাঘ্নত। অথর্ববেদ

দেবতা।[১] (কিন্তু আত্মনিগ্রহমূলক যৌনসংযোগ ত্যাগকে ব্রহ্মচর্য বলে না, ব্রহ্মচর্য মানে যৌনআবেগকে বশে আনা। হিন্দু ঐতিহ্যে যে গৃহস্থের যৌন-জীবন সংযত, তিনিও ব্রহ্মচারী, যিনি সকল যৌনসম্পর্ক বর্জন করেছেন, তাঁর মতই।[২] ইন্দ্রিয়কে নষ্ট করে, হৃদয়কে উপবাসী করাকে ব্রহ্মচারী হওয়া বলে না।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের তপশ্চর্যায় সংসার শরীর ও শয়তানকে দমন করার জন্য যে দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য ও বাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া হত তার সঙ্গে যোগাভ্যাসের জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন তাদের তুলনা করা যেতে পারে।

সকল চিন্তাকে স্তব্ধ করার যে নঞর্থক পন্থা তার সদর্থক ফল হল আত্মে একাগ্রতা। যোগাভ্যাসের প্রচলিত প্রথা হল "ঈশ্বর-প্রণিধান"। মন স্থির হওয়া মানে মনকে শূন্য করা নয়, মন তখন ব্রহ্মে মগ্ন থাকে "মচ্চি ত্তঃ মৎপরঃ।"

একনিবদ্ধ দৃষ্টিই সত্যকে দেখতে পায়। প্রার্থনা ও আবেদন দ্বারা

১। ন তপস্তপেত্যাহুঃ ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্।
ঊর্ধ্বরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ।

ব্রহ্মচর্য পালনে যে কত বিঘ্ন তা আমরা খ্রীষ্টীয় সন্তদের জীবনে দেখতে পাই। সেণ্ট অগস্টাইন প্রার্থনা করতেন: "আমাকে ব্রহ্মচর্য ও সংযম দাও কিন্তু এখনই নয়।" Confessions Bk VIII, Ch VII। রোদাঁ সমগ্র বিষয়টি এক ভাস্কর্যে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর নাম শাশ্বত প্রতিমা (Eternal Idol)। তাতে একটি নারী হাঁটু গেড়ে বসে পিছনে হেলে, তার দেহকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, হাত দুটি দুপাশে ঝুলে আছে। আর তার বক্ষদ্বয়ের মধ্যখানে এক দাড়িওলা পুরুষের মুখ। পুরুষটিও হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে কাতর বাসনায় তার আলিঙ্গন ভিক্ষা করছে। সহস্রের মধ্যে এমন একটি লোকও হয়তো পাওয়া যাবে না, যে তার প্রিয়ার জন্য তার সমস্ত আদর্শ, তার সর্বোত্তম ধারণা, যা কিছু তার কাছে ঈশ্বরের দ্যোতক তা সমস্ত বর্জন না করবে। বর্তমানকালের অনেকের মতে ব্রহ্মচর্যাবস্থা স্বার্থসঞ্জাত ও নিষ্প্রভ। হিন্দুরা এর উপর যতটা জোর দেন সেটা তাদের কাছে একটু অদ্ভুত ও বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।

২। ভার্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারি ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ। মহাভারত। মনুও দ্রষ্টব্য। হিন্দুদের মধ্যে অহল্যা, কুন্তী, মন্দোদরী, দ্রৌপদী ও তারা-কে মহাপতিব্রতা রূপে সতীদের আদর্শ বলে ধরা হয়, তাঁদের পঞ্চমহাকন্যাও বলা হয়। টমাস হার্ডি টেসকে পবিত্র নারী বলে মনে করতে বলেছেন। সতীত্ব একটা মানসিক অবস্থা।

পারমার্থিক জীবনের অধিকারী হওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন গভীর ভক্তি, নীরব ধ্যান, চেতনাকে আত্মার গভীরতম অংশে উন্মোচন করে দেওয়া যাতে জীবাত্মা দিব্যভাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়। যাঁরা এই কৌশল আয়ত্ত করেছেন তাঁদের বাহ্য সাহায্যের, মতবাদে নিষ্ঠা বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা নিমগ্নতার সঙ্গে ঔদাসীন্যকে এক করতে পেরেছেন বলে তাঁদের দৃষ্টি সৃষ্টিধর্মী হয়। তাঁরা সংসারে কর্মলিপ্ত থাকলেও আবেগহীন প্রশান্ত ভাবে অবিচলিত থাকেন। জোয়ার-ভাঁটা দ্বারা অনুদ্বেজিত জলাশয় স্থিতপদ্মের সঙ্গে তাঁদের তুলনা দেওয়া হয়।

১৫। যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥

(১৫) সংযত মন, সর্বদা সমাহিতচিত্ত যোগী যে শান্তি ও পরম নির্বাণ আমাতে বিরাজমান তাই প্রাপ্ত হন।

১৬। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥

(১৬) যিনি অতিরিক্ত আহার করেন বা অত্যন্ত বেশী উপবাস করেন, তাঁর দ্বারা যোগ হবে না। হে অর্জুন, যিনি অতিরিক্ত নিদ্রা যান বা অধিক সময়ই জাগ্রত থাকেন তাঁর জন্যও যোগ নয়।

পাশব প্রবৃত্তি থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। সর্ব বিষয়ে বাড়াবাড়ি বর্জন করতে হবে। এই উপদেশের সঙ্গে বৌদ্ধদের মধ্যপন্থা ও আরিস্টটলের স্বর্ণমণ্ডিত মধ্যম পন্থা (Golden mean) তুলনীয়।

১৭। যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

(১৭) যিনি আহারে-বিহারে মিতাচারী, কর্মে সংযত, যাঁর জাগরণ ও নিদ্রা উভয়ই সুনিয়ন্ত্রিত, তাঁরই যোগ সম্ভব। সেই যোগ দ্বারা সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়।

দেখা যাবে যে এখানে কর্ম থেকে একান্ত নিবৃত্তির উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না, কর্মকে সংযত করার কথা বলা হচ্ছে। অহং যখন আত্মে স্থিত হয় তখন সে তুরীয় ও সার্বিক চেতনা লাভ করে এবং সেই কেন্দ্র থেকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ণ যোগী।

১৮। যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥

(১৮) যখন সুনিয়ন্ত্রিত চিত্ত সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মাত্র আত্মতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাকে সমাহিত (যোগে) বলা যায়।

সত্যোপলব্ধির পক্ষে অহং জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি একান্ত প্রয়োজনীয়। সত্যকে জানতে হলে ব্যক্তিত্বের সমস্ত দাগকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, সকল প্রকার কুসংস্কার ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে লুপ্ত করতে হবে।

এই শ্লোকগুলিতে উপদেষ্টা যে পদ্ধতিতে সাধক সারভূত আত্মকে উপলব্ধি করতে পারে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। বাহ্য বা অন্তর্জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেহযুক্ত আত্ম প্রাপঞ্চিক বহুবিধায় নিমগ্ন এবং সেইজন্যই আবৃত থাকেন। কাজেই আমাদের প্রথমেই আত্মাকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ক্রিয়া, প্রত্যেক ধারণা, মনের প্রত্যেক স্বতন্ত্র ক্রিয়ার প্রত্যেক বিশেষ রূপকে বাদ দিয়ে শূন্য করতে হবে। এটা অবশ্য নঞর্থক প্রক্রিয়া। মনে হতে পারে আমাদের চেতনা থেকে প্রত্যেক ভাব বা ধারণাকে বহিষ্কার করলে, নির্ভেজাল সরল শূন্যতা অবশিষ্ট থাকবে। উপদেষ্টা এখানে দেখাচ্ছেন যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে হলে, বিশুদ্ধ আত্মকে উপলব্ধি করার জন্য এইপ্রকার নঞর্থক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। নিস্তব্ধতাকে পূর্ণাঙ্গ করা হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে নেতিমূলক কিন্তু আসলে সুতীব্র সজীব অতীন্দ্রিয় ধ্যান দ্বারা সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করা হয়, এতে আত্মিক শক্তির প্রসারণ ঘটে। এ অভিজ্ঞতা সকল জ্ঞানের অতীত, কেননা আত্মকে ধারণা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না বা মনের কাছে মূর্ত করা যায় না। এ হল অবর্ণনীয় আত্মমুখিতা।

১৯। যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যত চিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥

(১৯) সংযত চিত্ত যোগী যখন আত্মসংযোগ অভ্যাস করেন (বা নিজেকে সমাহিত করেন), তখন তিনি বায়ুশূন্য স্থানে অকম্পিত দীপশিখার সহিত তুলনীয়।

যোগীর ভাবনা আত্মতেই মগ্ন; আত্মিক অন্তর্দৃষ্টিই সকল মোহের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ এবং তার সঙ্গে ক্ষণিক দর্শন বা অপপ্রিয়মাণ দৃশ্যকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

২০। যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥

(২০) যাতে একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা চিত্ত শান্ত হয় এবং আত্মকে আত্মের মধ্য দিয়ে দেখে আত্মতৃপ্তি ঘটে···

২১। সুখমাত্যন্তিকং যৎতদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্‌।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ম্‌ স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

(২১) যাতে বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় পরমানন্দ পাওয়া যায়, যা পেলে আর সত্যভ্রষ্ট হয় না—

কঠোপনিষদের তৃতীয়, ১২ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে ধারণা করা যায় না, কিন্তু যুক্তি দিয়ে পৌঁছানো যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাত্তের ভিত্তিতে যে সকল ধারণা হয়, তাকে সম্বল করে যে যুক্তি সে যুক্তি দিয়ে তাঁকে ছোঁয়া যায় না, যে যুক্তি স্বাবলম্বী তারই ভিত্তিতে সেখানে পৌঁছানো যায়। যখন যুক্তি স্বাবলম্বী হয় তখন সে পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে বা তা থেকে সঞ্জাত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কোন বস্তু সম্বন্ধে সচেতন হয় না, নিজেকে বস্তুচেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে নেয়। সকল সত্যকার জানাই অভেদ দিয়ে জানা।[১] ভৌত সংস্পর্শ বা মানস প্রতীক দিয়ে আমরা যা জানি তা পরোক্ষ ও আসন্ন। ঈশ্বরের ধ্যানোপলব্ধিই ধর্ম।

২২। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(২২) যা পেলে মনে হয় যে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নেই, যেখানে পৌঁছলে অত্যন্ত গুরুতর দুঃখও বিচলিত করতে পারে না—

২৩। তং বিদ্যাদ্‌ দুঃখ সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥

(২৩) সেই সন্তাপ-বিহীনতাকেই যোগ বলে জানা যাক। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সোৎসাহ চিত্তে এই যোগাভ্যাস করতে হবে।

১০-১২ সংখ্যক শ্লোকে মোক্ষার্থে চিত্তকে বিষয়ের উপর তীব্রভাবে নিবদ্ধ

১। সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে।
মধুসূদন এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন।

করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই হল মুক্ত আত্মার বিশ্রাম, সর্বনিরপেক্ষ ও নিঃসঙ্গ। আত্মা আত্মতেই তৃপ্ত। এই হল সাংখ্যপুরুষের কৈবল্য, যদিও গীতাতে ভগবৎপ্রসাদের সঙ্গে এ অভিন্ন।

অনির্বিণ্ন চেতসা—নির্বেদরহিতেন চেতসা ইতি শঙ্কর। সম্ভাব্য সন্তাপের চিন্তাপ্রসূত প্রয়াসের শিথিলতাকে বর্জন করে আমাদের যোগাভ্যাস করতে হবে।

২৪। সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥

(২৪) ব্যতিক্রমবিহীন ভাবে (স্বার্থ) সঞ্জাত সকলপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করে, সব দিক দিয়ে সকল ইন্দ্রিয়কে চিত্ত দ্বারা বশ করে…

২৫। শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

(২৫) ধীর স্থির বুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে শান্ত হয়ে মনকে আত্মে নিবদ্ধ করে অন্য চিন্তা বর্জন করতে হবে।

২৬। যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদ্ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

(২৬) যা কিছু চঞ্চল ও অস্থির, মনকে বিপথে নিয়ে যায় তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সম্পূর্ণরূপে আত্মবশে আনতে হবে।

২৭। প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্ত রজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥

(২৭) কেননা যে যোগীর মন প্রশান্ত, ভাবাবেগ স্থির, যিনি অকলুষ ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, তিনিই পরম সুখপ্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মভূতম্—ঈশ্বরের সঙ্গে এক। আমরা যা দেখি তাই হয়ে যাই, ভ্রমর ও বোলতার উপাখ্যানের মর্ম তাই "ভ্রমর কীট ন্যায়"। বোলতা ভ্রমর দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনায় তার কথা এমন তীব্রভাবে চিন্তা করতে লাগল যে সে নিজেই ভ্রমরে রূপান্তরিত হল, উপাসকও সেইরকম উপাস্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়। শ্রীধরের ব্যাখ্যা, ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তম্।[1] দেহ, জীবন ও

১ নীলকণ্ঠের ধারণা এই অবস্থা "সংপ্রজ্ঞাত সমাধি" এবং তার সমর্থনে যোগভাষ্য উদ্ধার করেছেন,—যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থম্ প্রদ্যোতয়তি কর্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখী করোতি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে।

মনের বিশুদ্ধিই উন্নতি। কাঠামো ক্রুটিশূন্য হলে জ্যোতি অবাধে প্রকট হয়।

২৮। যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥

(২৮) পাপবিমুক্ত যোগী নিজেকে সর্বদা সমাহিত রেখে সহজেই চিরন্তনের সংস্পর্শে অনন্ত আনন্দ উপভোগ করেন।

ব্রহ্মসংস্পর্শং—শাশ্বতের সঙ্গে সংযোগ। ঈশ্বরকে শুধু একটা গুজবের উৎস বা অস্পষ্ট উচ্চাভিলাষের পাত্র বলে মনে করলে চলবে না। তাঁকে আমাদের সঙ্গে বাস্তবভাবে যুক্ত সুস্পষ্ট সত্তা বলে মনে রাখতে হবে। ধর্ম তর্কের বিষয় নয়, অভিজ্ঞতাজাত তথ্য। বুদ্ধি দ্বারা তথ্যের একটা যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় কিন্তু তথ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে যুক্তিতর্ক অবাস্তব হয়ে পড়ে।

তাছাড়া ধর্মীয় অভিজ্ঞতা দেশকালনির্বিশেষে বিশ্বজনীন। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে ও ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগে তাদের দেখা পাওয়া গেছে, তা থেকে মানবাত্মার প্রয়াস ও ঐক্যের স্থায়িত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ঋষি, সক্রেটিস ও প্লেটো, ফিলো ও প্লটিনাস, খ্রীষ্টিয় ও মুসলমান মিস্টিকরা যে প্রজ্ঞা অর্জন করেছিলেন তা একই গোত্রের যদিও তাদের ধর্ম-তত্ত্বীয় ব্যাখ্যার চেষ্টায় জাতি ও যুগের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

পরবর্তী শ্লোকসমূহে উপদেষ্টা আদর্শ যোগীর লক্ষণ সকল বিবৃত করছেন। তাঁর চিন্তা বশে আছে, বাসনা বর্জন করা হয়েছে, আর তিনি শুধু আত্মের ধ্যানেই নিমগ্ন ও সন্তাপসংস্পর্শবিহীন এবং পরমসত্তার সঙ্গে একীভূত।

২৯। সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

(২৯) যাঁর আত্মা যোগ দ্বারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, তিনি আত্মকে সর্বভূতে ও সর্বভূতকে আত্মের মধ্যে দর্শন করেন এবং সর্বত্র একই বস্তু দেখেন।

যদিও আত্মদর্শনের সাধনার সময় আমাদের বাহ্য বস্তু থেকে সরে গিয়ে জগৎকে আত্ম থেকে পৃথক করতে হয়েছিল, তবু দর্শন লাভ করার পর জগৎকে আত্মে আশ্রয় দিতে হয়। নৈতিক স্তরে এর অর্থ এই যে সংসার থেকে বিচ্ছিন্নতা বাড়বে এবং সেটাতে সিদ্ধ হলে প্রীতি, কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে সংসারে ফিরে আসতে হবে।

আশা-আশঙ্কা পছন্দ-অপছন্দ যুক্ত স্বতন্ত্র সসীম আত্মায় বোধ বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩০। যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

(৩০) যে আমাকে সর্বত্র দেখে এবং আমার মধ্যে সকলকে দেখে তার কাছে আমিও হারিয়ে যাই না, সেও আমার কাছে হারায় না।

"তার কাছে আমিও হারাই না, সেও আমার কাছে হারায় না" এই স্নেহ-পূর্ণ ও মর্মস্পর্শী কথাগুলির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক অতীন্দ্রিয়তার থেকে ব্যক্তিগত রহস্যের দিকেই ঝোঁক বেশী। সগুণ ঈশ্বরের মধ্যে সকল বস্তুর গভীর ঐক্যের অভিজ্ঞতাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। সে যতই অদ্বিতীয়, ততই সার্বিক। আত্মা যত গভীরে যাবে ততই তার বোধ প্রসারিত হবে। (যখন আমরা আমাদের অন্তর্দেবতার সঙ্গে একীভূত হব তখন সমস্ত জীবনধারার সঙ্গেই এক হয়ে যাব।

৩১। সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

(৩১) যে যোগী ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতে স্থিত আমাকে ভজনা করে, সে যেভাবেই কর্মে লিপ্ত হোক না কেন, আমাতেই বাস করে।

তার বাহ্যজীবন যাই হোক না কেন, অন্তর্জীবনে সে ভগবানেই অধিষ্ঠিত। মানুষের আসল জীবন তার অন্তর্জীবন।

৩২। আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

(৩২) হে অর্জুন, যে কি দুঃখে কি সুখে সকলকে সমভাবে নিজের মত করে দেখতে পায় সে পূর্ণ যোগী।

আত্ম—ঔপম্য মানে অন্য সকলকে নিজের সঙ্গে তুল্য করা। নিজের কল্যাণ কামনায় যোগী অন্যেরও কল্যাণ চান। ঈশ্বরের মধ্যেই তিনি সর্বভূতের স্পর্শলাভ করেন, মানুষকে দিব্যজীবনে আকৃষ্ট করেন এবং পরমাত্মার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রবুদ্ধ চেতনায় জগতে কর্ম করেন। তিনি কোন জীবেরই ক্ষতি করেন না কেননা শঙ্করের ভাষায় "তিনি দেখেন, যা তাঁর নিজের কাছে প্রিয়, তা সর্বভূতের পক্ষেই প্রিয় এবং যা তাঁর নিজের

পক্ষে কষ্টদায়ক তা অন্যেরও কষ্টের কারণ।"[১] তিনি কিন্তু দুঃখ-সুখকে আর এড়িয়ে চলেন না। জগতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, তিনি কিছুতেই ভয় পান না, আত্মদর্শনের সাম্যে সকলকেই আলিঙ্গন করেন।

মনকে সংযত করা দুরূহ কিন্তু সম্ভব।

অর্জুন উবাচ

৩৩। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥

(৩৩) অর্জুন বললেন "হে মধুসূদন (কৃষ্ণ), এই যে সাম্যের প্রকৃতিকে (মনের সমতা) তুমি যোগ বলে বর্ণনা করলে, চঞ্চলতার জন্য তার কোন স্থায়ী ভিত্তি তো দেখতে পাচ্ছি না।

৩৪। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

(৩৪) হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, উত্তেজনাপ্রবণ, প্রবল ও দুর্দম। আমার মতে মনকে বশে আনা বায়ুকে বশে আনার মতই দুরূহ।

শ্রীভগবান উবাচ

৩৫। অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

(৩৫) শ্রীভগবান বল্লেন, "হে মহাবাহো (অর্জুন), মন চঞ্চল বলে তাকে বশে আনা যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কুন্তীপুত্র, অবিরাম অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাও সম্ভব।

যোগসূত্রের প্রথম, ১২, "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তান্ নিরোধঃ" বাক্যটি তুলনীয়। এখানে উপদেষ্টা বলছেন যে চঞ্চল মন আবেগ দ্বারা চালিত হতে অভ্যস্ত, তাকে শুধু অনাসক্তি[২] ও অভ্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

১। যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্বপ্রাণিনাং সুখমনুকূলম্ যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমিষ্টং যথাতথা সর্বপ্রাণিনাং দুঃখমনিষ্টং......ন কস্যচিৎ প্রতিকূলম্ আচরতি অহিংসক ইত্যর্থ।

২। পৃথিবী যেখানে আছে সেখানে বিছানার প্রয়োজন কি? মাথায় দেবার জন্য বাহু

অর্জুন বুঝতে পেরেছেন যে মানুষের স্বভাব অনেকখানি একগুঁয়ে, হিংস্র, খেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারী। আমাদের স্বভাবের ত্রুটি সম্বন্ধে আমরা চোখ বুজে থাকতে চাই এবং প্রজ্ঞালাভে বিমুখ হই। সেখানে তপস্যা প্রয়োজন।

৩৬। অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

(৩৬) আত্মসংযম যার হয়নি তার পক্ষে যোগ কঠিন তা আমি মানি কিন্তু আত্মসংযতদের পক্ষে যথার্থ উপায়ে চেষ্টা দ্বারা তা সম্ভব।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, যারা চেষ্টা করে বিফল হয়েছে তাদের কি গতি? পরাজয় ক্ষণিকের। যে যাত্রা ঠিক মত শুরু করেছে সে লক্ষ্যে পৌঁছবে।

অর্জুন উবাচ

৩৭। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥

(৩৭) যোগে শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও যিনি আত্মসংযমে অপারগ হন এবং যোগ থেকে মন অন্যত্র বিচলিত হওয়ার জন্য সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হন, হে কৃষ্ণ, তাঁর কি গতি হয়?

যারা মৃত্যুকালে শাশ্বত শুভের বিরোধী না হলেও যথোচিত সংযম ও অভ্যাসের অভাবে নিত্যশুদ্ধের মহিমা উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত হয়, অর্জুন তাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাইছেন। কেউ কেউ যে বিশ্বাস করেন যে মানুষের ভবিষ্যৎ হয় অনন্ত স্বর্গ নয় অনন্ত নরক, তাই কি ঠিক না মরণোত্তরকালেও নিজেকে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর করার সুযোগ আসে?

৩৮। কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥

(৩৮) হে মহাবাহো (কৃষ্ণ), ব্রহ্মপথ থেকে মোহ দ্বারা চ্যুত ও উভয়ভ্রষ্ট হয়ে তিনি কি ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হন না?

যখন আছে তখন বালিশ কি দরকার? হাতের তালু যখন রয়েছে, তখন থালা বা পাত্র খাওয়ার জন্য ব্যবহার করি কেন? বায়ু ও বৃক্ষ বকল থাকাতে রেশম বস্ত্র চাই কেন?

সত্যাং ক্ষিতৌ কিংকশিপোঃ প্রয়াসৈঃ বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ।

ভাগবত, দ্বিতীয়, ২,৪।

উভয় থেকে চ্যুত হয়ে "ইতো ভ্রষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ," সে কি নিরাশ্রয় হয়ে থেকে যায়? ইহকাল পরকাল দুই-ই কি তার নষ্ট হয়? অত্যন্ত দুরূহ যোগের পথে যারা লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত না পৌঁছতে পারে, সেই অগণিত লোকেদের কি গতি হয়? তাদের সমস্ত সাধনা কি নিষ্ফল হয়? যে কার্যে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ নাও ঘটতে পারে, সে কাজ আরব্ধ করে লাভ আছে কি?

৩৯। এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥

(৩৯) হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে দূর কর। তুমি ছাড়া আর কেউ এই সংশয়ের মীমাংসা করতে পারবে না।

শ্রীভগবান উবাচ

৪০। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

(৪০) শ্রীভগবান বললেন, হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তাদের বিনাশ হয় না, কেননা হে বন্ধু, তুমি একথা জেনে রেখো যে কল্যাণ করে কারও দুর্গতি হয় না।

সৎজীবন যাপন করলে কারো ক্ষতি হয় না। ভাল লোকের মন্দ পরিণতি হতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের দুর্বলতা সব জানেন এবং তাদের জয় করার জন্য আমরা যে প্রয়াস করছি তাও তাঁর অজানা নয়। কাজেই আমাদের নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই, এ ব্যাপারে বিফলতাও এক ধরনের সফলতা, কোন আন্তরিক প্রয়াসই একেবারে নিষ্ফলা নয়। একহার্ট (Eckhart) বলেন, "তোমার অভিলাষে যদি বিচ্যুতি না থাকে, যদি শুধু তোমার সামর্থ্য যথেষ্ট না হয়, তা হলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুমি যথাসাধ্য করেছ।" গায়টের উক্তিও তুলনীয়: "যে পরিশ্রম করেছে ও প্রয়াস করেছে, তাকেই যেন আমরা উদ্ধার করতে পারি।"

৪১। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

(৪১) এরকম যোগভ্রষ্ট লোক পুণ্যবানদের অধ্যুষিত স্থানে বহু বৎসর বাস করার পর সৎ সমৃদ্ধ গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

শাশ্বতী—বহু বহু দিন, এখানে চিরকাল এই অর্থ নয়।

শুচীনাম্—সৎ। ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে শুচিতা বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে, এখানে আন্তরিক শুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে।[১]

৪২। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

(৪২) অথবা সে তত্ত্বজ্ঞানী যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারে। যদিও এরকম জন্ম ইহলোকে দুর্লভতর।

৪৩। তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥

(৪৩) হে কুরুনন্দন, সেখানে সে পূর্বজন্মে যে (মানসিক) উপলব্ধি (দিব্য সংযোগের) লাভ করেছিল তা আবার আয়ত্তে আসে এবং তাই দিয়ে (যাত্রারম্ভ করে) সযত্নে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে।

সিদ্ধিলাভে অগ্রগতি ধীরে হয় এবং সিদ্ধিলাভের পথে বহুজন্ম অতিবাহিত হতে পারে। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই নষ্ট হয় না। যে সকল সম্পর্ক আমরা গঠন করি এবং যে শক্তি আয়ত্ত করি তা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয় না। ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সেখান থেকেই শুরু হয়।

৪৪। পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥

(৪৪) পূর্বাভ্যাস দ্বারাই তার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এমন কি যোগজিজ্ঞাসুও বৈদিক বিধি অতিক্রম করে যায়।

শব্দব্রহ্ম—বৈদিক বিধি। বেদ ও তার অনুজ্ঞার কথা এখানে বলা হচ্ছে। বৈদিক আচরণবিধি অনুসরণ করে আমরা তাকে অতিক্রম করে যেতে সাহায্য পাই। এর সঙ্গে তুলনীয় "ব্রহ্ম দুই প্রকারের, এক শব্দব্রহ্ম আর এক তার অতীত যা। যখন লোকে শব্দব্রহ্মে অভিজ্ঞ হয়, তখন শব্দব্রহ্মাতীত ব্রহ্মে পৌঁছায়।"[২] তখন শ্রদ্ধা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, জিহ্বা স্তব্ধ হয় আর তত্ত্বকথা নিশ্চিহ্ন হয়। ধর্মগ্রন্থ পাঠে ও ধর্মানুষ্ঠানে

১। "শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তম্ বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা মৃজ্জলাভ্যাং
স্মৃতং বাহ্যম্, ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্।" মাধব পারাশরে উদ্ধৃত ব্যাঘ্রপাদ।

২। মৈত্রী উপনিষদ, ষষ্ঠী, ২২। বিষ্ণুপুরাণও তুলনীয় "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।" ষষ্ঠী, ৫।

অংশগ্রহণ করা থেকে ধর্মে উৎসাহ জন্মায়। এতে খানিকটা সুবিধা হয়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ যখন খুব বেশী ও একান্ত হয় তখন আর পরোক্ষ সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ বেদপাঠ এই পদ্ধতি দ্রুততর করার উপায়। কিন্তু একবার পর্যাপ্তভাবে উদ্বুদ্ধ হলে আর বাহ্য সমর্থনের প্রয়োজন হয় না, তখন আমরা শব্দব্রহ্ম বা আনুষ্ঠানিক অনুশাসনের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে যাই। নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার প্রয়োজন, "কিন্তু যে পৌঁছে গেছে, তার আর পৌঁছবার বিধি মানবার প্রয়োজন নেই।" মজ্ঝিম নিকায়, প্রথম, ১৩৫। রামানুজের মতে শব্দব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছে।

৪৫। প্রযত্নাদ্ যত মানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(৪৫) কিন্তু যোগী যত্নসহকারে সাধনা করে নিজেকে সর্বপ্রকার পাপবিমুক্ত করে বহুজন্ম ধরে উৎকর্ষ লাভ করতে করতে উচ্চতম লক্ষ্যে উপনীত হয়।

এ জীবনে দুর্বলতার জন্য সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হলেও তাঁর সাধনাজনিত শিক্ষা মৃত্যুর পরও তাঁর অধিকারে থেকে যায় এবং অপর জন্মে তাঁকে সিদ্ধি-লাভের দিকে অগ্রসর করে দেয়। যতদিন না সমস্ত মানুষ ক্ষমা, অনুতাপ ও সংশোধনী তপস্যা দ্বারা উদ্ধার পেয়ে ব্রহ্মসংযোগ লাভ করে ততদিন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। যে ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন তিনি সকল আত্মাকেই জয় করে গ্রহণ করবেন। ঈশ্বরের করুণা সব থেকে বিরোধী পক্ষকেও শেষ পর্যন্ত নিজের সঙ্গে সমন্বিত করে তুলবে। গীতায় সকলের উদ্ধারে বিশ্বাস রাখার আশার বাণী শুনতে পাই।

সর্বাঙ্গীণ যোগী।

৪৬। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥

(৪৬) তপস্বীর থেকে যোগী শ্রেষ্ঠ, সে জ্ঞানীর থেকে ও আনুষ্ঠানিক অর্চনাকারী কর্মীর থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। অতএব, হে অর্জুন, তুমিও যোগী হও।

এখানে যে উপদেশ পাচ্ছি, তাতে দেখছি বনচারী বহু উপবাস ও কৃচ্ছ্র-সাধনরত তপস্বী, মুমুক্ষু জ্ঞানমার্গ বিচরণকারী কর্মত্যাগী জ্ঞানী, ফললাভের

আশায় বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানকারী কর্মীর থেকে যোগী শ্রেষ্ঠ। তপ, জ্ঞান ও কর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগে তিনেরই উত্তম উপাদানগুলি আছে, তার সঙ্গে ভক্তি যোগ দিয়েছে। এরকম যোগী সকলের অন্তর্যামী দিব্যের চূড়ান্ত অর্চনায় নিজেকে ঢেলে দেন এবং তার জীবন দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত পথে আত্মভোলা সেবায় নিয়োজিত।

যোগ বা ভক্তির মাধ্যমে ভগবৎ-সংযোগ সর্বোচ্চ লক্ষ্য। পরবর্তী শ্লোকে দেখানো হয়েছে যে যোগীদের মধ্যেও ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এখানে জ্ঞান মানে শাস্ত্রপাণ্ডিত্য (শঙ্কর), আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নয়।

৪৭। যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(৪৭) এবং সমস্ত যোগীদের মধ্যে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে অন্তর দিয়ে আমাতে স্থিত হয়ে আমার অর্চনা করে, তাকেই আমি সব থেকে (যোগ দ্বারা আমার সঙ্গে) যুক্ত মনে করি।

যোগাভ্যাসের দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে, কি কি বাধা অতিক্রম করতে হবে তার হিসাব দিয়ে, উপদেষ্টা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মহাযোগী মহাভক্ত।

ইতি… … … … ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানযোগ নামে ষষ্ঠ অধ্যায়ের এইখানে শেষ।

সপ্তম অধ্যায়

ঈশ্বর ও জগৎ

ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ

শ্রীভগবান উবাচ

১। ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥

(১) শ্রীভগবান বললেন,

হে পার্থ, কি করে যোগাভ্যাস দ্বারা আমাতে চিত্ত বিন্যস্ত করে, আমাকেই আশ্রয় করে, তুমি আমাকে নিঃসংশয়ে সম্পূর্ণরূপে জানবে তাই এবার শোন।

গীতা-রচয়িতা এবারে দিব্যের সম্পূর্ণ বা অখণ্ড জ্ঞান দেবার ইচ্ছা করছেন। শুধু নির্গুণ পরমাত্মা রূপেই নয়, তাঁর জগতে যে সগুণ প্রকাশ তা সমেতই।

২। জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

(২) আমি তোমাকে এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা সম্পূর্ণভাবে বলব। তা জানলে আর জানার কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক শ্লোকের উপর টিকা দ্রষ্টব্য। জ্ঞানকে এখানে অপরোক্ষ আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর বিজ্ঞানকে দেখানো হয়েছে অস্তিত্বের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত বিদ্যারূপে। আমাদের শুধু নিঃসম্পর্ক পরমের কথা জানলেই চলবে না, তাঁর বহুধা অভিব্যক্তিকেও জানতে হবে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্ম আছেন, যদিও তারা তাঁকে সীমাবদ্ধ করে না।

৩। মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

(৩) হাজারে একটি লোক কখনও কখনও সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করেন এবং যে অল্পসংখ্যক লোক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে আবার অল্প লোকেই আমার স্বরূপ জানতে পারেন।

পাঠান্তর "যততাম্ চ সহস্রাণাম্"—"এবং সহস্র সাধকদের মধ্যে"।

অধিকাংশ লোক সিদ্ধিলাভের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন না। পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বা শাস্ত্রবাণীর আলোতে আমরা কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে চলি। যারা সত্যদর্শনের জন্য ও লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সাধনা করেন, তাদেরও অল্পই সফল হয়। যারা দৃষ্টিশক্তি পায়ও, তাদের মধ্যেও অল্প লোকই সেই দৃষ্টির সদ্ব্যবহার করে চলতে ও বাঁচতে চেষ্টা করে।

ঈশ্বরের দ্বৈত প্রকৃতি।

৪। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

(৪) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আমার প্রকৃতির আট বিভাগ।

প্রকৃতি—স্বভাব—একে শক্তি বা মায়া[১], বাস্তব জগতের ভিত্তি[২] বলা হয়।

অব্যক্ত স্বভাব, প্রকৃতি, যখন ব্যক্ত হয় তখন এই আট আকারে প্রকট হয়। প্রথম দিকে এইপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল পরে আরও বিস্তৃততর ব্যাখ্যায় চব্বিশরকম মূলতত্ত্বের কথা জানা যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রকৃতির নিম্নস্তরের জড়-প্রকৃতির বস্তু। কেননা বেদান্ত স্বীকৃত সাংখ্য মনোবিদ্যা অনুসারে তারা শুধু বিষয়ের সঙ্গে সংস্পর্শে আসে এবং যতক্ষণ না বিষয়ী আত্ম, পুরুষ, আলোকসম্পাত করেন ততক্ষণ চেতনা জন্মায় না। আত্মের আলোক-সম্পাতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াসকল জ্ঞানের পদ্ধতিতে পরিণত হয় এবং বিষয়সকল জ্ঞানের বিষয় হয়। অহংকার "বিষয়" পক্ষের ব্যাপার। অহং যে ভাব দ্বারা বিষয়ের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাই অহংকার। সে দেহ ও তৎসংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিজের গুণ বলে মনে করে। বিষয়ী আত্মার সঙ্গে দেহকে ভ্রান্তভাবে অভিন্ন কল্পনা করে, এবং "আমি" ও "আমার" এই বোধ জন্মায়।

৫। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

(৫) এই আমার নিকৃষ্ট প্রকৃতি। এর থেকে আমার অন্য আত্মারূপ

১। মায়াখ্যা পরমেশ্বরী শক্তিরনির্বচনীয় স্বভাবা ত্রিগুণাত্মিকা। মধুসূদন।
২। যদা প্রপঞ্চোপাদানভূত। নীলকণ্ঠ।

প্রকৃষ্ট প্রকৃতিকে জান, কেননা, হে মহাবাহো, সেই প্রকৃষ্ট প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করে থাকে।

ব্রহ্মই ঈশ্বর, জগতের সগুণ প্রভু। তাঁর মধ্যে চেতনাযুক্ত আত্মা (ক্ষেত্রজ্ঞ) এবং অচেতনপ্রকৃতি (ক্ষেত্র) আছে। ঐ দুইকে পরা বা প্রকৃষ্ট ভাব আর অপরা বা নিকৃষ্ট ভাব বলে ধরা হয়। তিনিই প্রত্যেক জীবের জীবন ও রূপ।[১] সার্বিক ঐশ্বরিক অস্তিত্বে তাঁর নিকৃষ্ট প্রকৃতি রূপে সমগ্র অচেতন আর তাঁর প্রকৃষ্ট প্রকৃতিতে সমগ্র সচেতন ভূত বিরাজমান। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মধ্যে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হলে অহং জন্মায় ও সেই অহং জড় সন্নিবেশকে নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করে। প্রাতিস্বিক মাত্রেরই দুই পক্ষ আছে, আত্মা ও তার প্রতিফলন, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র। এই হল ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি, তিনি অবশ্য এই দুইয়েরই ঊর্ধ্বে।[২] বাইবেলের পুরাণাংশে শূন্য থেকে সৃষ্টির কথা আছে। প্লেটো ও আরিস্টট্‌লের মতে আদিম জড়বস্তুকে ঈশ্বর রূপ দেন। ঈশ্বর সেখানে স্রষ্টা নন, মিস্ত্রী বা বড়জোর স্থপতিমাত্র, কেননা আদিম জড়কে শাশ্বত ও অজ বলে কল্পনা করা হয়েছে, কেবল তার রূপই ঈশ্বর সংকল্পিত। খ্রীষ্টীয় মনীষীদের মতে আগে থাকতে আছে এমন জড়বস্তু দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না, তিনি একেবারে শূন্য থেকেই সৃষ্টি করেন। বস্তু ও রূপ উভয়ই ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। এই শ্লোকেও ঐ ধরনের কথাই বলা হয়েছে। জীব ব্রহ্মের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র।[৩] ব্রহ্মের অবিভক্ত অখণ্ড সত্তা বহুবিধ আত্মায় বিভক্ত হয়ে দেখা দেয়।[৪] ঐক্যই সত্য এবং বহুবিধা তারই অভিব্যক্তি অতএব নিকৃষ্ট সত্য হলেও ভ্রান্তি নয়।

৬। এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

(৬) এই থেকেই সকলের উৎপত্তি এই জেনো। আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তি আবার প্রলয়।

১। বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মদাত্মভূতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণাং, প্রাণধারণ নিমিত্ত ভূতম। ইতি শঙ্করাচার্য।

২। ভাগবত তুলনীয়। পরমাত্মা তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের প্রভু সাক্ষী মহাত্মা, আত্মা ও সতত প্রজননশীল প্রকৃতির উৎস।

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে
পুরুষায়াত্মমূলায় মূল প্রকৃতয়ে নমঃ ॥ অষ্টম, ৩, ১৩।

৩। পঞ্চদশ, ৭ ৪। ত্রয়োদশ, ১৬।

জগৎ তার সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত[১], আবার প্রলয়ের সময় তাঁতেই বিলীন হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় দ্রষ্টব্য। ঈশ্বর নিজের মধ্যেই জগৎকে ধারণ করে আছেন, নিজে থেকেই তাকে প্রক্ষেপ করেন, আবার নিজের মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে নেন। নিজে মানে তার নিজ প্রকৃতি।

৭। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মযি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব ॥

(৭) হে ধনঞ্জয়, আমার থেকে উচ্চতর আর কেউ নেই। মালাতে যেমন মণিগণ সূত্রে গাঁথা থাকে, এ সকলই তেমনি আমাতেই গ্রথিত।

ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চতব ভাব আর কিছু নেই। তিনি সর্বময় ও সকলের কর্তা। পরমাত্মাকে আশ্রয় করেই জগতের অস্তিত্ব, যেমন সূত্র অবলম্বন করে মাল্যস্থ রত্ন।

৮। রসোঽহমপ্‌সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষম্ নৃষু ॥

(৮) হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), আমি জলে রসাস্বাদ, চন্দ্র-সূর্যে জ্যোতি, সর্ববেদে ওঙ্কার, আকাশে শব্দ ও নরে পৌরুষ রূপে বিরাজমান।

৯। পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥

(৯) আমি পৃথিবীতে পূত সৌরভ এবং অগ্নিতে ঔজ্জ্বল্য, সর্বভূতে আমি জীবন ও তপস্বীদের আমি তপ।

"তুমিই সত্য, দিব্যাত্ম, জড়ও নও, নির্জীবও নয়। তুমিই সকল বিশ্বের, সকল জীবের প্রাণ।"[২]

১০। বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥

১। চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩ সংখক শ্লোক তুলনীয়; মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম। মুণ্ডক উপনিষদে প্রথম, ১,৬ ও তৃতীয় ১,৩ ও দ্রষ্টব্য। অক্ষরং ভূতযোনিম্...পুরুষং ভূতযোনিম্। ব্রহ্মসূত্রে প্রথম, ৪, ৭ এ যোনিশ্চ গীয়তে।

২। ত্বং সত্যং দেব দেবাত্মং ন জড়ো ন মৃতোঽপি বা,
জগতাং জীবিতং চ ত্বং প্রাণিনাং জীবিতং তথা ॥

(১০) হে পার্থ, তুমি আমাকে সকল ভূতের সনাতন বীজ বলে জেনে রেখো। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, দীপ্যমানের দীপ্তি।

১১। বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥

(১১) আমি বলবানের বল এবং কামনা ও অনুরাগরহিত। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ (অর্জুন), ভূতসকলের মধ্যে আমি শাস্ত্রসম্মত কামনা।

কামরাগ—বাসনা ও অনুরাগ। শঙ্করাচার্য এই দুয়ের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য দেখিয়েছেন। কাম অনুপস্থিত বা দূর বিষয় সম্বন্ধে বাসনা[১] আর রাগ অধিগত বিষয় সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা।[২] বাসনামাত্রই অশুভ নয়। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাসনাকেই বর্জন করতে হবে। দিব্যমিলনাকাঙ্ক্ষা অন্যায় নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে কামনাকে মূলতঃ সত্য বলে বলা হয়েছে, যদিও তা অসত্য বা অনৃত দিয়ে ঢাকা থাকে। (অষ্টম, ৩) আমাদের কামনা ও কর্ম যদি আমাদের ভাবের প্রকাশ হয় এবং সত্য আধ্যাত্মিক অস্মিতাপ্রসূত হয়, তা হলে সে দিব্য সংকল্পেরই পবিত্র প্লাবন হয়ে দাঁড়ায়।

১২। যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥

(১২) তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সুসমন্বিত (সাত্ত্বিক), আবেগপূর্ণ (রাজসিক) বা অলস (তামসিক) জানবে সেসব মাত্র আমা থেকেই জাত। তাদের মধ্যে আমি নেই, তারাই আমাতে স্থিত।

প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সাংখ্যমতবাদ গীতা-রচয়িতা এখানে প্রত্যাখ্যান করছেন। তিনি বলছেন যে ত্রিগুণবিশিষ্ট কোন বস্তুই ঈশ্বরনিরপেক্ষ স্বয়ং-নির্ভর ভাব নয়; ঈশ্বর থেকেই সকলের উৎপত্তি। তিনি তাদের অধিকার ও ব্যাপ্ত করে আছেন, তারা তাঁকে অধিকার ও ব্যাপ্ত করে নেই। এই হল ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট ভূতেদের মধ্যে পার্থক্য। তারা ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু তাদের বিকার ঈশ্বরের অখণ্ডতাকে স্পর্শ করে না। তিনি কারুর অধীন নন; প্রত্যেক বস্তুই তাঁর অধীন।

১। কামঃ—তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু।
২। রাগঃ—রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু।

প্রকৃতির গুণ লোককে বিভ্রান্ত করে।

১৩। ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

(১৩) প্রকৃতির ত্রিগুণ সমন্বিত ভাব দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে এই সমগ্র জগৎ, ত্রিগুণাতীত ও অব্যয় আমাকে চিনতে পারে না।

শঙ্কর বলেছেন যে এখানে ব্রহ্ম ক্ষোভ করছেন যে জগৎ তাঁকে, পরমেশ্বরকে, চেনে না। তিনি স্বভাবতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত, সর্বভূতে নির্গুণ আত্ম। তাঁকে জানলে সংসারের সমস্ত অশুভের বীজ ভস্মীভূত হয়।[১]

আমরা সবিকার রূপগুলিকে দেখতে পাই কিন্তু যে শাশ্বত সনাতনের সেই রূপগুলি অভিব্যক্তি তাঁকে দেখতে পাই না। প্লেটোর গুহাবাসীরা যেমন দেওয়ালের উপর ছায়াগুলিকে শুধু দেখতে পেত, আমরাও সেইরূপ অনিত্য আকারগুলিকে দেখতে পাই। কিন্তু যে আলো থাকার জন্য ছায়াদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে, তাঁকে জানতে হবে।

১৪। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(১৪) আমার এই ত্রিগুণবিশিষ্ট মায়াকে বশ করা কঠিন। যারা মাত্র আমাকেই আশ্রয় করে থাকে, তারাই তাকে পার হতে পারবে।

দৈবী-অতিপ্রাকৃত[২] বা পরমেশ্বর সম্বন্ধীয়[৩]।

মায়ামেতাং তরন্তি[৪] — মায়াকে অতিক্রম করে যায়। যে মায়াময় জগৎ থেকে মোহের উৎপত্তি তাকে পার হয়ে যায়।

রামানুজ মায়াকে বিস্ময়কর ফলপ্রদায়িনী রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

১। এবম্ভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাবং সর্বভূতাত্মানং, নির্গুণং সংসার-দোষবীজপ্রদাহ কারণং, মাং নাভিজানাতি জগদিতি অনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান।

২। অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেতি। শ্রীধরাচার্য।

৩। দেবস্য জীবরূপেণ লীলয়া ক্রীড়তো মম সম্বন্ধিনীয়ং দৈবী। নীলকণ্ঠ।

৪। মায়াং সর্বভূতমোহিনীং তরন্তি, সংসারবন্ধনা, মুচ্যন্তে। শঙ্করাচার্য।

দুষ্কৃতকারীদের অবস্থা

১৫। ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

(১৫) মূর্খ, নরাধম, পাপাচারীরা মায়ার প্রভাবে জ্ঞানহারা হয়ে আসুরভাবাপন্ন হয়ে আমার আশ্রয় চায় না।

পাপাচারীরা ব্রহ্মকে পায় না কেননা তারা আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় না, অহং দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা তাদের স্থূল আবেগকে বশে আনার চেষ্টা করে না, তারা রজঃ ও তমঃ গুণের শিকার। আমরা যদি আমাদের রাজস ও তামস ভাবকে সত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, তাহলেই আমাদের কাজে সামঞ্জস্য আসে এবং তারা অজ্ঞান ও আবেগ দ্বারা চালিত না হয়ে বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়। ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পৌঁছবার আগে আমাদের সত্ত্বগুণ আশ্রয় করতে হবে। আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছবার আগে নৈতিক আচারে অভ্যস্ত হতে হবে। আধ্যাত্মিক স্তরে আমরা দ্বৈতভাব বর্জন করে অন্তর্যামীর জ্যোতি ও শক্তিদ্বারা কর্ম করি। তখন স্বার্থসাধনের জন্য বা ব্যক্তিগত দুঃখ বর্জন করার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হই না, দিব্যের যন্ত্র হিসাবে কাজ করি।

বিভিন্ন প্রকারের ভজনা।

১৬। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

(১৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), যে সদাচারীরা আমাকে ভজনা করে তাদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, সন্তপ্ত, জ্ঞানপিপাসু, অর্থলিপ্সু ও তত্ত্বজ্ঞানী।

সুকৃতিনঃ—সদাচারী। পূর্বজন্মের সদাচারের ফলে যারা উচ্চতর জীবনের জন্য অনুকূল।[১]

আর্ত, দুঃখসন্তপ্ত, ক্ষতিগ্রস্তরা এক শ্রেণী। যাদের ধনকাম (শঙ্কর) আছে, যারা তাদের ঐহিক অবস্থাকে উন্নত করতে চায়, তারা আর এক শ্রেণী। যারা ভক্ত ও সৎপথাবলম্বী এবং সত্যান্বেষী, তারা তৃতীয় শ্রেণীর, তারা ঠিক পথে চলেছে। চতুর্থ শ্রেণীতে যারা তত্ত্বজ্ঞানী, অর্থাৎ সত্যকে

১। পূর্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যা জনাঃ। শ্রীধর।

জেনেছে। রামানুজ জ্ঞান বলতে এক জন মাত্রকে ভক্তি বুঝেছেন, এক ভক্তি।

মহাভারতেও চার শ্রেণীর উপাসকদের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে তিন শ্রেণী ফলকামাঃ, অর্থাৎ ফল কামনা করে, আর সর্বশ্রেষ্ঠ হল যে একান্ত ভাবে ভজনা করে।[১] অন্যেরা বর চায় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী কিছুই চায় না, কিছু প্রত্যাখ্যানও করে না। সে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে যা পায় তাই গ্রহণ করে। ঈশ্বরোদ্দেশে নিষ্ফলা আত্মবিস্মৃত ভজনাই তাঁর ভঙ্গী।

১৭। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

(১৭) এদের মধ্যে যে সর্বদা দিব্য সংযোগ বজায় রাখে এবং ভজনায় একনিষ্ঠ সেই জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি তার অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেও আমার প্রিয়।

(যতদিন আমরা সাধক ততদিন আমরা দ্বৈতের জগতে আছি, কিন্তু সিদ্ধিলাভ করলে দ্বৈতভাব বিলুপ্ত হয়। সকলের মধ্যে যে এক আত্মা বিরাজিত, তত্ত্বজ্ঞানী তার সঙ্গেই নিজেকে মিলিয়ে দেন।)

১৮। উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥

(১৮) এরা সকলেই মহৎ কিন্তু আমার মতে তত্ত্বজ্ঞানী (আমার) আত্মস্বরূপ। সম্পূর্ণ সমাহিত চিত্ত হওয়ায় সে আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি জেনে আমাকেই আশ্রয় করে।

উদারাঃ সর্ব এবৈতে—এরা সকলেই মহৎ। আমরা মনোকষ্ট (আর্ত) দূর করার জন্য, ব্যবহারিক সুবিধার জন্য (অর্থার্থী), সন্দেহ নিরসনের জন্য (জিজ্ঞাসু) অথবা জ্ঞানলাভের জন্য (জ্ঞানী) প্রার্থনা করি। এ সবই ভাল কাজ। আমরা যদি ঐহিক সম্পদের জন্য প্রার্থনা করি, প্রার্থনাকে প্রথাগত কার্যসূচীতে পরিণত করি বা তাকে রক্ষাকবচ রূপে ব্যবহার করি, তাহলেও তা দিয়ে আমরা ধর্মভাবের অস্তিত্বকে স্বীকার

১। চতুর্বিধা মম জনা ভক্তা এবং হি মে শ্রুতম্
তেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠা যে চৈব নান্যদেবতাঃ। শান্তিপর্ব, ৩৪১, ৩৩।

করি। প্রার্থনা মানুষের ঈশ্বর-সন্নিধানে পৌঁছবার প্রয়াস। এতে ধরে নেওয়া হয় যে জগতে প্রার্থনা শোনার উপযুক্ত কেউ আছেন। আমরা যদি চাই, তাহলে আমাদের দেওয়া হবে। প্রার্থনা অভ্যাস করলে আমাদের চেতনা প্রদীপ্ত হয়, তাতে আমাদের নির্বোধ অহঙ্কার, আমাদের স্বার্থান্ধ লোভ, আমাদের ভয় ও প্রত্যাশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রার্থনা দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়ে এক অখণ্ড অস্মিতা গঠনে সহায়তা করে। ক্রমশঃ একথা আমরা বুঝতে পারি যে জীবনে সৌভাগ্যের জন্য বা পরীক্ষা পাস করার জন্য প্রার্থনা করা নিজেকে অবনত করা। তখন ঈশ্বরকে জানবাব জন্য এবং তার ভাবে ক্রমে অনুপ্রাণিত হবার জন্য প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হয়। প্রার্থনা জীবনের এক পন্থা। ধীরে ধীরে প্রার্থনা ঈশ্ববসান্নিধ্যের অভ্যাসে পরিণত হয়। তাই জ্ঞান, অখণ্ড পরাজ্ঞান, দিব্যজীবন। যে তত্ত্বজ্ঞানী ঈশ্বরকে স্বরূপে জানেন তিনি ঈশ্বরকে তাঁর নিজের জন্যই ভালবাসেন। তিনি দিব্যজীবন যাপন করেন। ঈশ্বব তাঁব কাছে প্রিয়, তিনিও ঈশ্বরের প্রিয়। প্রথম তিন শ্রেণীর উপাসক ঈশ্ববকে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা ঈশ্বরে আরব্ধ এবং তাঁর সঙ্কল্পসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকেন। কাজেই তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এবকম হতে পারে যে গভীর কষ্টেব সময়, সন্তাপহরণের জন্য আমরা এমনই একান্ত ও গভীর ভাবে প্রার্থনা করি। এরকম প্রার্থনা সফল হলে হয়ত ঈশ্বরের সংকল্প ব্যাহত হবে, কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার জন্য তা আমরা বুঝতে পাবি না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা আন্তরিক শুদ্ধি ও ঐকান্তিকতার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তারই পূরণ চান। "তোমার ইচ্ছা (আমার নয়) পূর্ণ হোক্ (Thy will, not mine, be done)।

১৯। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(১৯) বহু জন্ম পরে জ্ঞানী আমাকে আশ্রয় করে, বুঝতে পারে যে বাসুদেব (ব্রহ্ম)-ই সব। এরূপ মহাত্মা দুর্লভ।

বহূনাং জন্মনামন্তে—বহুজন্ম পরে। সত্যোপলব্ধি বহু যুগের ব্যাপার। বিবিধ জটিলতাযুক্ত অভিজ্ঞতার গভীবতম প্রদেশে না যেতে পারলে ফললাভ হয় না এবং তা সময়সাপেক্ষ। ঈশ্বর উদ্ভিদকে তার নিজ খেয়ালমত বাড়তে দেন। সাধারণ এক শিশু পূর্ণাঙ্গ হতে ন'মাস সময় নেয়, আধ্যাত্মিক

পূর্ণাঙ্গতার জন্য আরও বেশী সময় লাগবে। স্বভাবের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ।

বাসুদেবঃ সর্বম্—বাসুদেবই সব। সকলের মধ্যে যে জীবন আছে, বাসুদেব তার স্বামী।[১] দ্বৈত স্বভাবের জন্য ঈশ্বরই সব।

রামানুজ এর ব্যাখ্যা করেছেন, "বাসুদেবই আমার সর্বস্ব।" দাস্য-ভাবাপন্ন বিশ্বাসী ভক্ত ঈশ্বরের যে অবিনশ্বর মহিমা অনুভব করে, এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে। তিনিই সব, আমরা কিছু নই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকলে, অন্য সকল বস্তুর মত মানুষেরও অস্তিত্ব থাকে না। আমরা প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে বলি তিনিই সব। এ হল ঈশ্বর সম্বন্ধে দাস্যভাব যাতে তাঁকেই সব এবং তিনিই একমাত্র ভব বলে জানা হয়।

"বসুদেব সকলের নিমিত্ত।" মধ্বাচার্য।

অন্য প্রকারের প্রার্থনা ও অনুনয়ও মূল্যহীন নয়। তাতেও ফল পাওয়া যায়।

সহিষ্ণুতা।

২০। কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং-তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

(২০) কিন্তু যাদের মন কামনা দ্বারা বিকৃত হয় তারা অন্য দেবতা আশ্রয় করে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিবিধ অনুষ্ঠানে রত হয়।

২১। যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

(২১) ভক্ত যে রূপকেই নিষ্ঠার সঙ্গে ভজনা করতে ইচ্ছা করেন, আমি তাতেই তার শ্রদ্ধাকে অচলা করে দিই।

পরমেশ্বর সকলের ভক্তিই অনুমোদন করেন এবং যে যে বর চায় তাই মঞ্জুর করেন। আত্মা তার সাধনায় যতখানি নিজেকে তুলতে পেরেছে, ভগবানও ততখানি নীচু হয়ে তাকে কোল দেন। গভীর ধ্যানী গৌতম বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্যের মত তত্ত্বদর্শীরাও দেবতাদের জনপ্রিয় আনুগত্যকে

১। বসতি সর্বস্মিন্নিতি বাসুঃ, তস্য দেবাঃ।

অস্বীকার করেন নি। পরমেশ্বরের অনির্বচনীয়তা এবং তাঁর প্রকট হবার অসংখ্য সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। প্রত্যেক তলের মাটিই তার গভীরতা থেকে উৎপন্ন, যেমন প্রত্যেক ছায়াই তার প্রকৃতির প্রতিফলন। তাছাড়া, সকলপ্রকার অর্চনায়ই উন্নত করে। যাকেই ভক্তি করি না কেন, ভক্তি যদি ঐকান্তিক হয়, তাহ'লে অগ্রগতি সহজ হবে।

২২। স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

(২২) শ্রদ্ধা দ্বারা যে দেবতার পূজা করে, ভক্ত তাঁর কাছেই তার কাম্য বস্তু লাভ করে, যদিও তা আমার বিধান অনুসারেই ঘটে থাকে।

সকল দেবতাই একই ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তাঁদের পূজা ব্রহ্মেরই পূজা, এবং তিনিই একমাত্র ফলদাতা।[১]

২৩। অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

(২৩) কিন্তু এই সব অল্পবুদ্ধি লোক যে ফললাভ করে, তা অনিত্য। অন্য দেবতাদের ভক্তেরা তাদের কাছেই যায়, কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার কাছেই আসতে পায়।

যেহেতু ইন্দ্রিয়াতীত গুণাতীত দিব্যের ধারণা সহজ নয়, সেই হেতু আমরা সর্বেশ্বরের বিভিন্ন মূর্তির আশ্রয় নিয়ে তারই অর্চনা করি। যে ফল কামনা করে এইরূপ পূজা করি তাই পাই, কেননা সর্বেশ্বর আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ধারণাকেও স্নেহ ও ধৈর্যের সহিত গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং যে স্তরের প্রার্থনা সেই স্তরেই বর দেন। কোন ভক্তিই মূল্যহীন নয়। নিরক্ষর ভক্তও ক্রমশঃ দিব্যের মধ্যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ খুঁজবে এবং সেই পর্যন্ত নিজেকে উন্নত করবে। যে অতীন্দ্রিয় গুণাতীত ঐশী ভাব সকল দেবতায় ব্যাপ্ত অথচ তাঁদের উর্ধ্বে, তাঁকে অর্চনা করার মত যে সাধক উন্নত হয়, সে সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় ও তাতেই সিদ্ধ হয়। সে অবস্থা, অস্তিত্বে অখণ্ড, জ্ঞানে উৎকৃষ্ট, প্রেমে পরম এবং সংকল্পে সম্পূর্ণ।

১। সর্বাপি দেবতা মমৈব মূর্তয়ঃ, তদারাধনমপি বস্তুতো মমারাধনমেব, তৎ তৎ ফলদাতাপি চাহমেব। শ্রীধর।

আর সকল গতিই আংশিক ও সীমাবদ্ধ এবং উন্মেষের নিম্নতর স্তরেই সার্থক।

অজ্ঞতার শক্তি।

২৪। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥

(২৪) নির্বোধ লোক অব্যক্ত আমাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে, তারা আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতিযুক্ত অব্যয় পরম ভাবকে জানে না।

নিরাকারকে আকার আরোপ করি নিজেদের ক্রটির জন্য। চরম সত্তার ধ্যান থেকে বিমুখ হয়ে আমরা কল্পনাপ্রসূত আকারের দিকে মনোনিবেশ করি। এক অব্যক্ত সনাতন ছাড়া সব দেবতাই তাঁর উপর আরোপিত রূপ। ঈশ্বর বহুর মধ্যে এক নয়। তিনি সর্বদা পরিবর্তনশীল বহুর পশ্চাতে এক, তিনি সকল আকারের উর্ধ্বে, অন্তহীন সচলতার তিনি নির্বিকার কেন্দ্র।

২৫। নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

(২৫) আমার সৃজনীশক্তি (যোগমায়া) দ্বারা আচ্ছন্ন আমি সকলের কাছে উন্মোচিত হই না। মূঢ় জগৎ অজ অব্যয় আমাকে চেনে না।

যোগ—শঙ্করের মতে ত্রিগুণের সমন্বয়, মধুসূদনের মতে সংকল্প।

ব্রহ্ম শুধু যে জগতেই আছেন তা নয় তার উর্ধ্বেও আছেন। এটা-ওটা সসীম আকারকে তিনি বলে আমরা ভুল করি। ভাগবতে আছে "হে প্রভো, সর্বব্যাপী পরমাত্মা, যোগেশ্বর, যিনি ত্রিলোকে আছেন, তোমার রহস্য কে ভেদ করতে পারে? তুমি কোথায়, কখন, কি ভাবে এবং কত রূপে লীলা করছ তা কে জানে?"[১] মাত্র শুদ্ধ সত্তাই অব্যক্ত আর সবই প্রকট জগৎভুক্ত।

২৬। বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥

(২৬) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল ভূতগণকে আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেউ চেনে না।

১। কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥

২৭। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

(২৭) হে ভারত, ইচ্ছা ও দ্বেষ সম্ভূত দ্বন্দ্ব দ্বারা জন্মসময়ে সকল ভূতই মোহাচ্ছন্ন হয়, হে শত্রুজয়ী (অর্জুন)।

জ্ঞাতব্য।

২৮। যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

(২৮) পুণ্য কর্ম দ্বারা যে সব লোকের পাপ নিঃশেষ হয়েছে, (যারা পাপের কাছে মৃত), তারা দ্বন্দ্ব মোহ মুক্ত হয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আমার ভজনা করে।

কোন বিধিবহির্ভূত বা অপ্রচল কার্য করলেই পাপ হয় না। (সর্বপ্রকার সীমাবদ্ধতা, অজ্ঞতা, অন্যের ক্ষতি করে নিজের ব্যক্তিগত লাভের অভিলাষ, ক্ষুদ্র অহংয়ের স্বাতন্ত্র্য দাবী, এই সকলের মূল উৎসই পাপ।) এই পাপ বর্জন করলে, এই অজ্ঞতাকে জয় করলে, আমাদের জীবন সকলের মধ্যে একের সেবায় নিয়োজিত হয়। তাতে ভক্তি গভীর হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে, শেষে সর্বত্র একই পরমাত্মাকে দেখতে অভ্যস্ত হই। এই হল জীবন্মৃত্যু থেকে মুক্ত শাশ্বত জীবন। তুকারাম বলেছেন—

আমার আত্মা এখন মরে গেছে,
তার জায়গায় তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছ।
হাঁ, আমি তুকা ঘোষণা করছি,
যে "আমাকে" বা "আমার" আর বাকী নেই।[১]

২৯। জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥

(২৯) যে আমার আশ্রয় নিয়ে জরামরণ থেকে মুক্তি চায় সে ব্রহ্ম (বা পরম)-কে সম্পূর্ণভাবে জানে ও অধ্যাত্ম ও কর্মের কথাও (জানে)।

অধ্যাত্মম্—প্রাতিস্বিক আত্মার অন্তর্নিহিত সত্তা।[২]

১। Macnicol—Psalms of the Maratha Saints (মারাঠা সন্তদের সঙ্গীত (১৯১৯) ৭৯ পৃঃ

২। প্রত্যগাত্ম বিষয়বস্তু। শঙ্কর।

৩০। সাধিভূতাধি দৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্ত চেতসঃ॥

(৩০) যারা আমাকে সর্ব ঐহিক ও দৈব ভাবের এবং সকল যজ্ঞের নিয়ন্তা বলে জানে তারা মরণকালেও সমাহিত চিত্তে আমার জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকে।

মৃত্যুকালে আমাদের তর্কসাপেক্ষ মতবাদ স্মরণ করতে বলা হচ্ছে না, তাঁর সকল ভাবকে স্মরণ করতে, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে ও তাঁকেই ভজনা করতে বলা হচ্ছে।

এখানে কতকগুলি নূতন পদ ব্যবহার করা হয়েছে। এবং পরবর্তী অধ্যায়ে অর্জুন তাদের ব্যাখ্যা জানতে চাইবেন। ব্রহ্মকে শুধু সর্বেশ্বর রূপে জানলেই চলবে না, তাঁর সকল প্রাকৃতিক প্রকাশে, বিষয়ী ও বিষয়-ভাবে, কর্ম ও যজ্ঞ-তত্ত্বে জানতে হবে। গীতার উপদেষ্টা পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে সেই কথা বিবৃত করছেন।

ইতি জ্ঞান বিজ্ঞান যোগে নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়ের এইখানে শেষ।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডীয় অভিব্যক্তির ধারা

অর্জুনের প্রশ্ন।

অর্জুন উবাচ

১। কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥

(১) অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রহ্ম (বা পরম) কি?, অধ্যাত্মই বা কি, কর্মই বা কি? হে পুরুষোত্তম, অধিভূত ও অধিদৈব কাকে বলে?

আত্মে (অধ্যাত্মম্) কি আছে? দেবতাদের (অধিদৈবম্) মধ্যেই বা কি আছে? যজ্ঞে (অধিযজ্ঞম্) কি আছে? এবং সকল সৃষ্ট বস্তুতেই (অধিভূতম্) বা কি আছে? এর উত্তর হল যে পরমাত্মাই সকল সৃষ্ট পদার্থে, সকল যজ্ঞে, সকল দেবতায়, সকল কর্মে পরিব্যাপ্ত। এগুলি ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ।[১]

২। অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥

(২) হে মধুসূদন (কৃষ্ণ), এই দেহে যজ্ঞের ক্ষেত্র (অংশ) কি এবং কি ভাবে আছে? এ জগৎ থেকে প্রয়াণের সময় সংযতাত্মারা তোমাকে কি করে চিনবেন?

পরমার্থ অভিলাষীদের মৃত্যুকালে তুমি কিভাবে দেখা দাও?

কৃষ্ণের উত্তর।

শ্রীভগবান উবাচ

৩। অক্ষরং ব্রহ্মপরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥

(৩) ব্রহ্ম (বা পরম) অবিনাশী ও সর্বেশ্বর (সবার উপরে)। সারভূত

১। মমৈব রূপান্তরাণি—অভিনব গুপ্ত।

প্রকৃতিই অধ্যাত্ম। যে সৃজনীশক্তি দ্বারা ভূতেদের উৎপত্তি হয় তাকেই কর্ম বলে।

স্বভাব—ব্রহ্মের জীবরূপ। পঞ্চদশ অধ্যায়, ৭।[১]

অধ্যাত্ম—দেহী, ভোক্তা।[২] প্রাতিস্বিক আত্মা রূপ দিব্যদশা।

যে অব্যয় স্বয়ংভবের মধ্যে সকল জীবের গতি ও অস্তিত্ব তাই ব্রহ্ম। অধ্যাত্ম মানুষ ও প্রকৃতির ভাব। যে সৃজনের আবেগে নানা রূপের জীব উদ্ভূত হয় তাই কর্ম। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তিকেই কর্ম বলে। সর্বেশ্বরই এই কর্মের কর্মী এবং প্রাতিস্বিক জীবের তাতে অংশ না গ্রহণ করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বিষয়ী ও বিষয়ের সকল দ্বৈতভাবের উর্ধ্বে যে নির্বিকার বিদ্যমান, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডর দিক থেকে দেখলে নিত্যবিষয়ী, অধ্যাত্ম। তার বিপরীত দিকে সকল রূপের আধার, বিকারধর্মী নিত্যবিষয় প্রকৃতি। কর্ম সৃজনীশক্তি, সচলতার ভাব। এসব কিন্তু অদ্বৈত সর্বেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, পরস্পর স্বতন্ত্র নয়। ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ী বিষয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া রূপ মূল নকশা বিষয়ী ও বিষয় ভেদের অতীত পরমাত্মা, ব্রহ্মেরই প্রকাশ।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে আছে যে যদিও পরম অনির্বচনীয় ও নির্গুণ[৩], জীবের ভগবান জগদীশ্বর অন্তর্যামী আত্মা।[৪] ভাব স্বরূপ ঈশ্বর ও ঈশ্বর, পরম ও সগুণ ভগবান, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের প্রভেদ উপনিষদে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সগুণ ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডাতীত সত্তা।

৪। অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর!॥

(৪) সর্বভূতের মূল বিকারী প্রকৃতি, দৈবী উপাদানের মূল বিশ্বজনীন ভাব। এবং হে দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (অর্জুন), দেহে সকল যজ্ঞের মূল আমি।

এখানে আবার গীতা-রচয়িতা ভগবানের সকল দিকের অখণ্ড জ্ঞান

১। স্বস্থ এব ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেন ভবনং স্বভাবঃ। শ্রীধর।

২। স এব আত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্তমানোঽধ্যাত্ম শব্দেন উচ্যতে। শ্রীধর।

৩। অদৃষ্টম্, অব্যবহার্যম্, অগ্রাহ্যম্, অলক্ষণম্, অচিন্ত্যম্, অব্যপদেশ্যম্, একাত্মপ্রত্যয়-সারম্, প্রপঞ্চোপশমম্, শান্তম্ শিবম্, অদ্বৈতম্। ৭

৪। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ, এষোঽন্তর্যামী যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। ৬

দেবার চেষ্টা করছেন। অক্ষয় অব্যয় দিব্য ব্রহ্ম আছেন, সগুণ ঈশ্বর আছেন ভক্তির পাত্ররূপে, ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা দেবতাত্মা হিরণ্যগর্ভ আছেন আর আছে প্রাতিস্বিক জীবাত্মা যে দিব্যের প্রকৃষ্ট ভাবেরও অংশীদার আবার বিকারী প্রকৃতিরও অংশ। সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থ ও পরবর্তী শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুক্ষণে আত্মার সাধনোচিতধামে প্রয়াণ।

৫। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

(৫) মৃত্যুকালে যে আমাকেই মাত্র স্মরণ করে দেহত্যাগ করে সে নিঃসংশয়ে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়ের ৩০ সংখ্যক শ্লোকে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছিল, এখানে আবার সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করা হচ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের, তৃতীয়, ১৪, ১ ও প্রশ্ন উপনিষদেব তৃতীয়, ১০-এ মৃত্যুকালে মনের অবস্থাব গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জীবিত অবস্থায় যদি ঈশ্বরভক্তি থাকে তবেই আমরা শেষ মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করতে পারব।

৬। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

(৬) হে কুন্তীনন্দন (অর্জুন). মুমূর্ষু (অন্তিমের) যে অবস্থার কথা দেহত্যাগের সময় ভাবে, সেই ভাবে ভাবিত হয়ে সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

সদা তদ্ভাবভাবিতঃ—সর্বদা তারই চিন্তায় মগ্ন।

অন্তিমক্ষণের আকস্মিক খেয়াল দ্বারা নয়, সমগ্র জীবনের নিষ্ঠার সহিত আচরিত সাধনার দ্বারাই ভবিতব্য নির্ধারিত হয়।

তদ্ভাবভাবিত :—শব্দার্থে সেই ভাবে ভাবিত অর্থাৎ হতে বাধ্য।

শেষ মুহূর্তে মন যাতে নিবদ্ধ থাকে আত্মা সেইখানেই যায়। আমরা যা ভাবি তাই হই। আমাদের অতীত চিন্তা দ্বারা বর্তমান জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার বর্তমান জীবনের চিন্তা দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্ম নির্ধারিত হবে।

৭। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥

(৭) অতএব সব সময়ে আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর। তোমার মন ও বুদ্ধি যদি আমাতে লগ্ন থাকে, তবে তুমি নিঃসংশয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

সর্বেষু কালেষু—সর্বদা—তবেই আমরা সেই সঙ্কটময় শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরকে স্মরণে আনতে পারব। শ্রীধর।

মামনুস্মর যুধ্য—আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর। এখানে ইহলোকে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে না, কেননা সেখানকার যুদ্ধের উপলক্ষ সব সময়ে থাকে না। অশুভের সঙ্গেই অবিরাম যুদ্ধ চালাতে হয়।

শাশ্বত অব্যয় ঈশ্বরের সম্বন্ধে সচেতন থেকে আমাদের ইহজগতে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। "নর্তকী যেমন নানা সুর-তালগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাচবার সময়েও মস্তকস্থিত জলপাত্রের দিকে মন নিবদ্ধ রাখে তেমনি সত্যকার সাত্ত্বিক লোক নানা বিষয়ে লিপ্ত থাকলেও পরমেশ্বরের পাদপদ্ম থেকে অভিনিবেশ কখনও সরায় না।" যে ঈশ্বর আমাদের জীবনকে বেষ্টন করে, ভেদ করে ও সার্থক করে রেখেছেন তাঁর কাছেই আমাদের সকল কর্ম সমর্পণ করা চাই। ভগবানকে স্মরণ করলেই সকল কর্ম শুদ্ধ হয়। "অচ্যুতকে নমঃ। তাঁর কথা চিন্তা করে বা তাঁর নাম করলে সকলপ্রকার তপস্যা, যজ্ঞ ও ক্রিয়ার ত্রুটি দূর হয়।"[২]

৮। অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

(৮) হে পার্থ (অর্জুন) যে অভ্যাস যোগ দ্বারা চেতনাকে প্রস্তুত করে অনন্যমনে পরমপুরুষের ধ্যান করে, সে পরম দিব্যপুরুষের ধামে পৌঁছায়।

মরণকালে অনুতপ্ত হলেই পরিত্রাণ নেই। ব্রহ্মে অবিচলিত নিষ্ঠার অবিরাম অভ্যাস প্রয়োজন।

৯। কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

(৯) যে সর্বদ্রষ্টা, প্রাচীন, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের

১। পুষ্পানুপুষ্প বিষয়ানুপসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্
সঙ্গীত-বাদ্য-লয় তাল বশং গতাপি
মৌলিস্থ কুম্ভ পরিরক্ষণ ধীর্ণটীব ॥

২। যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতং ॥

ধারক, অচিন্ত্যাকার, তমোনাশক আদিত্যবর্ণ পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয়, ১৮ সংখক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কবি—দ্রষ্টা, এখানে সর্বজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত।[১]

এখানে নির্লিপ্ত, নির্বিকার পরমের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে না। এ সগুণ, সর্বদ্রষ্টা, স্রষ্টা জগদীশ্বর। তিনি অন্ধকারের বিরোধী আলোক।[২]

১০। প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম্॥

(১০) যে মৃত্যুকালে স্থিরচিত্তে, ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবল দ্বারা ভ্রূমধ্যে প্রাণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে এইরকম করে, সে পরম দিব্যপুরুষ প্রাপ্ত হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এরকম ব্যবস্থা যাঁরা যোগবলে ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি অর্জন করেছেন, তাঁদের পক্ষেই সম্ভব।[৩]

১১। যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥

(১১) যে অবস্থাকে বেদজ্ঞরা অবিনশ্বর বলেন, নিস্পৃহ যতিরা যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং যে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তারা ব্রহ্মচর্য পালন করে, তা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলি।

কঠ উপনিষদের দ্বিতীয়, ১৫ দ্রষ্টব্য। "সমস্ত বেদ যে শব্দ উচ্চারণ করে, যা সকল তপস্যায় ঘোষিত হয়, যা পাবার বাসনায় মানুষ ব্রহ্মচারীর জীবন বরণ করে, সেই শব্দ অল্প কথায় তোমাকে বর্ণনা করব।" ধার্মিকগণ তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোক বলে বিবেচনা করেন "সর্বোচ্চ বিষ্ণুলোক" "বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।"

১২। সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥

(১২) দেহের সর্বদ্বারকে সংযত করে, মনকে হৃদয়ে আবদ্ধ করে, মস্তিষ্কে প্রাণকে স্থাপনা করে, যোগারাধনায় অধিষ্ঠিত হয়ে—

১। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্বজ্ঞম্। শঙ্কর।

২। প্রকাশরূপত্বেন তমোবিরোধিনম্। মধুসূদন।

৩। যোগেনান্তেতনুত্যজাম্। কালিদাস: রঘুবংশ, প্রথম, ৮।

দেহকে নবদ্বারবিশিষ্ট জনপদ বলা হয়। পঞ্চম, ১৩। হৃদয়ে মনকে আবদ্ধ করা মানে মনের ক্রিয়া বন্ধ করা। যোগশাস্ত্রে বলে, যে আত্মা হৃদয় থেকে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে শিরস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে যায় এবং ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হয়, সে-ই ব্রহ্মে লীন হয়।

১৩। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

(১৩) একাক্ষর ব্রহ্ম শব্দ ওঁ উচ্চারণ করে আমাকে স্মরণ করে যে দেহত্যাগ করে, সে পরমগতি লাভ করে।

ওঙ্কার অবর্ণনীয় পরমব্রহ্মের দ্যোতক।

মামনুস্মরন্—আমাকে স্মরণ করে। যোগসূত্র অনুসারে ঈশ্বরারাধনার দ্বারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করা যায়।[১]

১৪। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(১৪) যে অনন্যচিত্তে আমাকে সর্বদা স্মরণ করে, এইরকম সর্বদা সংযত (যা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত) যোগী আমাকে সহজেই পায়।

১৫। মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

(১৫) আমাকে প্রাপ্ত হলে মহাত্মারা আর দুঃখের আধার অনিত্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, কেননা তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করেছে।

নবম অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকের উপর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

১৬। আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(১৬) ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে তার নীচের সকল লোকেরই বাসিন্দারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে কিন্তু হে কৌন্তেয় (অর্জুন) আমাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

সমস্ত জগৎই পরিবর্তনশীল।[২]

১। সমাধি সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ।

২। পুনরাবর্তিনঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ। শঙ্করাচার্য।

১৭। সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেঽহোরাত্র বিদো জনাঃ॥

(১৭) সহস্র যুগ ধরে ব্রহ্মার এক দিন, আর সহস্র যুগ ধরে (ব্রহ্মার) রাত্রি একথা যে জানে, তাকেই অহোরাত্রবিদ বলে।

যে কালে ব্রহ্মাণ্ড প্রকট থাকে তাকে দিন বলে, আর যে সময়ে ব্রহ্মাণ্ড অপ্রকট থাকে তাকে রাত্রি বলে। এ দুয়ের স্থিতিকাল সমান ও পরিবর্তী।

১৮। অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাঽব্যক্তসংজ্ঞকে॥

(১৮) দিনে সকল বস্তু অব্যক্ত অবস্থা থেকে প্রকট হয়, রাত্রি সমাগমে তারা আবার অব্যক্তে বিলীন হয়।

এখানে অব্যক্ত অর্থে প্রকৃতি।

১৯। ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

(১৯) হে পার্থ (অর্জুন), এই সকল বহুবিধ সত্তা (ভূত) পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করার পর রাত্রিসমাগমে অসহায়ভাবে লুপ্ত হয় আবার দিনারম্ভে ভূতরূপে নির্গত হয়।

ভূতগণের পুনরাবৃত্ত জন্ম ও লয়ে সর্ব ভূতেশ্বরের উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

২০। পরস্তস্মাৎতু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥

(২০) কিন্তু এই অব্যক্তরও পারে এক সনাতন অব্যক্ত সত্তা আছে যিনি সর্বভূত বিনষ্ট হলেও নষ্ট হন না।

এই ব্রহ্মাণ্ডাতীত অব্যক্তই সকল পরিবর্তনের মধ্যে নিত্য ও নির্বিকার। অব্যক্তকে সময় সময় দুই প্রকারে বিবেচনা করা হয়। প্রথম, যে অব্যক্ততে বদ্ধ ভূতেরা লীন হয় আর দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডাতীত অব্যক্ত, যাকে সাধারণ মনের অগম্য শুদ্ধতত্ত্ব বলা হয়, যাতে মুক্ত আত্মারা লয়প্রাপ্ত হয়। সকল অনিত্য জাগতিক জীবই চিরবহমান দিনরাত্রির ছন্দের অধীন। এই জাগতিক প্রক্রিয়ায় অতীত পরম অব্যক্ত ব্রহ্মই সর্বোচ্চ লক্ষ্য। যে সেখানে পৌঁছায়, সে আর দিনরাত্রির বশ হয় না।

২১। অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

(২১) এই অব্যক্তকে অবিনশ্বর বলে, তাঁকেই পরমাগতিও বলে। যাঁরা তাঁকে প্রাপ্ত হন তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। সেই আমার পরম ধাম।

আমরা জন্মমৃত্যুচক্র বা ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ (প্রভব) ও অপ্রকাশ (প্রলয়) থেকে নিস্তার পেতে পারি। প্রকট ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, অবর্ণনীয় পরম পদ প্রাপ্ত হতে হলে আমাদের সমগ্র সত্তা সর্বেশ্বরকে উৎসর্গ করতে হবে। ব্রহ্মাণ্ডাতীত অব্যক্ত সনাতনকে ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের সমগ্র চিন্ময় সত্তাকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করলে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করি। সগুণ ঈশ্বরের পরম ধামই পরব্রহ্ম বা পরম। অষ্টম অধ্যায়ের ২ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২২। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥

(২২) হে পার্থ (অর্জুন), এই সেই পরম পুরুষ, যাতে সর্বভূত বাস করে, এবং যে সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত। তাঁকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়।

দুই পন্থা।

২৩। যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিংচৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥

(২৩) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), যে কালে যোগীরা গিয়ে আর ফেরে না, আর যে কালে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তা এইবার তোমাকে বলি।

২৪। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥

(২৪) ব্রহ্মবিদ লোক অগ্নি, আলো, দিন, শুক্লপক্ষ ও (সূর্যের) উত্তরায়ণের ছয় মাসের মধ্যে প্রয়াণ করলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

২৫। ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥

(২৫) ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও (সূর্যের) দক্ষিণায়নের ছয় মাসে প্রয়াণ করলে যোগী চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

আমাদের মৃত পিতৃপুরুষরা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন বলে কথিত আছে এবং তাঁরা যতদিন না পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন ততদিন সেইখানেই থাকেন।

২৬। শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াঽবর্ততে পুনঃ ॥

(২৬) আলো ও অন্ধকারকেই জগতের চিরন্তন পথ বলে বিবেচনা করা হয়। প্রথম পথে গেলে আর ফেরে না, দ্বিতীয় পথে গেলে আবার ফিরে আসে।

জীবনটা আলো ও আঁধারের সংঘর্ষ। প্রথম দ্বারা মোক্ষ আর দ্বিতীয় পথে পুনর্জন্ম। এখানে জন্মমৃত্যু, স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে এক প্রাচীন বিশ্বাস দিয়ে গীতা-রচয়িতা এক আধ্যাত্মিক সত্যকে বোঝাতে চেয়েছেন। যারা অজ্ঞতার অন্ধকার রাত্রিতে পথভ্রষ্ট হয় তারা পিতৃলোকের পথে গিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করে, আর যারা জ্ঞানালোকময় দিবসে বাস করে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে তারা জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে।

২৭। নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাঽর্জুন ॥

(২৭) হে পার্থ (অর্জুন), যে যোগীরা এই পথগুলি জানে সে কখন মোহগ্রস্ত হয় না। অতএব হে অর্জুন, সর্বদা যোগযুক্ত থাক।

যে কাজেই তুমি প্রবৃত্ত হও, শাশ্বতের চিন্তা পরিত্যাগ কোরো না।

২৮। বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসুচৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥

(২৮) এই সব জেনে যোগী বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, দান প্রভৃতি অতিক্রম করে পরম ও আদ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও দানাদি দ্বারা যে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা নিম্নস্তরের। যে যোগী চরম লক্ষ্যে যেতে চান তিনি এই সব স্তর অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে গমন করেন।

ইতি········অক্ষরব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অক্ষরব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায়ের এইখানেই শেষ।

নবম অধ্যায়

ঈশ্বর সৃষ্টির চেয়ে মহৎ

রাজরহস্য

শ্রীভগবান উবাচ

১। ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥

(১) শ্রীভগবান বললেন,

তুমি পরশ্রীকাতর নও, তোমাকে আমি গুহ্যতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলছি, যা জানলে তুমি সর্বপ্রকার অশুভ থেকে মুক্তি পাবে।

বিজ্ঞানসহিতম্-অনুভবযুক্তম্ (শঙ্করাচার্য)। আমরা অবশ্য জ্ঞানকে পারমার্থিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে নানা বিদ্যার সমষ্টি বলে বিবেচনা করব। প্রথমটি অধিবিদ্যক সত্য আর দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বিদ্যা। আমাদের সামনে সত্য? লাভের এই দুই বিভিন্ন অথচ পরস্পরের পরিপূরক উপায় আছে, একটি সজ্ঞার বা অপরোক্ষ উপলব্ধির পথ অপরটি মানবমনের ধীশক্তির প্রসারণজনিত পথ। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয়ই চাই, প্রকৃত সত্যের মধ্যেও প্রবেশ করা চাই আবার বস্তুপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অধিকার চাই। (দার্শনিকরা প্রমাণ করেছেন যে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁদের প্রজ্ঞা পরোক্ষ; ঋষিরা ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁদের আত্মার গভীরে অনুভব করেছেন, তাঁদের এই উপলব্ধি অপরোক্ষ[১]) তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক শ্লোক ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥

(২) এই রাজবিদ্যা, রাজকীয়ভাবে গোপন, পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ, ধর্মীয়, অভ্যাসে সহজ ও অবিনশ্বর।

রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যম্ শব্দার্থে রাজকীয় বিদ্যা ও রাজকীয় ভাবে গোপনীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্ত কথা।

১। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ পরোক্ষং জ্ঞানমেবতৎ
অহম্ (বা অস্মি) ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ অপরোক্ষং তদুচ্যতে।

প্রত্যক্ষাবগমম্—এ তর্কের বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা একে প্রমাণ করতে হয়। এ জ্ঞান পরিচয় দ্বারা পাওয়া যায়, বর্ণনা দ্বারা, লোকমুখে শুনে বা অন্যের প্রতিবেদন দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সত্য নিজ জ্যোতিতে ভাস্বর, আবরণ উন্মোচনসাপেক্ষে আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার অপেক্ষায় আছে। ব্রহ্মকে নিজের উন্মেষিত ও শুদ্ধীকৃত স্বজ্ঞা দ্বারা নিজের আত্মস্বরূপ বলে জানতে হয়।[১] "প্রতিবোধ-বিদিতম্" কথাটি তুলনীয়।

৩। অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

(৩) হে শত্রুজয়ী (অর্জুন), যাদের এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তারা আমাকে পায় না ও মরজগতে (সংসারে) আবার ফিরে আসে।

সর্বমূলাধার ব্রহ্মের সঙ্গে ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণকে অভিন্ন জানাই সার্বভৌম জ্ঞান। এই জ্ঞানে যদি অবতারের পূজা করি তবেই চরম জ্যোতি আমাদের সামনে উদিত হবে। পরমের প্রত্যক্ষ চিন্তন কঠিনতর। অর্জুন শ্রদ্ধাবান বলে তাঁকে এই গুহ্যতত্ত্ব শেখানো হল। শ্রদ্ধাহীনেরা এ জ্ঞান স্বীকার না করে মোক্ষলাভে বঞ্চিত হয় ও পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। মোক্ষদায়ী জ্ঞানের সত্যতা ও তা লাভ করতে মানুষ যে সক্ষম এই কথায় বিশ্বাসই আসল শ্রদ্ধা। দিব্য মোক্ষলাভের প্রথম সোপান আমাদের মধ্যে যে ঐশী শক্তি আছে, যা আমাদের অস্তিত্বকে ধারণ করে আছে ও আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করাচ্ছে, তাতে বিশ্বাস। সেই অন্তর্যামীর কাছে যখন আমরা নিজেদের সমর্পণ করি, তখন যোগাভ্যাস সহজ হয়ে আসে।

অবতার রূপ পরম সত্য।

৪। ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

(৪) আমার অপ্রকট মূর্তি দ্বারা আমি সমস্ত বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত করে আছি। সকল ভূত আমাতে বিরাজমান, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নেই।

সপ্তম অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১। ন শাস্ত্রৈর্নাপি গুরুণা দৃশ্যতে পরমেশ্বরঃ
দৃশ্যতে স্বাত্মনৈবাত্মা স্বয়া সত্ত্বস্থয়া ধিয়া। যোগবাশিষ্ঠ, ষষ্ঠ, ১১৮, ৪।

সর্বাতীত ঈশ্বরত্ব থেকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানাবিধ আকারের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায় না বা তারা তাঁর যথাযথ ধারণাও দিতে পারে না। দেশকালবশ বস্তু সমূহের আকারের বহু ঊর্ধ্বে তাঁর পরম সত্তা।

৫। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

(৫) (অথচ) ভূতেরা আমাতে বাস করে না, এই আমার ঐশী রহস্য। আমার আত্মা সর্বভূতের উৎপাদক ও ধারক কিন্তু তাদের মধ্যে বাস করে না।

যোগমৈশ্বরম্—ঐশী রহস্য। পরমেশ্বর থেকে সসীম প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে ঐশী শক্তির আশ্রয় নিতে হয়। (ব্রহ্ম সমস্ত প্রপঞ্চের উৎস কিন্তু তারা তাঁকে স্পর্শ করে না। এই হল ঐশী শক্তির রহস্য।) যদিও তিনি সকল অস্তিত্বের স্রষ্টা, তবু তিনি তাদের এত ঊর্ধ্বে যে তিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান এ কথাও বলতে পারি না। যথাযথভাবে বলতে গেলে ঈশ্বরের সর্বব্যাপ্তিতার ধারণাও গ্রাহ্য নয়। তাঁর দ্বৈত প্রকৃতি থেকেই সর্বভূতের উৎপত্তি কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকৃতি আত্মনের সহিত প্রকৃতির ক্রিয়ার সম্পর্ক নেই, তাই এও সত্য যে ভূতেরাও তাঁর মধ্যে বাস করে না, তিনিও তাঁদের মধ্যে থাকেন না। তারা এক অথচ স্বতন্ত্র।

"জীব বা দেহী আত্ম দেহকে ধারণ ও পালন করে অহঙ্কার দ্বারা তার সঙ্গে লিপ্ত থাকে। কিন্তু আমি জীবেদের মত নয়, আমি সর্বভূতকে ধারণ ও পালন করেও তাদের মধ্যে থাকি না কেননা আমি অহঙ্কার রহিত।" শ্রীধর।

যে জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরের মাধ্যমে সিদ্ধ এবং ঈশ্বর যার পশ্চাতে ঊর্ধ্বে ও সম্মুখে আছেন, গীতা তাকে অস্বীকার করে না। জগৎ না থাকলেও তাঁর কিছু ন্যূনতা ঘটে না যদিও জগৎকে তাঁর মাধ্যমেই পাওয়া যায়। জগতের নিজের মধ্যে বিশিষ্ট অস্তিত্ব নেই, এইখানে ঈশ্বরের সঙ্গে তার প্রভেদ। এই জন্যই তার পরম সত্তা নেই, যা আছে তা সসীম। যে সর্বেশ্বরবাদ অনুযায়ী সকল বস্তুই ঈশ্বর, গীতা-রচয়িতা তাকে তত্তটা আমল দেননি, তিনি যে মতবাদ গ্রহণ করেছেন তার কথা এই যে সকল বস্তুই ঈশ্বরে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডীয় প্রক্রিয়া পরমের সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়। এই জগৎ যদিও

ঈশ্বরের সজীব প্রকাশ, তবু কোন সসীম প্রক্রিয়াই পরমকে চরম ও পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

৬। যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্‌।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥

(৬) সর্বত্রগামী মহান্‌ বায়ু যেমন আকাশে সর্বদা বিরাজমান, তেমনি সর্বভূত আমার মধ্যে বিরাজমান এই কথা জানবে।

। আকাশ সকলেরই আশ্রয় কিন্তু আকাশকে কেহই স্পর্শ করতে পারে না। উপদেষ্টা এখানে উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। আকাশই আসল সার্বিক সত্তা, সর্বব্যাপ্ত অসীম পশ্চাৎপট, যার উপরে বায়বীয় ঘটনা ঘটে, অথচ তার প্রকৃতি স্থির ও অব্যয়। অসীম আত্মও সেইরূপ এক, বহু নয়। যদিও সে অব্যয় সত্তা, তবু সে সকল জঙ্গমের ধারক। কিন্তু কোন জঙ্গম সত্তা তাকে ধারণ করতে পারে না, যদিও তারা আত্মের উপর চরমভাবে নির্ভরশীল। অথচ আত্ম বহুকে ধারণ করে আছে। বায়ু আকাশে আছে, কিন্তু বায়ু আকাশ নয় এবং উভয়তেই আছে এমন সাধারণ কিছু নেই। এই রকম অর্থেই আমরা বলতে পারি যে সর্বভূত ঈশ্বরে আছে।

মধ্ব পরে ঈশ্বরের সর্বাতীতত্বের যে ধারণা ব্যাখ্যা করেন তা এইখানে আছে। এমন কি রামানুজের মতেও বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ, কিন্তু এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর যদিও বস্তু সকলের অস্তিত্বের কারণ, তিনি তাদের মধ্যে নেই। তারা যে আছে সে তাঁর অত্যাশ্চর্য শক্তির জন্য। তিনি সমস্ত বিশ্বের এমন সম্পূর্ণভাবে অতীত যে তিনি সমস্ত ঐহিক বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন এবং "সমগ্রভাবে অপর" বলে তাদের বিপরীত। এ একটা গভীর ধর্মীয় মজ্ঞার বর্ণনা।

৭। সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্‌ ॥

(৭) হে কুন্তীনন্দন (অর্জুন), সর্বভূত কল্পান্তে আমার নিজস্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং (পরবর্তী) কল্পারম্ভে তাদের আবার আমি সৃষ্টি করি।

৮। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥

(৮) আমার নিজ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আমি এই সকল ভূতবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। তারা প্রকৃতির বশ বলে অসহায়।

অব্যক্ত প্রকৃতি অব্যক্ত পুরুষ যারা প্রতিভাত হয়ে বিভিন্ন স্তরের বাস্তব

বিশ্বজগতের উৎপাদন করে। প্রাকৃতিক বীজ দ্বারাই উন্মেষের পর্যায় ও স্বভাব নির্ধারিত হয়। কেবল দিব্যপুরুষ তাকে ধারণ করা চাই।

অহং কর্মবিধির অধীন কাজেই বিশ্বজাগতিক জীবনে দেহধারণ করতে অসহায় ভাবে বাধ্য হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর "আত্মমায়া"য় জন্মগ্রহণ করেন। মানবাত্মার স্বীয় কর্ম আয়ত্তে নয়। তারা প্রকৃতির বশ, কিন্তু ব্রহ্ম প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অজ্ঞতাবশতঃ অসহায় ভাবে প্রকৃতি দ্বারা চালিত হন না। উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্টির কারণ মায়া। ঐশী দেহধারণে যোগমায়া, আত্মমায়া, সর্বেশ্বরের জ্যোতি ও আনন্দ দ্বারা পূর্ণ ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকৃতি। মানবিক দেহধারণের কারণ অবিদ্যা মায়া। মনুষ্যাত্মা অজ্ঞতায় জড়িত ও প্রকৃতির বশ বলে নিজ কর্মে অসহায়ভাবে বদ্ধ।

৯। নচ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥

(৯) হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), এই সব কর্ম আমাকে বাঁধতেও পারে না, কেননা আমি ঐ কর্মে উদাসীন ও অনাসক্তবৎ বসে থাকি।

যদিও ব্রহ্ম সৃষ্টি ও প্রলয়কে তাদের সারতত্ত্ব ও চালকরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন, তবু তিনি তাদের সঙ্গে লিপ্ত নন, কেননা তিনি বিশ্বজাগতিক ঘটনা পরম্পরার অতীত। প্রাকৃতিক ক্রিয়াও তাঁর অধিকারে। সেই অর্থে তিনিও তাঁর মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছেন বলে বিবেচনা করা যায় কিন্তু তাঁর ব্রহ্মাণ্ডাতীত দিক দিয়ে তিনি বিশ্বজাগতিক বস্তু ও ঘটনাপরম্পরার চেয়ে বেশী। অতএব ঈশ্বর বিশ্বক্রীড়ায় অশ্রান্তভাবে নিযুক্ত অথচ বিশ্বজগতের ঊর্ধ্বে ও তার বিধি থেকে মুক্ত। পুরুষ থেকে প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাণ্ডচক্র তাকে বাঁধতে পারে না। অগণিত প্রাতিস্বিক সত্তা জন্মায়, বাড়ে, প্রয়াস করে, কষ্ট পায়, মরে যায় আবার জন্মায় কিন্তু আত্মপুরুষ সর্বদা মুক্ত। তারা তাদের কর্মফল ভোগ করে এবং পূর্ব কর্ম দ্বারা বদ্ধ থাকে কিন্তু তিনি নিত্যমুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের ঊষাকালে অভিব্যক্তির সূত্রপাত আর ব্রহ্মাণ্ডের রাত্রিতে তার অন্ত।

১০। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে॥

(১০) আমার অধীনে প্রকৃতি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুর উৎপাদন করে এবং হে কুন্তীপুত্র, এইভাবে জগৎ আবর্তিত হয়।

কৃষ্ণকে এখানে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরমাত্মা রূপে দেখানো হয়েছে, যিনি সর্বভূতকে ধারণ করেন অথচ সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার থাকেন। আনন্দগিরির উপদেশ, সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রশ্ন না তোলাই ভাল। "ব্রহ্ম নিজ তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি করেছেন, একথা বলা চলে না, কেননা তাঁর আবার অতৃপ্তি কোথায়? তিনি তো শুদ্ধচিৎ, সাক্ষ্য মাত্র। আবার অন্য কেউ ভোক্তাও নেই কেননা আর কোন চেতন সত্তা নেই……সৃষ্টি মোক্ষার্থ সাধনের জন্য এ কথাও বলা যায় না, কেননা তা মোক্ষপ্রতিকূল। কাজেই সমস্যা বা তার সমাধান কোনটাই সম্ভাব্য নয় এবং তার কোন দরকারই নেই কেননা সৃষ্টি তো ঈশ্বরের মায়াপ্রসূত।" ঋগ্বেদে আছে: "কে তার প্রত্যক্ষ ভাবে ধারণা করতে পারে, এবং কে বলবে কোথা থেকে এবং কেনই বা এই বহুবিধ সৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন হয়েছে?"[১]

পরমেশ্বরের অর্চনায় মহৎ ফল পাওয়া যায়, তার থেকে নিম্নতর অর্চনার ফলও নিকৃষ্ট।

১১। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

(১১) মোহাচ্ছন্নরা নরদেহধারী আমাকে অশ্রদ্ধা করে, আমার প্রকৃষ্ট ভাবে আমিই যে সর্বভূতের অধীশ্বর তা তারা বুঝতে পারে না।

আমরা বাহ্য নরদেহটাই দেখতে পাই, তার অন্তরালে যে দিব্য বিভূতি আছে তা বুঝি না। আমরা বাহিরের চেহারাটাই দেখি, অন্তর্নিহিত সত্য আমাদের চোখে পড়ে না। ঈশ্বরকে তার পার্থিব ছদ্মবেশে চিনতে পারার জন্য সাধনার প্রয়োজন। প্রাপঞ্চিক প্রকৃতির সীমাকে লঙ্ঘন করে যতক্ষণ না আমাদের সমস্ত সত্তাকে নিত্যের দিকে উন্মুখ করব এবং যে মহত্তর চেতনায় আমরা ঐশী স্থিতি লাভ করব, তা যতক্ষণ না পুনরুদ্ধার করতে পারছি, ততক্ষণ আমরা সীমাবদ্ধ মোহের শিকার হব।

প্রতিমাপূজা ঈশ্বরলাভের উপায় রূপে ব্যবহার করতে হবে, নাহলে তা দোষের। ভাগবতে ভগবানের মুখে বলানো হয়েছে: "আমি সর্বভূতে আত্মা-

---

১। কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচাৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। দশম, ১২৯, ৬; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়, ৮, ৯।

রূপে বিরাজমান, তবু আমার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে মরলোক মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়।[১]

১২। মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীংশ্রিতাঃ ॥

(১২) রাক্ষস ও অসুরদের মোহিনী প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে তাদের আশা, কর্ম ও জ্ঞান সবই বিফল হয় ও বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

রাক্ষসীম্—যারা নিষ্ঠুর কর্মে ব্যাপৃত ও তমোগুণপ্রধান।

আসুরীম্—পৈশাচিক। রজোগুণপ্রধান এবং উচ্চাভিলাষী, লোভী ইত্যাদি। শ্রীধরাচার্য।

তারা প্রকৃতির প্রবঞ্চনায় (মোহিনী প্রকৃতি) ভুলে অনিত্য জগতে রত থাকে এবং অন্তর্নিহিত সত্যকে বিস্মৃত হয়।

১৩। মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

(১৩) হে পার্থ, মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে (আমাকে) সকল ভূতের অব্যয় উৎস জেনে অনন্যমনে আমার অর্চনা করে।

"মোহিনী প্রকৃতি"র সঙ্গে "দৈবী প্রকৃতি"র বৈপরীত্য দেখানো হচ্ছে। আসুরিক ভাবাপন্ন হলে আমরা স্বতন্ত্র অহং জ্ঞান নিয়ে বাস করি এবং তাকেই আমাদের কর্মকেন্দ্র করে তুলি, আর সেই জন্য নিষ্ফল সংসারচক্রে হারিয়ে গিয়ে আমাদের সত্য পরিণতি থেকে ভ্রষ্ট হই। অপর দিকে দিব্য ভাবাপন্ন হলে, আমাদের সত্যকার আত্মচেতনায় উন্মুক্ত হই, আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ঈশ্বরমুখী হয় এবং আমাদের সমগ্র জীবন সর্বেশ্বরের অবিরাম ভজনায় অতিবাহিত হয়। ঈশ্বরকে জানবার ও তাকে জীবনে উপলব্ধি করার সাধনা সিদ্ধ হয় ও আমরা নিবেদনের ভাবে কর্ম করে যাই।

১৪। সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

(১৪) সর্বদা আমার গুণকীর্তন করে নিষ্ঠার সঙ্গে দৃঢ়ব্রত নিয়ে, যোগসমাহিত চিত্তে ভক্তির সঙ্গে তাঁরা আমার বন্দনা করে।

১। অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা অবস্থিতঃ সদা
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতে অর্চাবিড়ম্বনম্। তৃতীয়, ২৯, ২১।

জ্ঞাত্বা (ত্রয়োদশ শ্লোকের), ভক্ত্যা……নিত্যযুক্তাঃ—এই শব্দগুলির অর্থ এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করতে হলে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় প্রয়োজন।

১৫। জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥

(১৫) অন্যেরা আবার জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করে এবং এক, পৃথক্‌, বহুধা ও সর্বতোমুখী রূপে আমাকে জেনে আমার অর্চনা করে।

শঙ্করের মতে এখানে তিন শ্রেণীর সাধকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১] রামানুজ ও মধ্বাচার্যের মতে মাত্র একশ্রেণীর সাধকের কথাই বলা হয়েছে। টিলকের মতে অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত এই তিন রকমের কথা এখানে রয়েছে।

ব্রহ্ম সব দিকে আমাদের সম্মুখে রয়েছেন, তিনি সর্বভূতের সঙ্গে এক আবার পৃথক, এইভাবেই মানুষ তাঁর পূজা করে।

১৬। অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্‌।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্‌।

(১৬) আমিই ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আমিই যজ্ঞ, আমিই পিতৃপুরুষের তর্পণ, আমিই ওষধি, আমি (পূত) মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই আহুতি।

ঔষধ মানে এখানে সর্বভূতের খাদ্য।[২] বৈদিক যজ্ঞ, আমাদের সমগ্র প্রকৃতির নিবেদন এই অর্থে ব্যবহৃত, বিশ্বাত্মার কাছে চরম আত্মোৎসর্গ। তাঁর কাছে যা পেয়েছি তাই তাঁকে প্রত্যর্পণ করি। দান ও সমর্পণ উভয়ই তাঁর।

১৭। পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌ সাম যজুরেব চ ॥

(১৭) আমি জগতের পিতা, মাতা, ধারক ও পিতামহ। আমিই জ্ঞাতব্য, পাবন, ওঙ্কার ও আমিই ঋক্‌, সাম ও যজুর্বেদ।

১। নীলকণ্ঠ বলেন "একত্বেন অহমেব ভগবান বাসুদেব ইতি অভেদেনোপনিষদাঃ, পৃথকত্বেন অয়মীশ্বরো মম স্বামীতি কৃষ্ণা প্রাকৃতাঃ, অন্যে পুনর্বহুধা বহুপ্রকারং বিশ্বতোমুখম্‌ সর্বৈর্দেবৈর্যৎ কিঞ্চিদ্দৃষ্টং তদ্ভগবৎ স্বরূপমেব, যচ্ছ্রুতং তৎতান্‌ নাম্নৈব……যদ্ভুক্তং ভুক্তং বা, তত্তাদ্‌ অর্পিতমেবেতি এবং বিশ্বতোমুখং যথাস্যাৎ তথা মামুপাসতে।

২। ঔষধং সর্বপ্রাণিভির্যদ অদ্যতে তদৌষধশব্দ বাচ্যম। শঙ্করাচার্য।

১৮। গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

(১৮) (আমি) চরম লক্ষ্য, পালক, প্রভু, সাক্ষী, ধাম, শরণ ও বন্ধু। (আমি) উৎপত্তিমূল ও প্রলয়, ভূমি, বিশ্রামালয় ও অবিনশ্বর বীজ।

"আমি বুদ্ধের শরণ নিচ্ছি। তিনিই আমার আশ্রয়।"[১] এই কথা কয়টি তুলনীয়।

১৯। তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥

(১৯) আমি উত্তাপ দিই, আমি বৃষ্টি দিই ও বন্ধ করি। আমি অমৃত ও আমিই মৃত্যু। হে অর্জুন, আমি সৎ ও অসৎ।

ঋগ্বেদের কথা স্মরণীয়—"যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ" সৎ মানে পরম সত্তা আর অসৎ মানে জাগতিক সত্তা এবং সর্বেশ্বর উভয়ই। যখন প্রকট তখন তিনি সৎ আর জগৎ যখন অব্যক্ত তখন তিনি অসৎ।[২] রামানুজের মতে সৎ মানে বর্তমান জন্ম আর অসৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ জন্ম।

আসল কথা আমরা যে আকারেই পরমেশ্বরকে ভজনা করি, তিনি সেই ভাবেই আমাদের বর দেন।[৩]

২০। ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি
দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

(২০) সোপায়ী ত্রিবেদজ্ঞেরা আমাকে যজ্ঞদ্বারা পূজা করে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে যাবার প্রার্থনা করে। তারা ইন্দ্র (স্বর্গের অধীশ্বর) লোক প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে দেবভোগ্য উপভোগ করে।

২১। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

(২১) তারপর বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে আবার

১। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি এষ মে শরণম্।
২। কার্যকারণে বা সদসতী। শঙ্করাচার্য
৩। অতস্তেষাং বিশ্বতোমুখম্ মদ্ভজনং কুর্বতাম্, সর্বরূপেণাহমনুগ্রহং করোমীতি ভাবঃ। নীলকণ্ঠ।

মর্ত্যে (ফিরে) আসে। এইভাবে ত্রিবেদের বিধানানুযায়ী চলে ভোগকামীগণ বিকারী বস্তু (জন্মমৃত্যুর অধীন) লাভ করে।

এখানে গীতার উপদেষ্টা বৈদিক অনুশাসনানুসারে অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করলে মরণান্তরে স্বর্গসুখ লাভ করা যায় বলে যে কথা বেদে আছে তার উল্লেখ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে সেই বস্তুকে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলা যায় না। এরকম লোক কর্মবিধি দ্বারা বদ্ধ কেননা তারা বাসনাচালিত (কামকামাঃ) এবং তাদের জাগতিক প্রক্রিয়া আবার অংশ নিতে হবে যেহেতু তারা অহং জ্ঞান দ্বারা কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাদের মোহ বিনষ্ট হয় নি। (আমরা যদি স্বর্গলাভ রূপ ফলাকাঙ্ক্ষী হই, তো সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কিন্তু যত দিন না জীবনের সত্য লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি তত দিন পুনঃ পুনঃ মরজীবনে ফিরে আসতে হবে। মনুষ্য জীবন ত্রুটিপূর্ণ বস্তু থেকে আত্মায় দিব্যভাবের উন্মেষের সুযোগ। আমাদের অহংকেন্দ্রিক চেতনা দিয়েই কাজ আরম্ভ করি, ঐহিক ভোগই চাই বা ভবিষ্যৎ স্বর্গপ্রাপ্তিই চাই।

২২। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(২২) কিন্তু যারা একমাত্র আমার কথাই চিন্তা করে আমাকে ভজনা করে এবং তাতেই সর্বদা প্রবৃত্ত থাকে তাদের আমি যা তাদের নেই তা দিই এবং যা তাদের আছে তা নিরাপদ করি।[১]

এখানে গীতার উপদেষ্টা দেখাচ্ছেন যে যারা পরোৎকর্ষের সাধনা করে তাদের পক্ষে বৈদিক পথ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

ঈশ্বর ভক্তের সমস্ত বোঝা বহন করেন ও সমস্ত সন্তাপ হরণ করেন।[২]

ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধে সচেতন হতে হলে, অন্য সব অনুরাগ বর্জন করতে হবে।[৩] আমরা যদি সম্পূর্ণভাবে তাঁর কৃপাপ্রার্থী হই তাহলে তিনি আমাদের সমস্ত দুঃখশোকের বোঝা নিজে টেনে নেন। তাঁর ত্রাণকারী যত্ন ও শক্তিদায়ী প্রসাদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

১। যোগোঽপ্রাপ্তস্যপ্রাপণম্, ক্ষেমস্তদ্ রক্ষণম্। দ্বিতীয়, ৪৫ দ্রষ্টব্য।

২। ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতি।

৩। রাবেয়াকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানকে ভালবাস?" "হাঁ।" "তুমি শয়তানকে ঘৃণা কর?" তিনি উত্তর দেন, "ভগবানকে ভালবেসে আর শয়তানকে ঘৃণা করার আমার অবসর থাকে না। আমি পয়গম্বরকে স্বপ্নে দেখি।

২৩। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

(২৩) হে কুন্তীপুত্র, যে অন্য দেবতা-ভক্তরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পূজা করে, তারাও আমার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ করে, যদিও তা ঠিক বিধিমত হয় না।

গীতা-রচয়িতা আকাশের সব দিক থেকে জ্যোতি চান। জ্যোতি বলেই তার সর্বত্র প্রতিভাত হবার অধিকার আছে।

২৪। অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

(২৪) কারণ আমি সমস্ত যজ্ঞের স্বামী ও ভোক্তা। কিন্তু তারা আমার আসল স্বভাব জানে না বলে চ্যুত হয়।

২৫। যান্তি দেবব্রতা দেবান্, পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা, যান্তি মদ্যাজিনোঽপিমাম্ ॥

(২৫) দেবগণের যারা পূজা করে তারা দেবলোকে যায়, যারা পিতৃপুরুষের পূজা করে তারা পিতৃলোকপ্রাপ্ত হয়, যে ভূতপ্রেতের পূজা করে সে প্রেতলোকে যায়, আর যে আমার ভজন করে সে আমাকে পায়।

অভিব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে মানুষ নানা দীপ্যমান দেবতা, মৃতাত্মা ও প্রেতাত্মার উপাসনা করে, কিন্তু তারা সকলেই ব্রহ্মের সসীম আকার এবং সকল বোধের অতীত যে শান্তি তা সাধককে দিতে পারে না। উপাসনার ফল উপাস্য আকারের অঙ্গীভূত হওয়া এবং এই সসীম আকাবেবা সসীম ফলই দিতে পারে। কোন উপাসনাই তার শ্রেষ্ঠ ফলে বঞ্চিত হয় না। অপকৃষ্টের অর্চনা অপকৃষ্ট ফলই দেয়, পরম ব্রহ্মের অর্চনা দ্বাবাই পরম ফল লাভ করা যায়। সকল প্রকার ঐকান্তিক ধর্মীয় উপাসনাই পরমেশ্বরের অর্চনা।

ভক্তি ও তার ফল।

২৬। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

(২৬) যে ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল,

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাকে ভালবাস ?" আমি উত্তর দিলাম, "হে পয়গম্বর তোমাকে কে না ভালবাসে? কিন্তু আমি ভগবৎ প্রেমে এমন ভাবে নিমগ্ন যে অন্য কারুর প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের কোন স্থান আমার অন্তরে নেই।" R. A. Nicholson, A literary History of the Arabs (1930), 234.

একটি ফল বা জল দেয়, শুদ্ধচিত্ত ভক্তের সেই ভক্তি উপহার আমি গ্রহণ করি।

পূজার আয়োজন যত দীনই হোক, যদি ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা করা হয়, তাহলে ভগবান তা গ্রহণ করেন। সূক্ষ্ম অধিবিদ্যা বা জটিল আচারানুষ্ঠান সর্বশ্রেষ্ঠের কাছে পৌঁছবার পথ নয়। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গই সে পথ। একটি পাতা, একটি ফুল, ফল বা জল তারই প্রতীক। ভক্তিপূর্ণ চিত্তই একমাত্র প্রয়োজন।

২৭। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

(২৭) তুমি যা কর, যা খাও, যা আহুতি দাও, যা দান কর, যা তপস্যা কর, হে কৌন্তেয়, তা সবই তুমি আমাকে সমর্পণ কর।

আত্মসমর্পণের ফল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম নিবেদন করা। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কর্মধারা ঈশ্বরারাধনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া চাই। জীবনের বন্ধুরতা থেকে পলায়নের জন্য ভগবৎ প্রেমের আশ্রয় নিলে চলবে না, ভগবৎ প্রেম সেবায় উৎসর্গের মধ্যে পেতে হবে। বিহিত অনুষ্ঠানাদির সম্পাদন রূপ কর্তব্য দিয়ে কর্মযোগের আরম্ভ হয়, আর যখন সমস্ত কর্তব্যকর্ম নিরাসক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন দ্বারা পূত হয় তখনই তার উদ্‌যাপন।

"আমার আত্মা তোমার আত্মা, আমার বুদ্ধি পার্বতী, প্রাণ আমার সহচর, দেহ আমার গৃহ, ইন্দ্রিয় বিষয়োপভোগে আমার পূজা, সমাধিতে আমার নিদ্রা। মন্দির প্রদক্ষিণে আমার পাদচারণা, আমার সকল কথাই স্তোত্র। আমি যা কিছু করি, হে ঈশ্বর তা সমস্তই তোমার আরাধনা।"[১] সমস্ত কর্তব্য যদি নিবেদনের ভাব নিয়ে করা যায়, তা হলে সকল কার্যই ঈশ্বরারাধনা, স্বতন্ত্র পূজার প্রয়োজন নেই।[২]

১। আত্মা ত্বং, গিরিজা মতিঃ, সহচরাঃপ্রাণাঃ, শরীরং গৃহম্।
পূজা মে বিষয়োপভোগরচনা, নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ ॥
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বাগিরো।
যদ্ যৎ কর্মকরোমি তৎতদখিলং শম্ভো তবারাধনম্ ॥

২। মধুসূদন বলেন,
অবশ্যং ভাবিনাং কর্মাণাম্ ময়ি পরমগুরৌ সমর্পণমেব মদ্ভজনম্।
ন তু তদর্থং পৃথগ্ ব্যাপারঃ কশ্চিৎ কর্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।

২৮। শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

(২৮) এইভাবে তুমি শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। সন্ন্যাস যোগ দ্বারা আমাতে চিত্ত দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করে মুক্তি পেয়ে আমাকে লাভ করবে।

এইভাবে সমর্পণ ও নিবেদন দ্বারা আত্মার সমস্ত জীবন পরমেশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হয়, অহং নিজ বাধা থেকে মুক্ত হয় এবং তার কাজ আর আত্মাকে বন্ধন করতে পারে না।

২৯। সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

(২৯) আমি সর্বভূতে একই (সমান)। কেউ আমার ঘৃণ্যও নয়, কেউ প্রিয়ও নয়। কিন্তু যে ভক্তির সঙ্গে আমার পূজা করে, সে আমাতে থাকে আমিও তাতে থাকি।

ঈশ্বরের মিত্রও নেই, শত্রুও নেই। তিনি পক্ষপাতশূন্য। ইচ্ছামত কাউকে তিনি অভিশাপও দেন না, কাউকে বরও দেন না। তাঁর প্রীতি লাভ করার একমাত্র উপায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং প্রত্যেককে তা নিজেই দিতে হবে।

৩০। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

(৩০) অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্যচিত্তে আমার অর্চনা করে, তা হলেও তাকে সাধু বলে ভাবতে হবে, কেননা তার সংকল্প সাধু।

"বাহ্যজীবনে মন্দপথ পরিত্যাগ করে এবং আন্তরিক ন্যায্য সংকল্পের দ্বারা" ইতি শঙ্করাচার্য। নিম্নোক্ত উক্তিও তুলনীয়। "পাপ করার পর যদি পাপী অনুতপ্ত হয় তবে সে পাপমুক্ত হয়; সে যদি প্রতিজ্ঞা করে যে সে আর পাপ করবে না, তা হলে সে শুদ্ধ হবে।"[১] পূর্বকর্মের ফল কখনও নিশ্চিহ্ন হয় না, যদি না অনন্তচিত্তে পাপী ঈশ্বরাভিমুখী হয়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রের উক্তি স্মরণীয়: দুরাচারের কথা চিন্তা করে মনে প্রত্যহ অনুতপ্ত হোক এবং

১। কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে
নৈবং কুর্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।

সতর্ক হয়ে তপশ্চরণ করুক, তা হলে সে পাপমুক্ত হবে।"[১] কর্ম সম্পূর্ণরূপে বাঁধতে পারে না। গভীরতম অধোগতিপ্রাপ্ত পাপীর মধ্যেও দিব্যজ্যোতি আছে, তাকে নিরুদ্ধ করার চেষ্টা করে, তার প্রতি বিমুখ হয়েও পাপী তাকে নির্বাপিত করতে পারে না। আমরা পতিত হলেও ঈশ্বর আমাদের অস্তিত্বের মূল ধরে আছেন এবং আমাদের তমসাচ্ছন্ন বিদ্রোহী অন্তরে আলোকসম্পাত করবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির চেতনাই আমাদের অন্তরে দিব্য প্রেরণার চিহ্ন। তাই সন্ত তুকারাম্ বলেছেন, "আমি পতিতের পতিত তস্য পতিত, তবু তুমি নিজ শক্তিতে আমাকে তুলে নাও। আমার অন্তর পবিত্র নয়, তোমার চরণে মতিও স্থির নয়। আমি পাপসম্ভূত। তুকা বলে, আমি কতবার সে কথা বলব?" আবার "আমি বুদ্ধিহীন, অভাবগ্রস্ত, অভাবগ্রস্তের চেয়েও অধম। আমি চিত্ত স্থির করতে পারি না, চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে বশে আনতে পারি না। সাধনায় শ্রান্ত, শান্তি ও বিশ্বাস আমা থেকে দূরে গেছে। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভক্তি অর্পণ করছি, তোমার চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করছি। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো, আমি শুধু তোমাকে দেখব। হে ভগবান, আমার বিশ্বাস তোমার উপর, আমি তোমার চরণ দৃঢ়ভাবে ধরে থাকব। তুকা বলে, তুমিই আমার সাধনার ব্যবস্থা কর।"[২] বাইবেলে রূপকে আছে যে শুল্ক সংগ্রাহক রাজপুরুষ অন্তরের থেকে প্রার্থনা করছে, "হে ঈশ্বর, আমি পাপী, আমাকে করুণা কর।"

এ শ্লোকের এ অর্থ নয় যে আমাদের কর্মফল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সহজ উপায় আছে। কার্যকারণ বিধিকে আমরা নিবারণ করতে পারি না। জগৎ শৃঙ্খলায় বিধিনিরপেক্ষ হস্তক্ষেপ চলে না। পাপী যখন অনন্য ভক্তিতে ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তখন একটি নূতন কারণের উদ্ভব হয়। তার মুক্তি অনুতাপসাপেক্ষ। আমরা লক্ষ্য করেছি, যে অনুতাপ মানে অন্তরের সত্য সত্য পরিবর্তন এবং কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা ও দুঃখ এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পণ অনুতাপের অন্যতম লক্ষণ। এই রকম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলে অপকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টে পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে ঘটে।

১। শোচেত মনসা নিত্যং দুষ্কৃতান্যনুচিন্তয়ন্
তপস্বী চাপ্রমাদি চ ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥

২। Fraser & Marathee, Tukaram I, P 92

আমরা যদি মানুষী প্রয়াসের উপর ভরসা করে থাকি, তো উন্নতি দুরূহ হতে পারে। ভ্রান্তি, ত্রুটি ও স্বৈরতাকে জয় করা কঠিন, কিন্তু আত্মা যখন অহং জ্ঞান পরিত্যাগ করে দিব্যের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে, তখন ঈশ্বরই তার বোঝা তুলে নেন আর আত্মাকে আধ্যাত্মিক স্তরে উঠিয়ে দেন।

তুলসীদাস বলেছেন, "অঙ্গারের মলিনত্ব অগ্নিস্পর্শেই দূর হতে পারে।"[১] ক্ষমার অযোগ্য কোন পাপ নেই।

৩১। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

(৩১) শীঘ্রই সে ধর্মাত্মা হয়ে শাশ্বত শান্তি লাভ করে। হে কুন্তীপুত্র, এটা নিশ্চয়ই জেনো যে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।[২]

একবার ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলে, চরম অন্ধকারে পড়ার আর ভয় থাকে না।

এখানে রামের উক্তি তুলনীয়ঃ "যে আমার আশ্রয় একবারের জন্যও চায় এবং "আমি তোমার" এই বলে সাহায্য চায়, আমি তাকে সকলের থেকে অভয় দিই। এই আমার ব্রত।"[৩]

৩২। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিম্ ॥

(৩২) হে পার্থ, যে আমার আশ্রয় নেয় সে যদি অন্ত্যজ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য বা শূদ্রও হয় তাহলেও সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।

জাতি, কুল, লিঙ্গ নির্বিশেষে গীতার বাণী সকলের জন্য মুক্ত। যে সামাজিক প্রথার জন্য স্ত্রীলোক ও শূদ্রেরা বেদাধ্যায়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এই শ্লোককে তার সমর্থক বলে ধরা ঠিক নয়। গীতা রচনার সময় যে প্রথা প্রচলিত ছিল এখানে তার উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। গীতা এই

১। গরুড় পুরাণ তুলনীয়ঃ "ভক্তিরষ্টবিধাহেযা যস্মিন্ ম্লেচ্ছোপি বর্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥

২। প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতি।

৩। সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।

এই উক্তিও তুলনীয়ঃ—ন বাসুদেব ভক্তানাং অশুভং বিদ্যতে কচিৎ।

সব সামাজিক বিধিকে অনুমোদন করে না।[১] গীতা যে আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর জোর দিয়েছে তাতেই সে জাতিবৈষম্যকে অতিক্রম করেছে। তার প্রেমের মন্ত্র সকল পুরুষ ও নারীর জন্য, সকল বর্ণের এমন কি যারা বর্ণের বাইরে তাদের জন্যও।[২]

৩৩। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

(৩৩) কাজেই পুণ্যব্রত ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের তো কথাই নেই। অতএব যখন এই অনিত্য অসুখের আকর জগতে জন্মগ্রহণ করেছ, তখন আমাকে ভজনা কর।

অর্থাৎ এমন কি যারা পূর্বজন্মের ফলভোগের জন্য নানা অক্ষমতার বশ হয় ও ঐহিক ব্যাপারে মগ্ন থাকে তারাও তাদের দুর্বলতাকে জয় করে পরম পদলাভ করতে পারে। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের পক্ষে অবশ্য সিদ্ধিলাভ সহজতর।

অনিত্যমসুখং লোকম্—নশ্বর সন্তাপময় জগৎ। অর্ফিয়দের মতে এ জগতে জীবন যন্ত্রণা ও শ্রান্তিদায়ক। আমরা অনন্ত জন্মমৃত্যু পর্যায়ে ঘূর্ণমান চক্রে আবদ্ধ। শুদ্ধি ও ত্যাগের দ্বারাই আমরা তা থেকে মুক্তিলাভ করে

১। প্রাচীন কালে অহিন্দুদের বর্বর বলে হেয় মনে করার প্রবণতা ছিল। অবশ্য এই ধরনের মনোভাব যে শুধু হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তা নয়। প্রাচীন গ্রীকেরা সমস্ত বিদেশীদেরই বর্বর আখ্যা দিত। রোমান সেনাপতি কুন্তিলিয়ান বরুস জার্মানিয়ার অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন, "অবশ্য তারা মানুষ এ কথা সত্য, কিন্তু কণ্ঠস্বর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া আর মানুষের মত তাদের কিছুই নেই।" ফরাসী দার্শনিক ম তেস্কিউ (Montesquieu ১৬৮৯-১৭৫৫) নিগ্রোদের সম্বন্ধে বলেছেন "ভগবান এত জ্ঞানী হয়ে এক কৃষ্ণবর্ণ দেহে শুধু আত্মাই দেন নি, অমর আত্মা দিয়েছেন, এ কথা কল্পনা করা শক্ত। এই লোকগুলিও মানুষ, এ কথা ভাবা অসম্ভব।"

২। প্রত্যেক সুবুদ্ধি হিন্দুর কাছে এ একটা গভীর লজ্জা ও অপমানের কথা যে সময় সময় অস্পৃশ্যতার সমর্থনে যুক্তি বার করা হয়। বুদ্ধ তার সংঘে অন্ত্যজদের সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। রামায়ণে এখন যাদের অস্পৃশ্য মনে করা হয় তাদেরই একজন রামকে নিজের নৌকায় গঙ্গা পার করেছিল। শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তির মহান্ আচার্যগণ সাম্যের জন্য চেষ্টা করে গেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে যে কুলেই জন্মাক, ভগবদ্ভক্তেরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণাৎ।" চৈতন্যের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, দস্যু ও বারাঙ্গনা সবই ছিল।

ঈশ্বরসংস্পর্শে আনন্দলাভ করতে পারি। জন বার্ণেট অর্ফিয় মতবাদের সঙ্গে সমসাময়িককালে ভারতে প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাচীন গ্রীকদর্শন (১৯২০) ৮২ পৃঃ। বুদ্ধের উপদেশেরও শুরু জগতের নশ্বরতা ও সন্তাপের ঘটনা থেকে।[১] পারস্যে যীশুর জবানীতে এক উক্তি প্রচলিত আছে, "জগৎ একটা সেতু, তার উপর দিয়ে চলে যাও কিন্তু তার উপর বাসা তৈয়ারী করবে না।" শুধু জগৎ নয়, ব্রহ্মাণ্ডলীলার প্রত্যেক দশা, মানব ইতিহাসের প্রত্যেক দিক, মানব-জীবনের প্রত্যেক স্তর, শৈশবের সজীবতা, বাল্যের স্থূলতা, যৌবনের ভাববাদ, বয়ঃসন্ধির উদ্দামতা এবং পরিণত বয়সের উচ্চাভিলাষ, এ সবই সেতু, গমনপথ রূপেই ব্যবহার্য, স্থায়ী বাসস্থান রূপে নয়। বর্তমান বিজ্ঞানের চক্ষে দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবন কি বিশ্রীভাবে পরনির্ভর। জঁ্যাপল সার্ত্র'র অস্তিত্ববাদে ধরে নেওয়া হয় মানুষের অস্তিত্ব কতকগুলি স্থায়ী অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আমাদের প্রত্যেকে জন্মে এমন একটা বাস্তবতায় জড়িয়ে পড়ি যা আমাদের উপর নির্ভর করে না, যা অন্য লোকের উপর প্রভাবপাতী ও অন্য লোকের প্রভাবসাপেক্ষ। মৃত্যু থেকে তার নিস্তার নেই। ব্যাপারগুলি একত্রে ধরলে মানুষের অস্তিত্ব এক বিয়োগান্ত বাস্তব। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থায় আমাদের প্রত্যেককে নিজের সংকল্প দ্বারা মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হবে। অস্তিত্ববাদীদের মতে মানুষের একমাত্র ভরসা নিজের উপর। ঈশ্বরের ত্রাণকারী প্রসাদের উপর তার বিশ্বাস নেই। গীতার উপদেষ্টা আমাদের বস্তুদের নশ্বরতা, জন্মমৃত্যুর অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের উপায় দেখাচ্ছেন "জরামরণমোক্ষায়"[২] তিনি আমাদের ঈশ্বরের আশ্রয় নিতে বলেছেন।

৩৪। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌ যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

(৩৪) আমার উপরই চিত্তনিবেশ কর, আমাকেই ভক্তি কর, আমাকেই পূজা কর, আমাকেই প্রণাম কর। এইভাবে নিজেকে যোগসমাহিত করে আমাকে লক্ষ্যে রাখলে আমাকে লাভ করবে।

ব্যক্তিস্বরূপ কৃষ্ণের কাছে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সমর্পণের কথা ওঠে না

১। ত্রয়োদশ, ৮ তুলনীয়।
২। সপ্তম, ২৯।

কিন্তু অজ, অনাদি, অনন্তই কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলছেন। আমাদের আত্ম-কেন্দ্রিক চেতনা থেকে দিব্যস্তরে ওঠবার উপায় আমাদের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি আবেগ ও ইচ্ছাশক্তিকে ঈশ্বরের উপর কেন্দ্রীভূত করা। তাহলে আমাদের সমগ্র সত্তা রূপান্তরিত হয় এবং ভাবের ঐক্যে ও বিশ্বজনীনতায় উন্নীত হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও শক্তি পরম ঐক্যে মিলে যায়। আত্মবিস্মৃতি, সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন ও চরম অঙ্গীকার থেকেই শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়।

ইতি……রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥

রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়ের এখানেই ইতি।

দশম অধ্যায়

ঈশ্বরই সকলের কারণ, তাঁকে জানলেই সব জানা হয়।

ঈশ্বরের ব্যাপিত্তা ও অতিক্রমণ

শ্রীভগবান উবাচ

১। ভূয় এব মহাবাহো। শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥

শ্রীভগবান বললেন

(১) হে মহাবাহো (অর্জুন), তুমি আবার আমার পরম বচন শ্রবণ কর। তুমি এখন (আমার কথায়) আনন্দ পাচ্ছ দেখে তোমার কল্যাণার্থে তোমাকে সে কথা বলছি।

"প্রীয়মাণায়"র অর্থ "প্রিয়"-ও করা যায়।

২। ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ॥

(২) দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উদ্ভব কিভাবে তা জানে না কেননা আমি সব দিক দিয়েই দেব ও মহর্ষিগণের উৎস।

সর্বশঃ—সব প্রকারে, "সর্বপ্রকারৈ" ইতি শঙ্করাচার্য।

ব্রহ্ম অজ ও নিত্য, তিনি আবার জগদীশ্বরও। তাঁর যদিও জন্ম নেই, তবু সর্বভূত তাঁর থেকেই উৎপন্ন। গীতা উপদেষ্টা ঘোষণা করছেন যে আসলে তিনিই শাশ্বত ভগবান নিজে, সকলের থেকে প্রাচীন এবং সমস্ত ব্যক্ত মহিমা তাঁর থেকেই নিঃসৃত।

৩। যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

(৩) যে আমাকে অজ ও অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানে মরলোকের মধ্যে সে মোহবর্জিত হয়ে সর্বপাপমুক্ত হয়।

সকল বস্তু এক তুরীয় সত্তা থেকে উদ্ভূত এই কথা হৃদয়ঙ্গম করলে আমাদের আর হাতড়ে বেড়াতে হয় না এবং সকল প্রকার মোহ ঘুচে যায়।

৪। বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভাবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥

(৪) বুদ্ধি, জ্ঞান, নির্মোহ, ধৈর্য, সত্য, সংযম, শান্তি, সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি ও বিনাশ, ভয় ও অভয়—

দমঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়ের অকুক্কতাই আত্মসংযম।

শমঃ—শান্তি। অন্তর্লীন ভাবের প্রশান্তি।

৫। অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥

(৫) অহিংসা, সমভাব, সন্তোষ, তপস্যা, দান, খ্যাতি ও অখ্যাতি, ভূতেদের এই সব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আমা হতেই উৎপন্ন।

অহিংসা—প্রাচীন শাস্ত্রে এই কথার অর্থ কারুকে আঘাত না করা, বিশেষ করে কারুকে হত্যা না করা।

জীবেদের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা তাদের অতীত জন্মের কর্মফল থেকে আসে।[১] পরোক্ষভাবে ভগবান জগতের দুঃখকষ্টের জন্যও দায়ী। তিনি জগদীশ্বর এবং জগৎকে চালনা করেন যদিও তিনি এর বৈপরীত্যসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হন না।

৬। মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥

(৬) পুরাকালের সপ্ত মহর্ষি ও চার মনু আমারই প্রকৃতি ও আমারই মানসজাত এবং তাঁদের থেকেই জগতের এই সমস্ত জীবেদের উৎপত্তি।

নানা জাগতিক প্রক্রিয়ার ভারপ্রাপ্ত শক্তি এঁরা। প্রচলিত কথা অনুযায়ী প্রত্যেক নূতন সৃষ্টিভূত জাতিদের মধ্যে প্রথম মানব মনু।

৭। এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

(৭) যে যথার্থভাবে আমার এই মাহাত্ম্য (বিভূতি) ও শক্তি (স্থির ক্রিয়া) জানে, সে অবিচলিত যোগ দ্বারা আমার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাতে সন্দেহ নেই।

১। স্বকর্মানুরূপেণ। ইতি শঙ্করাচার্য।

বিভূতি—মাহাত্ম্য[১]। জ্ঞাতা ঈশ্বরের সঙ্গে একতা উপলব্ধি করে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি এই জগতের কাজে অংশগ্রহণ করবে। সগুণ সাকার ব্রহ্মের জ্ঞান থেকেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান জন্মায়।[২]

জ্ঞান ও ভক্তি।

৮। অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতাঃ॥

(৮) আমি সকলের উৎস, (সমগ্র সৃষ্টি) আমা থেকে উৎসারিত। এই কথা জেনে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রাজ্ঞেরা আমাকে ভজনা করে।

ভাব—মনের যথাযথ অবস্থা। ইতি রামানুজাচার্য।

উপদেষ্টা এখানে ঈশ্বরের জবানীতে বলছেন: ঈশ্বর জগতের বাস্তব ও কুশলী কারণ। সাধক অস্থায়ী আকারের মোহে পড়ে না, ব্রহ্ম সমস্ত রূপের উৎস জেনে ব্রহ্মেরই পূজা করে।

৯। মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

(৯) তাদের চিন্তা আমাতে (স্থিত), তাদের জীবন (সমগ্রভাবে) আমাতে অর্পিত, আমার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করে এবং আলোচনা করে তারা আমাতেই তৃপ্ত থাকে ও আনন্দ পায়।

১০। তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

(১০) এই যারা আমাকে সর্বদা ভক্তি ও প্রীতিযুক্ত হয়ে ভজনা করে, তাদের আমি বুদ্ধির একাগ্রতা প্রদান করি, যাতে তারা আমাকে পেতে পারে।

বুদ্ধিযোগ—মনের যে একাগ্রতা দ্বারা শিষ্য প্রজ্ঞালাভ করে। সকল বিকারী ও অস্থায়ী আকারের মধ্যে এককে জানাই প্রজ্ঞা।

১। শঙ্করের ব্যাখ্যায় বিভূতিং বিস্তারম্। রামানুজের ব্যাখ্যায় ঐশ্বর্যম্, যথাযথ অনুভূতি, আগ্রহ ও শ্রদ্ধা। শঙ্করভাষ্যের উপর টীকাতে আনন্দগিরি বলেন, "বিবিধা ভূতির্ভবনং বৈভবং সর্বাত্মকত্বম্।" অভিব্যক্তির মহিমা।

২। সোপাধিক জ্ঞানং নিরুপাধিক জ্ঞানে দ্বারম্। ইতি—আনন্দগিরি।

১১। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

(১১) তাদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ নিজ স্বভাব থেকে আমি তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা নষ্ট করি।

মানুষের কল্যাণার্থে জগতের উপর ঐশী প্রভাব পড়ে, তিনি কিন্তু জগৎ থেকে পৃথক থাকেন। আত্ম ভাবকে লোকেদের আন্তরিক ভাব বলেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে উপদেষ্টা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে ভক্তি দ্বারা কিভাবে অজ্ঞতা দূর হয়ে জ্ঞানালোক সম্পাত হয়। অজ্ঞতা দূর হলে, মানুষের ভাবলোকে ঈশ্বর প্রকট হন। প্রেম ও জ্ঞানের উদয় হলে, প্রাতিস্বিকের মধ্যে শাশ্বতের সিদ্ধি হয়। ভক্তি ও জ্ঞানের এক পন্থা। এর দ্বারা আমরা দিব্যপ্রসাদ ও বুদ্ধিরূপ শক্তি (বুদ্ধিযোগ) লাভ করি। বৌদ্ধিক জ্ঞান বুদ্ধির অপরোক্ষ স্বজ্ঞা দ্বারা প্রদীপ্ত ও নিশ্চিত হয়।

ঈশ্বর সর্বভূতের বীজ ও পরোৎকর্ষ।

অর্জুন উবাচ।

১২। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥

অর্জুন বললেন

(১২) তুমি পরম ব্রহ্ম, পরমাশ্রয়, ও পরম পাবন, শাশ্বত, দিব্য-পুরুষ, আদি দেব, অজ ও সর্বব্যাপী।

১৩। আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥

(১৩) সমস্ত ঋষিরা তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলে, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস, এমন কি তুমি নিজেও এ কথা আমাকে বলেছ।

অর্জুন পুরাকথিত ঘোষণার সত্যতা স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং ঘোষণা করছেন যে প্রবক্তা কৃষ্ণই সর্বেশ্বর, পরম, নিত্যমুক্ত এবং আত্মসমর্পণ দ্বারা তাঁর কাছে পৌঁছতে পারা যায়। ঋষিরা যে সত্য উপলব্ধি করে ও তার সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করে ব্যক্ত করেছেন, অর্জুন নিজ অভিজ্ঞতা থেকে তার সমর্থন ঘোষণা করছেন। শুদ্ধ জ্ঞান ঈশ্বরই প্রকাশ করেন, ঋষিরা তার সাক্ষী, অর্জুন নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা তার প্রমাণ পেয়েছেন। ঋষি- দ্বারা

ঘোষিত সার সত্য এখন প্রতিভাত স্বজ্ঞায় সমস্ত অস্তিত্বের জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে।

১৪। সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥

(১৪) হে কেশব (কৃষ্ণ), তুমি যা আমাকে বলছ তার সত্যতা আমি মানছি ; হে ভগবান্, দেব-দানব কেউ তোমার সকল বিভূতি জানে না।

১৫। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥

(১৫) হে পুরুষোত্তম, ভূতদের উৎপাদনের কারণ, সর্বভূতের অধিপতি, দেবতাদেরও দেবতা, জগদীশ্বর, তুমি নিজেই শুধু নিজের দ্বারা নিজেকে জান।

১৬। বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥

(১৬) অতএব তুমিই দিব্য আত্মমহিমা সম্পূর্ণভাবে আমাকে বল, যে বিভূতি দ্বারা তুমি এই সকল চরাচর ব্যাপ্ত করে আছ (তাদের মধ্যে ও তাদের অতিক্রম করে)।

বিভূতয়ঃ—সকল প্রকার প্রকটতা, যে দিব্যমহিমায় ব্রহ্ম সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। তারাই প্রত্যেক বিষয়কে তার সারপ্রকৃতি দেবার সাংগঠনিক বল বা আধ্যাত্মিক শক্তি। তারা প্লেটোর দিব্যভাবের (Divine Ideas) সগোত্র, ইহলোকের সকল বস্তুর সম্পূর্ণ আদর্শ ও ছাঁচ। অবশ্য "ভাব" কথাটায় একটা নিষ্প্রভ ভাবসত্তা, রক্তশূন্য ব্যাপারের ধারণা আছে। বিভূতি কিন্তু সজীব সাংগঠনিক সারতত্ত্ব।

১৭। কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥

(১৭) হে যোগী, সর্বদা ধ্যানের জন্য তোমাকে কিভাবে জানব? হে ভগবান, তোমাকে কত রূপে কত ভাবে আমি চিন্তা করব?

কৃষ্ণ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্য যোগী। অর্জুন জানতে চাইছেন যে প্রকৃতির কোন্ কোন্ ভাবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থিতি স্পষ্টতরভাবে প্রকটিত হয় এবং কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন ঈশ্বরারাধনায় সহায়তার জন্য কি কি ভাবে বা রূপে তাঁকে ধ্যান করা উচিত।

১৮। বিস্তারেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥

(১৮) হে জনার্দন (কৃষ্ণ), তোমার ক্ষমতা ও বিভিন্ন বিভূতির কথা আবার সবিস্তারে বল, কেননা তোমার অমৃতবাণী এত শুনেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।

অমৃতম্—অমৃতের মত। তাঁর বাণী জীবনদায়িনী।

গীতা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, অবর্ণনীয় সত্য ও তার অসম্পূর্ণ প্রকাশের মধ্যে কোন বৈপরীত্যের কথা স্বীকার করে না। গীতার মধ্যে একটা সামগ্রিক অধ্যাত্মবাদ পাই। নিঃসংশয়ে এর মধ্যে সম্পূর্ণ নিরুপাধিক ব্রহ্মকে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত অক্ষর, অচিন্ত্যরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দেহীদের পক্ষে এরকম পরমের অর্চনা করা কঠিন।[১] ব্রহ্মের কাছে তাঁর জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সহজ এবং এই পদ্ধতি অধিকতর স্বাভাবিকও বটে। ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বরও, যিনি প্রকৃতির নানা রকমের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং প্রত্যেক সৃষ্ট ভূতের অন্তরে বাস করেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরও বটে, মানুষ ও বিশ্বের মধ্যে অন্তর্যামী। কিন্তু তাঁর আসল প্রকৃতি নানা পর্যায়ের পরিণামিতা দিয়ে আড়াল হয়ে যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক অভিন্নতার কথা মানুষকে আবিষ্কার করতে হবে। শুধু তাই নয় তার মধ্য দিয়ে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির একত্ব অনুভব করতে হবে।

শ্রীভগবান উবাচ

১৯। হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥

(১৯) শ্রীভগবান বললেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), তোমাকে আমার দিব্য বিভূতির প্রধান প্রধানগুলির কথা বলব, কেননা আমি এতদূরে বিস্তৃত হয়েছি যে তার সকলগুলি বলা সম্ভব নয়, কেননা তার শেষ নেই।

২০। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চমধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

(২০) হে গুড়াকেশ (অর্জুন), আমি সর্বভূতের অন্তরে স্থিত আত্মা, আমিই তাদের আদি (উৎপত্তি), মধ্য (স্থিতি) ও শেষ (লয়)।

১। দ্বাদশ, ৫

জগৎ এক সজীব সমগ্রতা, পরস্পর সংশ্লিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডীয় ঐকতান, যার প্রেরক ও ধারক সেই এক ব্রহ্ম।

২১। আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।

(২১) আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে কিরণমালী সূর্য, মরুতদের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।

আদিত্যেরা বৈদিক দেবতা। ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই আছেন, কিন্তু কারুর কারুর মধ্যে তিনি স্পষ্টতর। জগতের মধ্যে একটা ক্রমোচ্চ পর্যায় আছে। জড়ের থেকে জীবনের মধ্যে, জীবনের থেকে চেতনার মধ্যে ঈশ্বর বেশী প্রকট, আর সব চেয়ে বেশী প্রকট সাধুসন্তদের মধ্যে। আবার একই পর্যায়ের মধ্যে তিনি বিশিষ্টদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রকট। এইখানে যে সকল পৌরাণিক সত্তার উল্লেখ আছে তাঁরা হয়ত গীতা রচনার যুগে হিন্দুদের কাছে সজীব সত্তা বলে প্রচলিত ছিলেন।

২২। বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥

(২২) বেদেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়দের মধ্যে আমি মন ও ভূতেদের মধ্যে আমি চেতনা।

সামবেদকে বেদসকলের মধ্যে প্রধান ধরা হয়, তার সাঙ্গীতিক সৌন্দর্যের জন্য।[১]

২৩। রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥

(২৩) রুদ্রদের মধ্যে আমি শঙ্কর (শিব), যক্ষরাক্ষসদের মধ্যে (আমি) কুবের, বসুদের মধ্যে অগ্নি ও পর্বতশৃঙ্গদের মধ্যে আমি মেরু।

২৪। পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥

(২৪) হে পার্থ, পুরোহিতদের মধ্যে আমাকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলে জানবে আর সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিক ও জলাশয়দের মধ্যে আমি সমুদ্র।[২]

১। সামবেদো গানেন রমণীয়ত্বাৎ। ইতি নীলকণ্ঠ।

২৫। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥

(২৫) মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঙ্কার, যজ্ঞের মধ্যে আমি নীরব জপরূপ যজ্ঞ, এবং অচল বস্তুর মধ্যে (আমি) হিমালয়।

২৬। অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥

(২৬) বৃক্ষদের মধ্যে (আমি) অশ্বত্থ, এবং দেবর্ষিদের মধ্যে (আমি) নারদ, গন্ধর্বদের মধ্যে (আমি) চিত্ররথ ও সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে (আমি) কপিলমুনি।

কপিল সাংখ্যদর্শনের আচার্য।

২৭। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥

(২৭) অশ্বদের মধ্যে আমাকে অমৃত-জাত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানবে, বিশাল হস্তীদের মধ্যে (আমি) ঐরাবত ও মানুষের মধ্যে (আমি) রাজা।

২৮। আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥

(২৮) অস্ত্রদের মধ্যে আমি বজ্র, গরুদের মধ্যে আমি কামধেনু, বীজী পুরুষদের মধ্যে আমি মদন ও সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি।

২৯। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্॥
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥

(২৯) নাগেদের মধ্যে আমি অনন্ত, জলবাসীদের মধ্যে আমি বরুণ, (পরলোকগত) পূর্বপুরুষদের মধ্যে আমি অর্যমা, আর যারা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, তাদের মধ্যে আমি যম।

৩০। প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥

(৩০) দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গাণনিকদের মধ্যে আমি সময়, পশুদের মধ্যে আমি পশুরাজ সিংহ) আর পক্ষীদের মধ্যে (আমি) বিনতানন্দন (গরুড়)।

৩১। পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥

(৩১) পাবন বা শোধনকারীদের মধ্যে আমি বায়ু, যোদ্ধাদের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যদের মধ্যে আমি কুমীর ও নদীদের মধ্যে আমি গঙ্গা।

৩২। সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥

(৩২) হে অর্জুন, সৃষ্টবস্তুদের আমি আদি, অন্ত ও মধ্য, বিজ্ঞানদের মধ্যে (আমি) অধ্যাত্মবিজ্ঞান এবং তার্কিকদের মধ্যে আমি বাদ।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্—বিজ্ঞানদের মধ্যে আমি আত্মবিজ্ঞান। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই দিব্যানন্দ লাভের উপায়। এ বিজ্ঞান বুদ্ধি খাটানোর উপলক্ষ্য বা সামাজিক অভিযান নয়। এ মোক্ষদায়িনী জ্ঞান, কাজেই এ আয়ত্ত করতে হলে গভীর ধর্মবিশ্বাস দরকার। যে অজ্ঞতা সত্যস্বরূপকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে, তাকে জয় করতে অধ্যাত্ম বিদ্যারূপ দর্শন আমাদের সাহায্য করে। প্লেটোর মতে এই হল সার্বিক বিজ্ঞান। একে বাদ দিলে খণ্ডিত শাখাবিজ্ঞানরা ভ্রান্ত করে। প্লেটো বলেন, সমগ্র অধিগত বিদ্যার মধ্যে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা না থাকে তো কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যার অধিকারীর সহায়তা হয় কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার অপকার হয়। Alcibiades, II 144 D.

৩৩। অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহংবিশ্বতোমুখঃ ॥

(৩৩) অক্ষরদের মধ্যে আমি অকার, আর সমাসদের মধ্যে (আমি) দ্বন্দ্ব; আমিই অক্ষয় কাল এবং আমিই স্রষ্টা যার মুখ সমগ্র বিশ্বের দিকে অবস্থিত।

কাল—সময়। কালস্বরূপী ভগবান কৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম, ৩৮।

৩৪। মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তি শ্রীর্বাক চ নারীনাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥

(৩৪) আমি সর্বহর মৃত্যু এবং ভবিষ্য বস্তুসমূহের উৎস, এবং নারীদের মধ্যে আমি যশ, সমৃদ্ধি, ভাষা, স্মৃতি, মেধা, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা।

৩৫। বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥

(৩৫) সেইরূপ স্তোত্রদের মধ্যে (আমি) বৃহৎসাম, ছন্দদের মধ্যে (আমি) গায়ত্রী, মাসেদের মধ্যে (আমি) মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং ঋতুদের মধ্যে (আমি) বসন্ত।

৩৬। দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥

(৩৬) আমি প্রতারকদের জুয়া, তেজস্বীদের তেজ, আমি জয়, আমি অধ্যবসায় এবং আমি সাধুদের সততা।

৩৭। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুণীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাকবিঃ॥

(৩৭) বৃষ্ণিদের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদের মধ্যে (আমি) অর্জুন, মুনিদের মধ্যে (আমি) ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে (আমি) কবি উশনা।

৩৮। দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥

(৩৮) আমি দণ্ডদাতাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুদের আমি কুশল নীতি, গোপনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে আমি নীরবতা এবং জ্ঞানবানদের আমি জ্ঞান।

৩৯। যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥

(৩৯) তা ছাড়া, হে অর্জুন, সমস্ত ভূতেদের কিছু যদি বীজ থাকে তা আমি এবং চরাচরে এমন কিছু নেই আমা ছাড়া যার অস্তিত্ব থাকতে পারে।[১]

৪০। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরোময়া॥

(৪০) আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। হে পরন্তপ (অর্জুন), আমি যা এখন তোমার কাছে বললাম, তা আমার অনন্ত মহিমার নিদর্শন মাত্র।

১। দ্রৌপদীর উক্তি স্মরণীয়ঃ
মর্ত্যতা চৈব ভূতানামমরত্বং দিবৌকসাম্।
ত্বয়ি সর্বং মহাবাহো লোককার্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥

৪১। যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

(৪১) মহিমময়, তেজী, শ্রীযুক্ত যাহা যাহা আছে, জেনো তা আমার মহিমারই অংশ থেকে উদ্ভূত।

সমস্ত বস্তুরই পালক ঈশ্বর হলেও, সৌন্দর্য ও মহিমময় বস্তুর মধ্যে তাঁর উন্মীলন অপরদের চেয়ে বেশী। প্রত্যেক বীরোচিত কার্য, প্রত্যেক আত্ম-বলিদান, প্রত্যেক প্রতিভার স্ফুরণের মধ্যে দিব্য উন্মোচিত হন। মানুষের জীবনের মহাকাব্যময় মুহূর্তগুলি মানুষের সসীম মনের ধারণা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

৪২। অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

(৪২) হে অর্জুন, কিন্তু এত বহুর সম্বন্ধে জানার কি প্রয়োজন তোমার? আমার এক ভগ্নাংশ দ্বারাই আমি এই সমগ্র বিশ্বজগৎকে ব্যাপ্ত ও ধারণ করে আছি।

একাংশেন—এক ভাগ দ্বারা। এক ঈশ্বর খণ্ডিত হন নি। এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্তের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র, তার ভাস্বর জ্যোতির একটিমাত্র রশ্মিদ্বারা প্রতিভাত।[১] সর্বেশ্বরের অতীন্দ্রিয় জ্যোতি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও দেশ-কালকে অতিক্রম করে বিরাজিত।

ইতি……বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।
বিভূতিযোগ শিরোনামের দশম অধ্যায়ের এইখানেই শেষ।

১। ঋগ্বেদের দশম, ৯০,৩। পাদো অস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদ অস্যামৃতম্ দিবি। পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে এসব তাঁর মাহাত্ম্যের বর্ণনা মাত্র, পুরুষ নিজে এর চেয়ে ঢের বড়। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয়, ১২,৬ এবং মৈত্রায়নী উপনিষদের ষষ্ঠ, ৪-ও তুলনীয়। চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ সংখ্যক শ্লোকের উপর টীকায় অভিনব গুপ্ত "তদাত্মানম্"-এর স্থানে "তদাত্মাংশম্" পাঠ নিয়ে বলেছেন, "শ্রীভগবান কিল পূর্ব সদ্গুণ্যত্বাৎ শরীরসম্পর্কমাত্ররহিতোঽপি স্থিতি কারিত্বাৎ কারুণিকতয়া আত্মাংশং সৃজতি; আত্মা পূর্ণ ষাড়গুণ্যঃ অংশঃ উপকারকত্বেন অপ্রধানভূতো যত্র তদাত্মাংশম্ শরীরম্ গৃহ্নাতি ইত্যর্থঃ।

একাদশ অধ্যায়

ভগবানের রূপান্তর

অর্জুনের ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শনের বাসনা।

অর্জুন উবাচ

১। মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥

অর্জুন বললেন

(১) অধ্যাত্ম বিষয়ে পরম গুহ্যতত্ত্ব সম্বলিত যে ভাষণ আমার প্রতি কৃপা করে তুমি দিলে তাতে আমার মোহ দূর হল।

জগতের বস্তুরাজির স্বকীয় অস্তিত্ব আছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে, ঈশ্বর ছাড়া তাদের জীবন ও গতি আছে, এই সকল মোহ বিদূরিত হল।

২। ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥

(২) হে পদ্মপলাশলোচন (কৃষ্ণ), বস্তুসকল কিভাবে জন্মায় ও লয়প্রাপ্ত হয়, তা তোমার কাছে বিস্তারিত ভাবে শুনেছি, তোমার অবিনশ্বর মাহাত্ম্যের কথাও জেনেছি।

৩। এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥

(৩) হে পরমেশ্বর, যেভাবে তুমি নিজেকে ব্যক্ত করেছ তা যথার্থ। (কিন্তু) হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশী রূপ দেখতে ইচ্ছা হয়েছে।

শাশ্বত পুরুষ সকল বস্তুতে আছেন তা জানা এক আর তাঁর দর্শনলাভ করা আর এক। অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যরূপ, বিশ্বরূপ অর্জুন দেখতে চান। তিনি যে "সকল বস্তুর সৃষ্টি ও লয়" (দশম, ৮) সেটা কি ব্যাপার তাই জানতে চান। বিমূর্ত দার্শনিক সত্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়া চাই।

৪। মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥

(৪) হে প্রভো, তুমি যদি মনে কর যে আমি সে দৃশ্য দেখার উপযুক্ত,

তাহলে হে যোগেশ্বর (কৃষ্ণ), তুমি তোমার অব্যয় আত্মা আমার কাছে উন্মীলিত কর।

ঈশ্বরের উন্মীলন।

শ্রীভগবান উবাচ

৫। পশ্যমে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥

শ্রীভগবান বললেন

(৫) হে পার্থ (অর্জুন), আমার শতসহস্র, নানাবিধ নানা বর্ণের, নানা রূপের দিব্যআকার দর্শন কর।

ঐশী শক্তির বিরাট আত্ম উন্মোচন যে অর্জুনের সামনে ঘটল তার কারণ অর্জুন ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও পরিণতির আসল অর্থ বুঝতে পেরেছেন। মহাভারতের ষষ্ঠ পর্বের ১৩১ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে দুর্যোধনের কাছে মিটমাটের উদ্দেশ্যে শেষবারের মত কৃষ্ণ যখন যান, তখন তাঁকে দুর্যোধন বন্দী করার চেষ্টা করলে, তিনি দুর্যোধনের কাছে নিজের বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন।

বিশ্বরূপ দর্শন রূপকথাও নয়, উপকথাও নয়, এটা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ইতিহাসে এরকম বহু নিদর্শন আছে। যীশুর রূপান্তর[১],

---

১। মার্ক, নবম, ২-৮। সেন্ট হিল্‌দেগার্দ (১০৯৮-১১৮০) এক দর্শনের কথা বলেছেন, তাতে তিনি একটি "সুন্দর মানবাকার" দেখেছিলেন, যিনি তার স্বরূপ যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, তা গীতার বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। "আমি সেই পরম ও প্রদীপ্ত শক্তি যা থেকে জীবনের সকল স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। মৃত্যু আমার অংশ নয়, কিন্তু আমিই তাকে আরোপ করি, পাখীদের পাখা যেমন ভূষণ, আমার ভূষণ তেমনি জ্ঞান, ক্ষেত্রের সৌন্দর্যে যে দিব্য বস্তু প্রতিভাত হয় তার সজীব ও প্রদীপ্ত সার আমি। আমার ঔজ্জ্বল্য জলে, আমার দাহ সূর্য, চন্দ্র, তারায়। অদৃশ্য বায়ুর রহস্যময় শক্তি আমা হতে আসে। আমি সকল সজীব বস্তুর শ্বাস। শ্যামলে, কুসুমে আমিই নিশ্বাস নিই এবং জল যখন সজীব বস্তুর মত প্রবহমাণ, তার মধ্যেও আমি। সমগ্র ধরণীকে যে স্তম্ভ সকল ধারণ করে আছে, তাদের আমি গঠন করেছি। যে বজ্রবাণী দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্ট হয়েছে তাও আমার শক্তি থেকে উদ্ভূত। এরা সজীব কেননা আমি তাদের মধ্যে আছি ও আমি তাদের প্রাণশক্তি। আমিই জীবন এবং সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছি, যাতে তারা না মরে।" চার্লস সিঙ্গার সম্পাদিত Studies in the History and Method of Science (১৯১৭)-এ উদ্ধৃত। পৃঃ ৩৩।

দামস্কসের রাস্তায় সলের দৃষ্টি, "এই নিশানা নিয়ে জয়ী হও" এই বাণী শুদ্ধ ক্রুশের যে দৃশ্য কনস্তানতাইন দেখেছিলেন, জোয়ান অফ আর্ক যে সকল দৃশ্য মানসচক্ষে দেখতে পেতেন, সে সবই অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের সমগোত্রীয় অভিজ্ঞতা।

৬। পশ্যাদিত্যান্ বসূন রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥

(৬) আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীদ্বয় ও মরুতদের দর্শন কর। হে ভারত (অর্জুন), অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য বস্তু দর্শন কর।

৭। ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মমদেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥

(৭) হে গুড়াকেশ (অর্জুন,) এইবার তুমি চরাচর সমস্ত বিশ্ব এবং আর যা কিছু তুমি দেখতে চাও তা আমার দেহে একত্র দর্শন কর।

এ হল একের মধ্যে সকলকে দেখা। আমাদের বোঝবার ক্ষমতা যখন পূর্ণ বিকশিত হয়, তখন (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান) সবই বর্তমান আছে বলে বুঝতে পারি।

৮। ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

(৮) কিন্তু আমাকে তুমি তোমার (মানব) চক্ষু দ্বারা দেখতে পাবে না তাই আমার ঐশী বৈভব দেখবার জন্য তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু দান করব।

চর্মচক্ষুতে সে সার্বভৌম রূপ দৃশ্য নয়। এত আলো মানুষের চক্ষুতে সহ্য হবে না। "দিব্যচক্ষু" দেবতাদের চক্ষু, আর "মাংসচক্ষু" সাধারণ শরীরীদের চক্ষু।[১]

১। উপনিষদে আছে, "শুনেও তারা শোনে না, জেনেও তারা জানে না, দেখেও তারা দেখে না, জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই তারা দেখতে পায়।

শৃণ্বন্তোপি ন শৃণ্বন্তি জানন্তোপি ন জানতে
পশ্যন্তোপি ন পশ্যন্তি, পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষাঃ।

মোক্ষধর্মে এই শ্লোকটি আছে :—

মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি।

মানুষী চক্ষুতে বাহ্য আকারই ধরা পড়ে, অন্তরাত্মাকে দেখতে হলে অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। এক ধরনের জ্ঞান আছে, যা আমরা নিজ চেষ্টা দ্বারা অর্জন করতে পারি। সে জ্ঞানের ভিত্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি ও সক্রিয় বুদ্ধি। আর এক ধরনের জ্ঞান হ'ল আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, তা ভগবৎপ্রসাদ আমাদের উপর বর্ষিত হলে তবেই পেতে পারি। দেব দর্শন দেবতারই দান। বিশ্বরূপের বর্ণনা, ব্রহ্মাণ্ডীয় বহুবিধা যে দিব্য প্রকৃতিতে ঐক্যলাভ করেছে, তা বোঝাবার কাব্যিক কৌশল।

এ দৃশ্য মানসিক প্রতিক্ষেপ নয়, সসীম মনের অতীত জগতাগত সত্যের প্রকাশ। স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাই এখানে দেখানো হয়েছে।

সঞ্জয়ের বর্ণনা।

সঞ্জয় উবাচ

৯। এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥

সঞ্জয় বললেন,

(৯) হে রাজন্, এই কথা বলে মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে তাঁর পরম দিব্যরূপ দেখালেন।

কৃষ্ণের রূপান্তরে অর্জুন স্বর্গ-মর্ত্যের সকল সৃষ্ট বস্তুকে দিব্য আকারের মধ্যে দেখতে পেলেন।

১০। অনেক বক্ত্র নয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥

(১০) সে রূপে অনেক মুখ ও অনেক চক্ষু, অনেক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য, অনেক দিব্য অলঙ্কার এবং অনেক দিব্য উদ্যত অস্ত্র।

এই শ্লোকের মধুসূদন কৃত টীকা:—

"সর্বভূতগুণৈবযুক্তং কারণোপাধিং মাং চর্মচক্ষুষা দ্রষ্টুং নার্হসি।"

যীশুখ্রীষ্টের বাণী এই সম্পর্কে তুলনীয়: "প্রভো, তার চক্ষু খুলে দাও, যাতে সে দেখতে পায়।" Exodus, xxxiii-এ এজেকিয়েলের দর্শন, Revelation iv এবং সদ্ধর্মপুণ্ডরিক-ও দ্রষ্টব্য। "ওঠ, প্রদীপ্ত হও, কেননা তোমার আলোক এসেছে, ঈশ্বরের মহিমা তোমাতে প্রতিভাত হয়েছে। তুমি দেখবে ও দীপ্ত হবে, তোমার অন্তর রোমাঞ্চিত ও প্রসারিত হবে।" (Isaiah, ix, 1-5)

একই কথা বার বার ব্যবহার করাতে মনে হয় যেন কবি উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধ করছেন। যে উপলব্ধি অবর্ণনীয় তাকে বর্ণনা করার চেষ্টা করতে গেলে এরকম বন্ধুরতা আসবেই।

অনেক বক্ত্র নয়নম—অনেক মুখ ও অনেক চোখ। তিনি সর্বগ্রাসী ও সর্বদ্রষ্টা।

এগুলি বিশ্বসত্তার বর্ণনা। পুরুষ সূক্তেও এই রকমের বর্ণনা আছে। সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত (ঋগ্বেদ দশম, ৯০)। মুণ্ডকোপনিষদ দ্বিতীয়, ১, ৪ ও তুলনীয়।

১১। দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥

(১১) দিব্য মাল্য ও বস্ত্র পরিহিত, দিব্য সুগন্ধ ও অনুলেপন চর্চিত, সর্ব বিস্ময়কর বস্তু সংগঠিত, জ্যোতির্ময় অনন্ত ও বিশ্বের সর্বতোমুখী।

১২। দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

(১২) আকাশে সহস্র সূর্য যদি একসঙ্গে উদিত হ'ত তাহলে যে জ্যোতি উদ্ভাসিত হ'ত, সেই মহাত্মার দীপ্তি তার সঙ্গে তুলনীয়।

১৩। তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥

(১৩) সেইখানে পাণ্ডব (অর্জুন) দেবদেবের শরীরে সমগ্র বহুধা বিভক্ত বিশ্বজগৎকে একত্রিত দেখতে পেলেন।

বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহুর দর্শন অর্জুন পেলেন। সমস্ত বস্তু একই থাকে আবার সবই পরিবর্তিত হয়। দৈনন্দিন জগতের বিশিষ্ট নিশানাগুলি বিলুপ্ত হলে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত যুক্ত এবং সমগ্রের প্রতিবিম্ব। এখানে যে দৃশ্যের বর্ণনা তা সমস্ত জাগতিক জীবের সম্ভাব্য দেবত্বের উদ্ঘাটন।

অর্জুন ভগবানকে সম্বোধন করছেন।

১৪। ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥

(১৪) তখন ধনঞ্জয় (অর্জুন) বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে দেবতার কাছে নতমস্তক হয়ে করজোড়ে বললেন।

ভীতিমিশ্রিত ভক্তির আবেগে চুল খাড়া হয়ে উঠেছে, মাথা নুয়ে পড়ছে, এই অবস্থায় বিনীতভাবে করজোড়ে শ্রদ্ধাবনত।

অর্জুন উবাচ

১৫। পশ্যামি দেবাংস্তবদেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥

অর্জুন বললেন,

(১৫) হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবতা, নানা বিশিষ্ট ভূতেদের সকলকে, কমলাসনস্থিত ভগবান ব্রহ্মা, সকল ঋষি, এবং স্বর্গীয় নাগদের দেখছি।

ঈশ্বর সন্দর্শনে আমাদের দৃষ্টির বিস্তার প্রসারিত হয় এবং যে সমস্ত পার্থিব সংঘর্ষ ও সন্তাপ নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত থাকি তাদের অতিক্রম করা সম্ভব হয়। আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের অতি নগণ্য অংশ, ঈশ্বরের সৃষ্টি এতেই সীমাবদ্ধ নয়। যে মহান ও বহুবিধ ভাব দ্বারা বিশ্ব পরিপূর্ণ, অর্জুন তার দর্শন পেলেন।

১৬। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

(১৬) হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, আমি তোমাকে দেখছি সর্বদিকে অসীম আকার, তোমার চোখ, মুখ, বাহু ও উদরের সংখ্যা অনন্ত, কিন্তু আমি তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

বক্ত্র—মুখমণ্ডল বা মুখগহ্বর।

১৭। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥

(১৭) আমি মুকুট গদাচক্র বিশিষ্ট তেজোপুঞ্জ স্বরূপ তোমাকে দেখছি, তুমি সব দিকে সূর্য ও প্রদীপ্ত অগ্নির অপরিমিত তেজে এত আলোকোজ্জ্বল যে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

১৮। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মত মে॥

(১৮) তুমি অক্ষয় ও জ্ঞাতব্য পরম্। সমগ্র বিশ্বের তুমি চরমাশ্রয়; শাশ্বত ধর্মের তুমি অমর রক্ষক, তুমিই আমার মতে আদি পুরুষ।

অক্ষয়ম্—অবিনশ্বর। অর্জুনের উক্তিতে পরম যুগপৎ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর।[১]

শাশ্বত ধর্মগোপ্তা—শাশ্বত ধর্মবিধির অমর রক্ষক। অভিনব গুপ্ত সাত্বত ধর্মগোপ্তা (সাত্বত ধর্মের পালক) এই পাঠান্তর গ্রহণ করেছেন।

১৯। অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

(১৯) আমি তোমাকে দেখছি আদি, অন্ত, মধ্যহীন, অনন্ত বীর্যশালী, অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট। সূর্যচন্দ্র তোমার চক্ষু, তোমার মুখ জ্বলন্ত অগ্নি, তার তেজে এই বিশ্ব উত্তপ্ত।

২০। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্টাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥

(২০) হে মহাত্মন্, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ ও সর্বদিক একমাত্র তোমার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। তোমার এই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত রূপ দেখলে ত্রিভুবন কম্পিত হয়।

২১। অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসংঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥

(২১) ওখানে দেবগোষ্ঠী তোমাতে প্রবেশ করছেন এবং কেউ কেউ ভয় পেয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমার স্তব করছেন, আর মহর্ষি ও সিদ্ধপুরুষরা "স্বস্তি হোক্" এই কথা বলে প্রচুর স্তবস্তুতি দ্বারা তোমার মহিমাকীর্তন করছেন।

অধ্যাত্মভাবসম্পন্ন জনগণ তাঁর মহিমায় মুগ্ধ হয়ে, দিব্যানন্দময় অর্চনায় বিভোর।

২২। রুদ্রাদিত্যাবসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥

(২২) রুদ্র, আদিত্য, বসু ও সাধ্যেরা, বিশ্বদেবেরা, অশ্বিনীদ্বয়, মরুতেরা, পিতৃপুরুষেরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধেরা সকলেই তোমাকে বিস্মিত হয়ে দেখছেন।

২৩। রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রা করালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্।

(২৩) হে মহাবাহো, তোমার বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু

১। এতেন সগুণব্রহ্মণঃ নির্গুণজ্ঞাপকত্বমুক্তম্। ইতি নীলকণ্ঠঃ।

উদর, বহু পদ, বহু করাল দন্ত সমন্বিত মূর্তি দেখে লোকে কম্পিত হচ্ছে, আমিও।

পরমের সর্বময়তা ও সর্বব্যাপিতা বোঝাবার জন্য এখানে কিছু কাব্যিক অত্যুক্তি করা হয়েছে।

২৪। নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥

(২৪) যখন আমি দেখছি যে তুমি আকাশ ছুঁয়ে আছ, তুমি নানা বর্ণে উজ্জ্বল, ব্যাদিতবদন ও প্রদীপ্ত বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট, তখন আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কম্পিত হচ্ছে এবং হে প্রভু, স্থৈর্য ও শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

২৫। দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

(২৫) আমি যখন কালানল সদৃশ করাল দন্তবিশিষ্ট তোমার মুখ দেখি তখন দিশেহারা হয়ে যাই, শান্তি পাই না। হে দেবেশ্বর, হে জগতের আশ্রয়, প্রসন্ন হও।

কালানল—বাচ্যার্থে প্রলয়াগ্নি।

অর্জুন দিশেহারা। এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্যে বিস্ময়, ভয় ও মহোল্লাস মিশে আছে।

২৬। অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বেসহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মোদ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥

(২৬) ঐ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সমেত নৃপতিবৃন্দ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, তাছাড়া আমাদের দলের প্রধান যোদ্ধারাও।

২৭। বক্ত্রাণি তে ত্বরমানা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥

(২৭) করালদন্তবিশিষ্ট তোমার ভয়ানক মুখে দ্রুত প্রবেশ করছে। কাউকে কাউকে তোমার দাঁতের মধ্যে মস্তকচূর্ণ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

২৮। যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥

(২৮) বহু বেগবান নদীস্রোত যেমন সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়ে তাতেই প্রবেশ করে, তেমনি পৃথিবীর নরশ্রেষ্ঠরা তোমার প্রজ্বলন্ত মুখে বেগে প্রবেশ করছে।

২৯। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণিসমৃদ্ধবেগাঃ॥

(২৯) পতঙ্গেরা যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিতে দ্রুতবেগে প্রবেশ করে বিনষ্ট হয়, তেমনি লোকেও তাদের বিনাশের জন্য দ্রুতবেগে তোমার মুখে প্রবেশ করছে।

এই জীবেরা নিজেদের অজ্ঞতা দ্বারা অন্ধ হয়ে নিজেদের বিনাশের দিকে ছুটে চলেছে, দিব্যনিয়ন্তা তাতে বাধা দিচ্ছেন না কেননা তারা তাদের নিজেদের কর্মফল উদ্‌যাপন করছে। যখন কোন কাজের সংকল্প করি, তখন তার যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাও পাবার সংকল্প করি। আমরা আমাদের স্বাধীন কর্মের ফলের অধীন। যেহেতু কার্যকারণ সম্বন্ধবিধি ভগবানেরই ইচ্ছাপ্রসূত, তাই সেই বিধি প্রয়োগ করাও তাঁরই কাজ বলা যেতে পারে। গীতা-রচয়িতা বিশ্বরূপের ধারণার মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে ঐশী জীবনের প্রাচুর্যের মধ্যেই দেব, সিদ্ধপুরুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বলিত ভয়ঙ্কর সুন্দর, বিশাল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান। ঈশ্বরের নিজের মধ্যেই সব, কাজেই তিনি তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন না। মানুষেরা বিক্ষিপ্ত চিন্তায় বিভোর, কখনও এটা নিয়ে ব্যস্ত, কখনও ওটা নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের চিন্তাধারা ক্রমানুযায়ী চলে, কিন্তু তিনি সমস্ত বস্তু একই সঙ্গে ধারণা করেন। সেখানে ভূতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই।

৩০। লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

(৩০) চতুর্দিকে সমস্ত জগৎ সমূহকে তোমার জ্বলন্ত মুখে গ্রাস করে তাদের চেটে নিচ্ছ। তোমার প্রদীপ্ত তেজ সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করে তার জ্বলন্ত রশ্মিতে দগ্ধ করছে, হে বিষ্ণু।

৩১। আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥

(৩১) উগ্ররূপধারী তুমি কে তা আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি প্রণাম করি, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। হে সকলের আদি, তোমাকে আমি জানতে চাই, কেননা তুমি কিভাবে কাজ কর, তা আমি জানি না।

শিষ্য গভীরতর জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করছে।

মীমাংসার অধিকার ঈশ্বরের।

শ্রীভগবান উবাচ

৩২। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

শ্রীভগবান বললেন,

(৩২) আমি জগৎসংহারী পরিণত মহাকাল, জগৎকে সংক্ষেপ করায় লিপ্ত আছি। তোমা ছাড়াও (অর্থাৎ তুমি কিছু না করলেও) প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদলের যোদ্ধাদের সকলেই বিনষ্ট হবে।

কাল বা সময়ই বিশ্বের মুখ্য সঞ্চালক। ঈশ্বরকে কালরূপে কল্পনা করলে, তিনি চিরকাল সৃষ্টি ও লয় করছেন। কালস্রোত অবিরাম বহে চলেছে।

পরম পুরুষ সৃষ্টি ও লয় উভয়েরই দায়িত্ব নেন। জগতে যা কিছু শুভ তা ভগবানের আর যা কিছু অশুভ তা শয়তানের এই যে একপ্রকার প্রচলিত মতবাদ আছে গীতা তাকে আমল দেয় না। মর অস্তিত্বের জন্য যদি ঈশ্বর দায়ী হন, তা হলে তার মধ্যে যা কিছু আছে, জীবন ও সৃষ্টি, সন্তাপ ও মৃত্যু, তার সবখানির জন্যই তিনি দায়ী।

ঈশ্বর কালকে বশে রাখতে পারেন, কেননা তিনি কালাতীত, আমরাও কালকে বশে আনতে পারি যদি আমরা তাকে অতিক্রম করতে পারি। কালের অন্তরালে বিরাজিত শক্তিরূপে আমরা যা দেখতে পাই না, তা তিনি দেখতে পান, তিনি জানেন কিভাবে ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তিনি অর্জুনকে বলছেন যে বহুযুগ ধরে যে কারণ সক্রিয়, সে তার স্বাভাবিক ফলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং এখন তাকে বাধা দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁর শত্রুদের ধ্বংস বহু অতীতের কর্ম দ্বারা অনিবার্যভাবে অবধারিত হয়েছে। একটা নৈর্ব্যক্তিক নিয়তি আছে, যাকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা বিধির বিধান (Providence) বলতে অভ্যস্ত। সেটা ঐশী প্রকৃতির একটা দিকের অভিব্যক্তি এবং ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে সাধারণভাবে প্রয়োজন। অতএব তাকে ঈশ্বরের সার্বভৌম অস্মিতার সঙ্কল্প বলে ধরা যায় এবং তা তার নিজস্ব অবোধ্য লক্ষ্যের দিকে ধাবিত। তার প্রতিরোধে সকল প্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণ ঘটিত প্রতিবাদ নিষ্ফল।

৩৩। তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচী ॥

(৩৩) অতএব তুমি ওঠ এবং যশোলাভ কর। শত্রুজয় করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। তারা আমারই দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী (অর্জুন), তুমি শুধু তাদের নিধনের নিমিত্তমাত্র হও।

ভাগ্যবিধাতাই স্থির করেন ও সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, অর্জুন যন্ত্র মাত্র; সর্বশক্তিমানের হাতের বাঁশী, তিনি তাঁর নিজ উদ্দেশ্যসাধন করছেন ও বিরাট অভিব্যক্তিকে কার্যকরী করছেন। অর্জুন যদি মনে করে থাকেন যে তিনি তাঁর নিজের অসম্পূর্ণ বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কাজ করবেন, তো সেটা তাঁর আত্মপ্রবঞ্চনা। ঈশ্বরের অধিকারে কোন জীবাত্মা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অস্ত্র পরিত্যাগ করে অর্জুন প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়েছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৫৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নিমিত্তমাত্রম্—শুধু উপলক্ষ। গীতা-রচয়িতা এখানে ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত নিয়তিবাদকে সমর্থন করছেন এবং প্রাতিস্বিক অসহায়তা ও তুচ্ছতা এবং তার নিজ সংকল্প ও প্রয়াসের নিষ্ফলতা নির্দেশ করছেন। মীমাংসা হয়েই আছে এবং অর্জুন তার কোন পরিবর্তনই করতে পারেন না। ঈশ্বরের হাতে তিনি শক্তিহীন যন্ত্র মাত্র। অথচ অন্য কথাও আছে যে ঈশ্বর খেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারী নয়, প্রেমময় ও ন্যায়পরায়ণ। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? মাত্র ঈশ্বরই সক্রিয় এবং তিনিই সব নির্ধারণ করেন, ঈশ্বর সংক্রান্ত এই সশঙ্ক শ্রদ্ধার ভাবে আমাদের মনে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার ভাব আসে; তাঁকে আমরা সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে অবস্থিত আমাদের "প্রতিপক্ষ" বলে মনে করি। সেই ভাবই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে সুতীব্র সংজ্ঞাই এখানে ব্যক্ত হচ্ছে। বাইবেলের জব ও পলের সম্বন্ধীয় উপাখ্যানেও এক উক্তিতে এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে: "গঠিত বস্তু কি তাকে যিনি গঠন করেছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি আমাকে এভাবে গড়েছ কেন?"

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারটাকে একটা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার ক্রমোন্মেষ, একটা সম্পাদিত ও প্রস্তুত দৃশ্যপটের উন্মোচন বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। মানুষের সমগ্র কর্মজীবন যে আগে থাকতে বলা যায় না সেকথা অস্বীকার করা গীতা-রচয়িতার এখানে উদ্দেশ্য নয়। তিনি এখানে

চিরকালের ধারণার পুনরাবৃত্তি করছেন যাতে সমগ্র ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের প্রত্যেক মুহূর্ত দিব্যতত্ত্বের মধ্যে বিরাজমান। ক্রমোন্মেষের কালের প্রতি মুহূর্তের যে ঐকান্তিক নবীনতা দেখা যায়, তার সঙ্গে দিব্য চিরন্তনের কোনো অসঙ্গতি নেই।

মানুষকে অবলম্বন করেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা সক্রিয় হয়। আমাদের যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে আমরা এমন ভাবে কাজ করি যাতে আমরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হতে পারি। আমাদের আত্মাকে নিজের মধ্যে মগ্ন করে আমাদের অহং বোধকে যাতে তিনি বিলুপ্ত করতে পারেন তাই আমরা তাঁকে করতে দিই। আমরা তাঁর আজ্ঞা পাব ও সেই আজ্ঞা পালন করার সময় বলব "তোমার ইচ্ছা পালনেই আমাদের শান্তি"; "পিতঃ, তোমার হাতেই আমার আত্মাকে সমর্পণ করছি"[১]। অর্জুনের মনে এই ভাব হওয়া উচিত যে "তোমার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র মাত্র।" যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিভীষিকাই তাঁর বিমুখতার কারণ। তিনি যে পরে সে বিমুখতাকে অতিক্রম করলেন, তা মানুষের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে দুর্বোধ্য মনে হয় কিন্তু সর্বশক্তিমানের সংকল্প যখন তাঁর কাছে ব্যক্ত হ'ল, তখন আর তার সমর্থন করা ছাড়া উপায় রইল না। তিনি নিজে কি চান বা ইহকালে ও পরকালে কি লাভ করতে চান, তা তখন অবান্তর হয়ে পড়ল। এই দেশকালময় জগতের অন্তরালে ও তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে ঈশ্বরের সৃজনী-সংকল্প। সেই পরম সংকল্পকে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে এবং তার সিদ্ধিতে আনুগত্য করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। প্রত্যেক কার্যই তার অতীত কিছুর প্রতীক।

৩৪। দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্
মযা হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥

(৩৪) যে দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ইত্যাদি অন্যান্য বীর যোদ্ধাগণকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রেখেছি, তাদের তুমি বধ কর। ব্যথিত হয়ো না। যুদ্ধ কর, তুমি রণে শত্রুদের জয় করবে।

ময়া হতান্—আমার দ্বারা অভিশপ্ত। ঈশ্বর তাদের জীবনের গতি ও অমোঘ পরিণতি জানেন। এমন কিছু ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ থাকতে পারে না যা

১। লিউক, ত্রয়োবিংশৎ, ৪৬।

ঈশ্বর স্থির করেন নি বা যার জন্য তিনি নির্দেশ দেন নি। একটা চড়াইপাখী পড়ে গেলেও বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছা ব্যক্ত হচ্ছে।

অর্জুনকে নিয়তির ভূমিকা নিতে বলা হচ্ছে। বাহ্যতঃ তিনি প্রকৃতিকে জয় করবেন এবং অন্তরে সকল সম্ভাব্য দুর্ঘটনাকে অতিক্রম করবেন।

সঞ্জয় উবাচ

৩৫। এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥

সঞ্জয় বললেন,

(৩৫) কেশবের (কৃষ্ণের) এই কথা শুনে কিরীটী (অর্জুন) কম্পমান হয়ে করজোড়ে ভয়ে ভয়ে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে গদগদ হয়ে এই কথা বললেন।

রুডল্‌ফ অটো এই দৃশ্যটিকে ধর্মের ভয়ঙ্কর রহস্য, তার যুগপৎ আকর্ষণ ও বিভীষিকার উদাহরণ রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে ঈশ্বরের তুরীয় ভাবের পরিচয় পাই।

অর্জুনের স্তব

অর্জুন উবাচ

৩৬। স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥

অর্জুনের উক্তি

(৩৬) হে হৃষীকেশ (কৃষ্ণ), জগৎ যথার্থই তোমার গুণকীর্তন করে হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়। রাক্ষসেরা ভয় পেয়ে চতুর্দিকে পালাচ্ছে আর সিদ্ধপুরুষেরা সকলেই তোমাকে প্রণাম করছেন (ভক্তিতে)।

যুগপৎ ভক্তি ও সন্ত্রাসের উন্মাদনায় অর্জুন ব্রহ্মের প্রশস্তি করছেন। তিনি যে কালের ধ্বংসাত্মক শক্তিই দেখেছেন তাই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক বিধি ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বও প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথমোক্তটিতে ভয়ের উদ্রেক হয়, শেষোক্ত থেকে হর্ষ ও দিব্যোন্মাদের উদ্ভব হয়, তাই অর্জুন ঐকান্তিক ভক্তিতে তাঁর আত্মাকে উচ্ছল করছেন।

৩৭। কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে
ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥

(৩৭) হে মহাত্মা, তোমাকে তাঁরা নমস্কার না করবেন কেন, যখন তুমি আদি কারণ ও ব্রহ্মার চেয়েও শ্রেষ্ঠ? হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগতের আশ্রয়, তুমি অবিনশ্বর, তুমি অস্তিত্বস্বরূপ ও অস্তিত্ববিহীন, আবার তাদের অতীত যা তাও।

আদিকর্ত্রে—তুমি প্রথম স্রষ্টা বা তুমি ব্রহ্মারও স্রষ্টা।

জগন্নিবাস—জগতের আশ্রয়। যে ভগবানের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের স্থিতি।

৩৮। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

(৩৮) তুমি আদি দেবতা ও প্রাচীন পুরুষ, এই বিশ্বের পরম আশ্রয়-স্থল। তুমি জ্ঞাতা আবার জ্ঞাতব্য ও পরম গতি। হে অনন্তরূপ, তোমার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।

৩৯। বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

(৩৯) তুমি বায়ু, তুমি যম (লয়কারী), তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ (জলাধিপ), তুমি শশাঙ্ক (চন্দ্র) এবং তুমি সকলের পিতামহ প্রজাপতি। তোমাকে হাজার বার প্রণাম করি, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

কারুর কারুর ব্যাখ্যা "প্রজাপতি এবং সকলের পিতামহ।"

৪০। নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

(৪০) তোমাকে সম্মুখ থেকে প্রণাম, পশ্চাৎ থেকে প্রণাম, হে সর্ব, তোমাকে সর্ব দিক থেকে প্রণাম করি। তুমি অনন্তবীর্য ও অমিতবিক্রম। তুমি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত, কাজেই তুমিই সব।

ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন, ভিতরে, বাহিরে, উপরে, নীচে এবং চতুর্দিকে এবং এমন কোনও স্থান নেই যেখানে তিনি নেই। মুণ্ডক উপনিষদ দ্বিতীয়, ২,১১ ও ছান্দোগ্য উপনিষদ, সপ্তম, ২৫ দ্রষ্টব্য।

আমরা সকলেই যে সেই পরম অনন্তের সৃষ্টি এবং তিনি যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছেন একথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে।

৪১। সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

(৪১) তোমাকে সখা ভেবে তোমার এই মহিমা না জেনে, ভুল করে বা অত্যধিক স্নেহবশত: অবিনয়ে "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা" ইত্যাদি যে সম্ভাষণ করেছি—

তবেদম্-এর পাঠান্তর তবেমম্।

৪২। যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহার শয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥

(৪২) খেলার সময়, পরিহাসস্থলে, শয়নে, উপবেশনে বা আহারের সময়ে, অন্য লোকের সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে তোমাকে যা কিছু অসম্মান করে থাকি, হে অবিচলিত ও অপরিমেয়, তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করলে নিজের অযোগ্যতা ও পাপের ফল গভীর ভাবে অনুভূত হয়। ইশাইয়া যখন ঈশ্বরকে উত্তোলিত সুউচ্চ সিংহাসনে আরূঢ় রূপে দেখেছিলেন, তখন বলে উঠেছিলেন "হায়, হায়, আমি বিনষ্ট কেননা আমার ওষ্ঠ অপবিত্র,······আমার চোখ রাজরাজ ও সকলের প্রভুকে দেখতে পেয়েছে।" (ষষ্ঠ, ১, ৫)

৪৩। পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥

(৪৩) তুমি চরাচর সর্বলোকের পিতা এবং তাদের পূজ্য ও মহান গুরু। হে অপ্রতিমপ্রভাব, ত্রিভুবনে তোমার সমানই নেই, তোমার থেকে বড়র তো কথাই নেই।

৪৪। তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥

(৪৪) হে দেব, হে বন্দ্য, হে ঈশ্বর, সেই জন্য আমি দণ্ডবৎ হয়ে প্রণত হয়ে তোমার প্রসাদ ভিক্ষা করছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার সকল অপরাধ সহ্য করেন, তুমি আমার অপরাধ সেইরকম সহ্য কর।

ব্রহ্মকে শুধু ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য রূপে ধারণা করলে হবে না, তাকে আমাদের নিকটতম, পুত্র পিতার যেমন নিকট, সখা সখার যেমন নিকট, প্রিয়া দয়িতের যেমন নিকট, সেই রকম ভাবতে হবে। এই সব মানবিক

সম্বন্ধ ঈশ্বরের মধ্যে সর্বোত্তম সার্থকতা লাভ করে এবং পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে এই ভাবকে আরও পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈশ্বরের পিতৃরূপ হিন্দুদের সুপ্রচলিত ধারণা। ঋগ্বেদে আছে: "পিতা যেমন পুত্রের কাছে, আমাদের কাছে সেইরূপ সহজ হও। হে যতঃ প্রতিভাত প্রভু, আমাদের কাছে থাক ও আমাদের কাছে আশীর্বাদ বহন করে আন।"[১] আবার যজুর্বেদে আছে: "হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতা, পিতার মতই আমাদের উপদেশ দাও।"[২] বাইবেলের পুরাতন অংশে পিতৃপ্রতিমা ব্যবহৃত হয়েছে "পিতা যেমন পুত্রদের করুণা করে, সেই রকম যারা তাঁকে ভয় করে, ঈশ্বর তাদের করুণা করেন।"[৩] ঈশ্বরের পিতৃরূপ তো যীশুর উপদেশের মূল ধারণা।

৪৫। অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

(৪৫) আগে যা কেউ কখন দেখে নি তা দেখে আমি আনন্দিত কিন্তু আমার মন ভয়ে পীড়িত। অতএব হে দেব, হে দেবদেব, হে জগতের আশ্রয়, তুমি তোমার সেই অন্য (পূর্ব) রূপ আমাকে দেখাও।

যে ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্বরূপ কতক দিক দিয়ে ভয়ঙ্কর, ঈশ্বরের তাই একমাত্র রূপ নয়। ভীত মানবের পক্ষে সান্ত্বনাদায়ক সগুণ ঈশ্বরের ধ্যানমূর্তিও আছে। কৃষ্ণের সমগ্র সত্তাকে বিধ্বস্ত করে যে চোখধাঁধানো জ্যোতি ফুটেছে, অর্জুন তা সহ্য করতে পারছেন না, তাই আগেকার প্রসন্ন মূর্তি দেখতে চাচ্ছেন। জগতের পরেও যে শাশ্বত জ্যোতি প্রতিভাত তাই নিজের মধ্যেও আছে, তাই নিজের অন্তরের সখা ও গুরু।

৪৬। কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥

(৪৬) আমি তোমাকে আগের মতোই মুকুটধারী ও গদাচক্র হস্তে দেখতে চাই। হে সহস্রবাহু বিশ্বরূপ, তুমি এখন তোমার চতুর্ভুজ রূপ গ্রহণ কর।

১। প্রথম, ১, ৯
২। সপ্তত্রিংশৎ, ২০
৩। Psalm, ত্র্যধিক শততম, ১৩। অষ্টবিংশ, ৫ ও দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত। অর্জুন কৃষ্ণকে সেই বিষ্ণুর রূপ পরিগ্রহ করতে বলছেন।

ঈশ্বরের প্রসাদ ও আশ্বাস।

শ্রীভগবান উবাচ

৪৭। ময়াপ্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্ট পূর্বম্॥

শ্রীভগবান বললেন

(৪৭) হে অর্জুন, তুমি আমার প্রসন্নতায় ও আমার দিব্যশক্তিতে এই জ্যোতির্ময়, অনন্ত, আদি ও পরম বিশ্বরূপ দেখতে পেয়েছ, এর আগে আর কেউ এ দৃশ্য দেখে নি।

(বিশ্বরূপ দর্শন মানুষের সাধনার চরম লক্ষ্য নয়, তা যদি হ'ত গীতা এই-খানেই শেষ হয়ে যেত। এই ক্ষণিক দর্শন সাধকের চিরস্থায়ী অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হওয়া চাই। সমাধি ধর্মীয় জীবনের পরিণতিও নয়, অপরিহার্য উপাদানও নয়। দিব্যোন্মাদলব্ধ চোখধাঁধানো জ্যোতি সাধকের স্থায়ী প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। যে লোমহর্ষণ দৃশ্য অর্জুন দেখলেন তা অবশ্য তিনি আর ভুলতে পারবেন না কিন্তু সে অভিজ্ঞতাকে তাঁর জীবনে কাজে লাগাতে হবে। দর্শন শুধু খুলে দেয়, সে কোন কিছুকে প্রসারিত করে না। আমরা চোখে যা দেখি তাকে যেমন অন্য ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করি ও গ্রহণযোগ্য করি, তেমনি মুহূর্তের দর্শনলব্ধ জ্ঞানকে জীবনের অন্য উপাদান দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে।

৪৮। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

(৪৮) হে কুরুশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), তুমি ছাড়া নরলোকে আর কেউ আমাকে এই রূপে দেখতে সক্ষম হয় না। বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান বা কঠোর তপস্যা কিছু দিয়েই এ ক্ষমতা অর্জন করা যায় না।

৪৯। মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥

(৪৯) আমার এই প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে তুমি ভয় পেও না বা

হতবুদ্ধি হয়ো না। নির্ভয়ে ও প্রসন্ন মনে আমার (আগেকার) অন্য মূর্তি দেখ।

সঞ্জয় উবাচ

৫০। ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥

সঞ্জয় বললেন

(৫০) অর্জুনকে এই কথা বলে, বাসুদেব (কৃষ্ণ) তাঁর কাছে নিজ রূপ ধারণ করলেন। এইভাবে সেই মহাত্মা সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বাস দিলেন।

অর্জুন উবাচ

৫১। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

অর্জুন বললেন

(৫১) হে জনার্দন (কৃষ্ণ) তোমার সৌম্য মানুষী মূর্তি দেখে এখন আমি সংহতচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

শ্রীভগবান উবাচ

৫২। সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥

শ্রীভগবান বললেন

(৫২) আমার যে রূপ তুমি দেখলে তা দেখা খুব দুরূহ। এমন কি দেবতারাও সে রূপ দেখার জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব।

৫৩। নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥

(৫৩) তুমি যে রূপে আমাকে এখন দেখলে তা বেদপাঠ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞ দ্বারা দেখতে পেতে না।

এই শ্লোকটি ৪৮ সংখ্যক শ্লোকের পুনরাবৃত্তি।

৫৪। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

(৫৪) হে অর্জুন, হে শত্রুদমন, আমার প্রতি অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমার এই রূপ সত্য সত্য দর্শন করা যায়, আমাকে জানা যায় ও আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়।

শঙ্কর আদর্শ ভক্ত তাকেই বলেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।[১] সে সমগ্র আত্মা ও মন দিয়ে ভক্তি করে।[২] সাক্ষাৎকার বা দিব্যরূপ প্রত্যক্ষ করা প্রকৃত ভক্তের পক্ষেই সম্ভব।

৫৫। মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

(৫৫) হে পাণ্ডব (অর্জুন), যে আমার কাজ করে, যে আমাকে পরমগতি বলে স্থির করেছে, যে অন্য সব আকর্ষণ বর্জন করে আমার উপাসনা করে, যে কারুকেই শত্রু মনে করে না, সেই আমাকে পায়।

এই হ'ল ভক্তিতত্ত্বের সারমর্ম। দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকটি গীতার সমগ্র উপদেশের সারাংশ।[৩] আমাদের কর্ম করে যেতে হবে, কিন্তু ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণে রেখে এবং পার্থিব সমস্ত বস্তু সম্পর্কে কৌতূহল ও আসক্তি বর্জন করে, সমস্ত জীবের প্রতি বৈরিভাব থেকে মুক্ত হতে হবে।

আমাদের পেশা ও চরিত্র যাই হোক্, আমরা সৃজনধর্মী ভাবুকই হই বা ধ্যানমগ্ন কবিই হই বা কোন বিশেষ গুণবর্জিত সামান্য নরনারীই হই, আমরা যদি ঈশ্বরপ্রেমরূপ মহৎ বস্তুর অধিকারী হই, তা হলে আমরা ঈশ্বরের যন্ত্র হব, আমাদের মাধ্যমেই তাঁর প্রীতি প্রবাহিত হবে ও সংকল্প সিদ্ধ হবে। জীবাত্মার এই বিশাল জগৎ যখন ঈশ্বরের সুরে বাজবে এবং তাঁর সংকল্পসিদ্ধির জন্যই জীবননির্বাহ করবে, তখনই মনুষ্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

স্বর্গীয় দৃশ্যের মহতী অভিজ্ঞতার পর গীতা ফুরিয়ে যায় নি। তৃতীয়

১। সর্বৈরপি করণৈঃ বাসুদেবাদন্যন্ নোপলভ্যতে যয়া সা অনন্যা ভক্তিঃ।

২। মদ্ভক্তঃ মামেব সর্বপ্রকারৈঃ, সর্বাত্মনা, সর্বোৎসাহেন ভজতে। ইতি শঙ্কর

৩। গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থঃ।

আত্মার মহান্ রহস্য, সকল অস্তিত্বের উৎস অথচ নিজে চিরকাল অবিচল, তাঁকে দেখা হ'ল। সান্ত বস্তুর অনন্ত প্রবাহের পশ্চাদপট সর্বেশ্বর। অর্জুন সত্যকে দেখেছেন, কিন্তু তাঁকে নিজের জীবনে সত্যকে সিদ্ধ করতে হবে, তাঁকে তাঁর সমগ্র প্রকৃতিকে ঈশ্বরের স্বেচ্ছাবরণের দ্বারা রূপান্তরিত করতে হবে। ক্ষণিক দর্শন যত স্পষ্টই হোক, তার ফল যতই স্থায়ী হোক, তা পরিপূর্ণ সিদ্ধি নয়। স্থায়ী সত্তার, চরম সত্যের সন্ধান আবেগ তৃপ্তি বা ক্ষণিক অভিজ্ঞতার মধ্যে শেষ হতে পারে না।

ইতি·········বিশ্বরূপদর্শন যোগ নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বরূপ দর্শন নামক একাদশ অধ্যায়ের এইখানেই শেষ।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরম ব্রহ্মের ধ্যানের অপেক্ষা সগুণ ঈশ্বরের পূজা ভাল

ভক্তি ও ধ্যান

অর্জুন উবাচ

১। এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

অর্জুন বললেন

(১) যে ভক্তরা সতত আন্তরিকতার সঙ্গে তোমার পূজা করে, আর যারা অক্ষর (অবিনশ্বর) ও অব্যক্তের (উপাসনা করে) তাদের মধ্যে যোগ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কাদের বেশী ?

এমন লোক আছে যারা বিশ্বসম্পর্কবর্জিত, নির্গুণ, অদ্বিতীয় পরমের মধ্যে বিলীন হতে চায় ; আবার এমন লোকও আছে যারা মানুষ ও প্রকৃতির জগতে যে সাকার সগুণ ঈশ্বর প্রকট হন, তাঁর সঙ্গে সাযুজ্য চায়। এদের মধ্যে যোগের জ্ঞান কাদের বেশী ? আমরা কি সমস্ত অভিব্যক্তিকে বর্জন করে অব্যয় অব্যক্তকে পাবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করব, না প্রকট মূর্তির ভক্ত হয়ে তাঁরই সেবা করব ? বিমূর্ত পরম বা সগুণ, ব্রহ্ম না ঈশ্বর—কার উপাসনা করব ?

শ্রীভগবান উবাচ

২। ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্য যুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

শ্রীভগবান বললেন

(২) যারা আমার প্রতি মন সন্নিবিষ্ট করে সতত আন্তরিকতার সঙ্গে ও পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার উপাসনা করে তাদেরই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলে মনে করি।

এখানে উপদেষ্টা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করছেন যে যারা ঈশ্বরের সগুণ আকারের উপাসনা করে, তাদের যোগের জ্ঞান বেশী।

উপাসনা মানে অর্চনা।[১]

৩। যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্‌॥

(৩) কিন্তু যারা অক্ষয়, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, অচ্যুত, অচল ও ধ্রুবের উপাসনা করে—

৪। সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ॥

(৪) সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, সর্বাবস্থায় সমবুদ্ধি হয়ে সর্বভূতের কল্যাণে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে, তারাও আমাকে প্রাপ্ত হয় (অন্যদের মতই)।

সংনিয়ম্য—সংযত করে। আমাদের ইন্দ্রিয়দের সংযত করতে বলা হচ্ছে, তাদের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার কথা নেই।

সর্বভূত হিতে রতাঃ—সকল জীবের কল্যাণে অনুরক্ত।

যাঁরা বিশ্বাত্মার সঙ্গে সাম্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁরাও যতদিন দেহ ধারণ করে থাকবেন ততদিন জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাবেন। পঞ্চম অধ্যায়ের ২৫ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে মোক্ষলব্ধেরাও সকল জীবের কল্যাণে হৃষ্ট হন।

এখানে মানুষের সেবাকে সাধনার এক সারাংশ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। মহাভারতে এই প্রার্থনাটি আছে : "কে আমাকে সেই পবিত্র পন্থা দেখিয়ে দেবে যা দিয়ে আমি সমস্ত সন্তপ্ত আত্মায় প্রবেশ করতে পারব এবং তাদের সন্তাপ বর্তমানে ও চিরকালের জন্য নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারব ?"

তুকারামের উক্তিও এখানে তুলনীয় :—

সেই খাঁটি মানুষ যে দুর্গতদের বুকে টেনে নিতে পারে।
এ রকম লোকের মধ্যে
স্বয়ং ভগবানের
মহিমময় অবস্থিতি হয় ;

১। উপাসনা অবিচ্ছিন্ন ধ্যান। শঙ্করাচার্য বলেছেন : "উপাসনং নাম যথা শাস্ত্রমুপাস্যস্য অর্থস্য বিষয়ী করণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলাধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেন দীর্ঘকালং যদাসনম্‌, তদুপাসনমাচক্ষতে।

অনুকম্পা, শান্তি ও প্রীতি দ্বারা
এ রকম লোকের হৃদয় সর্বদা কানায় কানায় পূর্ণ থাকে,
সে তাদের নিজের করে নেয়।[১]

৫। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

(৫) যাদের মন অব্যক্ততে নিবিষ্ট তাদের কষ্ট বেশী, কেননা দেহধারীদের পক্ষে অব্যক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন।

যে সজীব সর্বেশ্বর সকল বস্তু ও ব্যক্তির আত্মায় অধিষ্ঠিত তাঁর উপাসনার অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াতীত তুরীয় ঐশীভাবের সন্ধান কঠিনতর। অবধূত গীতায় দত্তাত্রেয় জিজ্ঞাসা করেন: "যিনি নিরাকার, অবিভেদ্য, আনন্দস্বরূপ এবং অবিনাশী, যিনি নিজের মধ্যে নিজের দ্বারা এবং নিজেই সর্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত, তাঁকে আমি কি করে বন্দনা করব?"[২] অব্যয় মনের কাছে সহজে ধরা দেয় না, কাজেই পথটা দুরূহতর। সাকার ঈশ্বরকে ভক্তির পথ, যাতে আমাদের সমগ্র শক্তি, জ্ঞান, সংকল্প ও অনুভূতি ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তা দিয়ে সেই লক্ষ্যেই সহজে ও স্বাভাবিকভাবে আমরা পৌঁছতে পারি। যথা "ধ্যানমগ্ন মনে অতীন্দ্রিয়বাদীরা যদি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় জ্যোতি দেখতে পান তো তাঁরা দেখুন। আমার একমাত্র বাসনা যে যমুনাকূলবিহারী নীল মূর্তি আমার প্রফুল্ল দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হন।[৩]

বিভিন্ন পন্থা

৬। যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

১। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী "কারাগারের গীত" (১৯৩৪), ১২৯ পৃষ্ঠা।

২। যেনেদং পূরিতং সর্বমাত্মনৈবাত্মনাত্মনি।
নিরাকারং কথং বন্দে অভিন্নং শিবমব্যয়ম্‌।

দামাস্কাসের সেন্ট জনের উক্তি স্মরণীয়: "আধ্যাত্মিক অভিযানে আমাদের চিন্তাকে দৃশ্যভাব থেকে ঈশ্বরের অদৃশ্য মহিমায় উন্নীত করতে হবে।"

৩। ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ম্‌
জ্যোতিঃকিঞ্চন যোগিনো যদি পুনঃ পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরম্‌
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং তমো ধাবতি ॥

(৬) কিন্তু যারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, আমাতে সমাহিত চিত্ত হয়ে, আমার ধ্যানে মগ্ন হয়ে, ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা আমার উপাসনা করে—

৭। তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

(৭) যাদের মন আমাতে আবিষ্ট, তাদের হে পার্থ (অর্জুন), আমি সোজাসুজি এই মর ভবসাগর থেকে উদ্ধার করি।

ঈশ্বরই ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা। যখন আমাদের মন ও হৃদয় তাঁকে অর্পণ করি তখন তিনি আমাদের মৃত্যুসমুদ্র থেকে উদ্ধার করে চিরন্তনে স্থান দেন। যার মনে স্বভাববৈরাগ্য নেই, তার পক্ষে ভক্তির পথই বেশী উপযুক্ত। ভাগবতে আছে: "যে খুব বেশী পরিশ্রান্ত নয়, বা যে সংসারে খুব আসক্ত নয়, তার পক্ষে ভক্তিমার্গই সব থেকে প্রশস্ত।"[১] প্রবৃত্তিধর্ম বা কর্মের পথ, অথবা নিবৃত্তিধর্ম বা সন্ন্যাসের পথ কোন্‌টা নেওয়া হবে সেটা নিজ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

৮। ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥

(৮) আমাতেই তোমার মন লগ্ন কর, তোমার বুদ্ধি আমাতেই নিবিষ্ট হোক। তারপর আমাতেই তুমি বাস করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৯। অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥

(৯) তবে হে ধনঞ্জয়, তুমি যদি তোমার মন আমাতে স্থিরভাবে সংলগ্ন না করতে পার, তাহলে যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে পাবার সাধনা কর।

এই আধ্যাত্মিক অবস্থা যদি স্বতঃ না জাগে, তবে আমাদের একাগ্রতার অভ্যাস করতে হবে, যাতে আমাদের ভাবনাকে স্থিরভাবে ঈশ্বরে নিয়োজিত করবার ক্রমে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি। এই অভ্যাসের দ্বারা আমাদের প্রকৃতি ক্রমশঃ দিব্যের আয়ত্তে আসে।

১। ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ। একাদশঃ ২০,৮।

১০। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥

(১০) অভ্যাস দ্বারা সাধনা করতেও যদি অক্ষম হও, তবে আমার সেবাই তোমার পরম লক্ষ্য হোক্। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।

মনের বহির্মুখী প্রবণতার জন্য বা অবস্থাগতিকে যদি মনকে একাগ্র করা কঠিন হয়, তবে আমাদের সমস্ত কর্ম ঈশ্বরোদ্দেশ্যে করতে হবে। এই ভাবেই সে ব্যক্তি শাশ্বত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়।

"মৎকর্ম" কখনও কখনও ঈশ্বরের সেবা বলে ধরা হয়, পূজা, ফলপুষ্প নিবেদন, ধূপদীপ জ্বালানো, মন্দির নির্মাণ করা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি।[১]

১১। অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥

(১১) তুমি যদি তাও না পার, তবে আমার যোগের আশ্রয় নাও, নিজেকে সংযত করে, সর্ব কর্মফলের আশা ত্যাগ কর।

মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ—আমার আশ্চর্যশক্তির আশ্রয় নাও। ইতি শ্রীধরাচার্য।

যদি তোমার সমস্ত কর্ম ভগবানে না নিবেদন করতে পার তো কর্মফলে আসক্তি বর্জন করে কর্মে প্রবৃত্ত হও। নিষ্কাম কর্মরূপ যোগ অভ্যাস কর। আমরা আমাদের সকল প্রকার ব্যক্তিগত প্রয়াস বর্জন করে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ও একান্তভাবে ঈশ্বরের উদ্ধারকারী শক্তির কাছে সমর্পণ করতে পারি। আত্মসংযমে অভ্যস্ত হতে পারি ও কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারি, সমস্ত প্রকার ফলের চিন্তা ত্যাগ করতে পারি। ঈশ্বরের হাতে নিজেকে শিশুর মত মনে করতে হবে।

১২। শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥

(১২) (একাগ্রতার) অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, আর ত্যাগেই সঙ্গে সঙ্গে শান্তি আসে।

১। অভিনব গুপ্তের মতে "মৎকর্মাণি" অর্থে "ভগবৎকর্মাণি" যথা পূজা, জপ, স্বাধ্যায়, হোম ইত্যাদি বোঝাচ্ছে।

শ্রীধরাচার্য জ্ঞানের অর্থ আবেশ বা ঈশ্বরের দিকে মন সন্নিবেশ ধরেছেন আর ধ্যানের অর্থ সর্বদা ভগবানের সম্বন্ধে পূর্ণ হয়ে থাকা "ভগবন্ময়ত্বম্" এবং তার সম্পূর্ণতা হয় যখন ঈশ্বর নিজে আত্মার অধিকারে আসে। সূর্যগীতায় আছে: "ভক্তি জ্ঞানের থেকে ভাল আর নিষ্কাম কর্ম ভক্তির চেয়ে ভাল। যে বেদান্তের এই তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে সেই উত্তম মানুষ।[১] ভক্তি, ধ্যান ও একাগ্রতা কর্মফল ত্যাগের চেয়ে কঠিনতর। কর্মফল ত্যাগ অস্থিরতার উৎসই নষ্ট করে দেয় এবং আন্তরিক স্থৈর্য ও শান্তি আনে। আর তাই হ'ল আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ভিত্তি। ভক্তির আশ্রয় নিলে ভক্তের মনে, ধ্যান ও জ্ঞান ভক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হয় এবং সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে নিবেদিত হয়।

প্রকৃত ভক্ত

১৩। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥

(১৩) যার কারুর উপর দ্বেষ নেই, যে মৈত্রীভাবাপন্ন ও দয়ালু, নিরহঙ্কার ও মায়াবর্জিত, সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন এবং ধৈর্যশীল—

১৪। সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

(১৪) যে যোগী সদা সন্তুষ্ট, সংযত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যার মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পিত, সেইরূপ আমার ভক্তই আমার প্রিয়।

এই শ্লোক দুটিতে গীতা খাঁটি ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন, ভাবমুক্তি, সকলের প্রতি মৈত্রীভাব, ধৈর্য ও প্রশান্তি।

১৫। যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্ নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

(১৫) যার সম্বন্ধে জগৎ কুণ্ঠিত হয় না এবং যে জগৎকে কুণ্ঠা করে না, যে হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগহীন, সে-ও আমার প্রিয়।

সে কারুর ক্ষোভের কারণ হয় না, এবং কেউই তাকে ক্ষুব্ধ করতে পারে না।

১। জ্ঞানাদুপাস্তিরুৎকৃষ্টা কর্মোৎকৃষ্টমুপাসনাৎ।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ স এব পুরুষোত্তমঃ ॥১১৪, ৭৭।

১৬। অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

(১৬) যে প্রত্যাশা করে না, শুদ্ধ ও কর্মদক্ষ, নিরাসক্ত ও নির্বেদরহিত এবং (কর্মে) সর্বপ্রকার নবপ্রবর্তন ত্যাগী, আমার সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

সে তার সকল কর্মফলের প্রত্যাশা বর্জন করেছে। তার কর্ম পটু (দক্ষ), পবিত্র ও ভাবাবেগ-বর্জিত। সে নিজেকে বৃথা চিন্তায় বা স্বপ্নে বিভোর করে না কিন্তু সংসারের চালচলন জানে।

১৭। যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

(১৭) যে স্ফূর্তিও করে না, হিংসাও করে না, শোকও করে না, কামনাও করে না, যে শুভাশুভ বর্জন করেছে, যে আমার এইরকম ভক্ত, সেই আমার প্রিয়।

১৮। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।

(১৮) যে শত্রু ও মিত্রের সঙ্গে সম (আচরণ করে), এবং মান-অপমান সমান জ্ঞান করে, যে শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখে অবিচলিত থাকে ও যে অনাসক্ত।

সম শত্রৌ চ মিত্রে চ—যীশুর উক্তি তুলনীয় "তিনি সূর্যকে শুভাশুভের উপর আলো দিতে দেন ও ন্যায়-অন্যায়কারী উভয়েরই উপর বর্ষণ করেন।"[১]

১৯। তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ ॥

(১৯) যে নিন্দাস্তুতিকে সমান মনে করে যে মৌনী (সংযতবাক্), (যা আসে) তাতেই সন্তুষ্ট, যার স্থির বাসস্থান নেই এবং যে স্থিরচিত্ত সেই রকম ভক্তই আমার প্রিয়।

অনিকেতঃ—গৃহহীন। যদিও সে সমস্ত সামাজিক কর্তব্য পালন করে, তার পরিবার বা গৃহের বন্ধন নেই। এইরকম লোকেরা নিজ পরিবার বা বিশেষ কোন সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করে না, তারা সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণার্থেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়, কাজেই তাদের কোন নির্দিষ্ট নিবাস

১। ম্যাথিউ, পঞ্চম, ৪৫।

নেই। যেখানেই কাজের প্রেরণা আসে সেখানেই তারা স্বচ্ছন্দে চলে যায়। কোন বিশেষ স্থানে বা বিশেষ সমাজে তারা আবদ্ধ হয়। তারা অতীতে রত নয় বা অনড় বিধিকে সমর্থন করায়ও তাদের বাধ্যবাধকতা নেই। সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণই তাদের সদা ব্রত। এরকম সন্ন্যাসীরা যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীতে আবির্ভূত হতে পারে। মহাভারতে আছে: "যে কোন বস্ত্র যে পরে থাকে, যে কোন খাদ্য যে খেতে পারে, যেখানে সেখানে যে শুয়ে থাকতে পারে তাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন।[১]

২০। যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

(২০) যে শ্রদ্ধাবান ভক্তেরা আমাকে পরমগতি জেনে এই অমর জ্ঞান অনুসরণ করে তারা আমার অতিশয় প্রিয়।

শ্রদ্দধান—(যাদের) শ্রদ্ধা আছে। অধ্যাত্মীয় অভিজ্ঞতার পক্ষে আত্মার শ্রদ্ধা থাকা অপরিহার্য। শ্রদ্ধা থাকলে তবেই প্রাণমনের সমর্থন থাকে। যাদের অভিজ্ঞা হয়েছে, তাদের দর্শনের ব্যাপার, অন্যদের পক্ষে সেটা শ্রদ্ধা, একটা বাধ্যতা বা আবাহন।

যখন সেই এক আত্মকে সকল বস্তুতে দেখি, তখন চিত্তসাম্য, স্বার্থকামনা থেকে মুক্তি, অন্তরাত্মার কাছে সমগ্র প্রকৃতির সমর্পণ ও সকলের প্রতি প্রেম আসে। এই সব গুণের উদয় হলে আমাদের ভক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় এবং আমরা ভাগবত হই। তখন আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মৈত্রী ও বৈরিতা, সুখ, দুঃখ আর আমাদের কর্মের নিয়ন্তা থাকে না। আমরা তখন ঈশ্বরে সমর্পণের একমাত্র আবেগ দ্বারা চালিত হই, এবং তাতে আমরা জগতের সেবায়ই নিয়োজিত হই, কেননা জগৎ ও ভগবান অভিন্ন।[২]

১। যেন কেনচিদাচ্ছন্নো, যেন কেনচিদাসিতঃ
যত্র ক্বচন শায়ী স্যাৎ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ। শান্তিপর্ব, ২৪৫, ১২।
বায়ুপুরাণের তৃতীয়, ৭,২০ ও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
ন চলতি নিজ বর্ণ ধর্ম তো যঃ সমমতিঃ আত্ম সুহৃদ্ বিপক্ষ পক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ সিত মনসম্ তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥

২। তুলসীদাসের কথায়—
"হে প্রভু, তোমার প্রসাদে আমাকে বর দাও
যাতে আমি শুভ ও শুদ্ধকে অনুসরণ করতে পারি,

সামান্য বস্তুতে সন্তুষ্ট হতে পারি,
আমার সহযোগীদের যেন লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারি, উপায় হিসাবে নয়।
তাদের যেন কায়মনোবাক্যে সেবা করতে পারি,
কখনও যেন ঘৃণা বা লজ্জাজনক কথা না বলি,
সমস্ত স্বার্থপরতা ও গর্ব যেন বর্জন করতে পারি,
কারুর নিন্দা না করি,
মন যেন শান্ত থাকে ও নিরুদ্বিগ্ন থাকে
সুখ-দুঃখ দ্বারা তোমা থেকে দূরে যেন না যাই,
এইরকম পথে আমাকে চালাও
এবং সেই পথ থেকে যাতে ভ্রষ্ট না হই তাই করো,
এইভাবেই আমি তোমাকে খুশী করব এবং তোমার যথার্থ সেবা করব।
মহাত্মা গান্ধী—কারাগারের গান (১৯৩৪) ৫২ পৃষ্ঠা।

ইতি······ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।
ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের এইখানে শেষ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেহরূপ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ও তাদের পার্থক্য নির্ণয়

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥

অর্জুন বললেন

হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এদের সম্বন্ধে আমি জানতে চাই।

কোন কোন সংস্করণে এই শ্লোকটি দেখা যায় না। শঙ্কর ভাষ্যে এর উল্লেখ নেই। এই শ্লোকটি ধরলে ভগবদ্গীতার শ্লোকসংখ্যা হয় ৭০১, অথচ সাধারণতঃ শ্লোকসংখ্যা ৭০০ বলে ধরা হয়। এই সংখ্যাই প্রচলিত, সেইজন্য এখানে এই শ্লোকের কোন সংখ্যা দেওয়া হ'ল না।

শ্রীভগবান উবাচ

১। ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ ॥

শ্রীভগবান বললেন

(১) হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), এই দেহকে ক্ষেত্র বলে এবং এই বিষয়ে পারদর্শীরা, দেহকে ক্ষেত্র বলে যে জানে তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।

অচেতন ক্রিয়া প্রকৃতি আর নিষ্ক্রিয় চেতনা পুরুষ। দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় কেননা সেখানে ঘটনাসমূহ ঘটে; সব বৃদ্ধি, অবনতি ও মৃত্যু দেহতেই ঘটে। যে নিষ্ক্রিয় ও বিচ্ছিন্ন চৈতন্য সমস্ত সক্রিয় অবস্থার অন্তরালে সাক্ষী স্বরূপ থাকে, তাই ক্ষেত্রজ্ঞ। চেতনা ও চেতনার পর্যবেক্ষণের বিষয়ের মধ্যে এই হল সুপরিচিত পার্থক্য। ক্ষেত্রজ্ঞ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা, সচেতনতার দীপ্তি।[১] প্রাতিস্বিক দেহী মন এই সাক্ষী নয়। যে ব্রহ্মাণ্ডচেতনার কাছে

১। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ, ১৬ ও মৈত্রায়নী উপনিষদের দ্বিতীয় ৫, দ্রষ্টব্য।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণের বিষয়, তার কথাই বলা হচ্ছে। সে শান্ত ও শাশ্বত এবং তার পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যবহার প্রয়োজন হয় না।

ক্ষেত্রজ্ঞ সর্বেশ্বর, তিনি কোন পার্থিব বিষয় নন। তিনি সর্ব ক্ষেত্রে বিরাজমান, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে একটি তৃণ গুচ্ছে পর্যন্ত ; বিভেদ শুধু সীমাস্থ শর্তে ; যদিও তিনি নিজে অসীম ও তাঁর উপাধি ভেদ অনির্দেশ্য।[১] এই অব্যয় চেতনাকে যে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয় সে শুধু লক্ষ্যার্থে (উপচারাৎ)।

মানবাত্মার স্বরূপ বোঝার যখন চেষ্টা করি, তখন উপর দিক দিয়েও জানতে পারি, নীচের দিক দিয়েও জানতে পারি, দৈবী ভাবের ভিত্তিতে জানতে পারি বা মূল প্রাকৃতিক উপাদানের দিক থেকে দেখতে পারি। মানুষের বিসংবাদী দুই রূপ, মুক্ত ও বদ্ধ। সে দেবোপম আবার তার মধ্যেই পতন অর্থাৎ প্রকৃতিতে অবতরণের লক্ষণ বর্তমান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সে মৌলিক প্রাকৃতিক শক্তি, ইন্দ্রিয়জ আবেগ, ভয় ও উদ্বেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মানুষ তার অধঃপতিত প্রকৃতিকে জয় করতে চায়। জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা বা সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বৈষয়িক বিজ্ঞান দ্বারা অধীত মানুষ এক প্রাকৃতিক অস্তিত্ব, সে পার্থিব প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত। কিন্তু বিষয়ী মানুষের মূল অন্যত্র। সে পৃথিবীসঞ্জাত নয়। সে প্রকৃতি নয়। প্রকৃতির বস্তু-তান্ত্রিক অধিকারীপরম্পরার অধীন অংশে তার স্থান নেই। পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম বিষয় বা বস্তু বলে ধরা চলে না। তাঁকে শুধু বিষয়ী বলেই ধরতে হবে, যাঁর মধ্যে অস্তিত্বের রহস্য গুপ্ত হয়ে আছে, যিনি ব্যক্তির আকারে সম্পূর্ণ বিশ্বের সম্ভাবনাকে ধারণ করে আছেন। কাজেই তিনি জগতের বা অন্য কোন সমগ্র বস্তুর অংশ নন। প্রয়োগজ সত্তা রূপে তাকে লাইবনিৎসের মোনাড রূপে ভাবা যায়, দরজা-জানালা না থেকেও বদ্ধ ও আবদ্ধ। কিন্তু বিষয়ী রূপে তিনি অনন্তে প্রবিষ্ট এবং অনন্তও তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট। ক্ষেত্রজ্ঞ সার্বিক, বিশিষ্ট আকারে তাঁর পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। মানুষের মধ্যে সার্বিক অনন্তের সঙ্গে সার্বিক বিশিষ্টের সম্মেলন।

১। ক্ষেত্রজ্ঞং মাং পরমেশ্বরমসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি সর্বক্ষেত্রেষু যঃ। ক্ষেত্রজ্ঞঃ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যন্তানেক ক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তং তং নিরস্ত সর্বোপাধি ভেদং সদসদাদি শব্দ প্রত্যয়গোচরং বিদ্ধি। ইতি শঙ্করাচার্য।

বিষয়ীভাবে সে সমগ্রের অংশমাত্র নয়, সম্ভাব্য সমগ্র। তাকে বাস্তবে পরিণত করা, বিশ্বজনীনতায় সিদ্ধ হওয়াই মানুষের আদর্শ। বিষয়ী নিজেকে সার্বিক আধেয় দ্বারা পূর্ণ করে—যাত্রাশেষে সমগ্রতার সঙ্গে ঐক্যে সিদ্ধিলাভ করে। দুটো হাত আছে, দুটো চোখ আছে, এই সাধারণ ধাঁচ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়, যে অন্তর্লীন ভাব দ্বারা চালিত হয়ে জীবনের গুণগত আধেয়কে সৃজনীমূলকভাবে অর্জন করতে তাকে বাধ্য করে সেইটাই তার বৈশিষ্ট্য। তার এক অনন্য গুণ আছে যা অসাধারণ। আদর্শ অস্মিতা অনন্য ও অনাবৃত্ত্য। যাত্রাশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র, অনাবৃত্ত্য, অপর কিছু দ্বারা অপূরণীয়, অনন্য আকারের সত্তায় পরিণত হয়।

২। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌ জ্ঞানং মতং মম॥

(২) হে ভারত (অর্জুন), আমাকে সর্বক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান।

শঙ্করাচার্যের মতে পরমেশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির জন্য সংসারী বলে মনে হয় যেমন দেহের সঙ্গে অভিন্নতার জন্য জীবাত্মাকে বদ্ধ বলে মনে হয়।[১] খৃষ্টীয় মতে মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি আছে তা ভুলে গিয়েই মানুষের অধঃপতন। সেই প্রতিকৃতিই মুক্তি। বাহ্য প্রয়োজনে ভ্রষ্ট হওয়া অধঃপতন। মানুষ আসলে প্রকৃতির অংশ নয়, তাকে প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতার ভাবগত ছেদ বলে ধরা যায়।

৩। তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥

(৩) ক্ষেত্র কি, তার প্রকৃতি কি, তার কি কি বিকার, কোথা থেকে আসে, সে (ক্ষেত্রজ্ঞ) কি এবং তার ক্ষমতা কি, এই সব সংক্ষেপে বলব, শোন।

ক্ষেত্রের উপাদান

৪। ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

১। তত্রৈবং সতি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্যৈব সতোঽবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি যথা দেহাদ্যাত্মত্বমাত্মনঃ।

(৪) এ কথা ঋষিরা বহুভাবে গেয়েছেন, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছন্দে ব্যক্ত হয়েছে আবার ব্রহ্মসূত্রে যুক্তিসঙ্গত ও সুমীমাংসিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

গীতায় এই অংশ পড়ে মনে হয়, যে সত্য বেদ, উপনিষদে প্রচারিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে বাদরায়ণ কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রে সুসম্বদ্ধ হয়েছে, তাই এখানে ব্যাখ্যাত হচ্ছে। বৈদিক স্তোত্রকে ছন্দঃ নামে অভিহিত করা হয়।

৫। মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥

(৫) মহা (পঞ্চস্থূল) ভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় গোচর বিষয়—

ক্ষেত্রের এইগুলি উপাদান, অভিজ্ঞার আধেয়, সাংখ্য সম্প্রদায়ের চব্বিশ সার ভাব। মানসিক ও জড় বিষয়ক পার্থক্য বিষয়ের দিকে, "ক্ষেত্রের" মধ্যেই সেই সব ভেদ।

দেহ এবং যে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা বিষয়ীকে উপলব্ধি করতে পারি তা হল বিষয়ের দিকের। সজ্ঞাত অভিজ্ঞার সারাংশ নিয়ে অপ্রাকৃত সংগঠন হ'ল অহং। নীল আকাশই হোক আর লাল ফুলই হোক, যে সংবিৎ তা দেখে তা অভিন্ন। যে ক্ষেত্রে আলোকসম্পাত হচ্ছে, তা ভিন্ন হলেও, আলোক একই।

৬। ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

(৬) বাসনা ও ঘৃণা, সুখদুঃখ, সমষ্টি (জীবাঙ্গ), বুদ্ধি ও ধৈর্য, এই হ'ল সংক্ষেপে ক্ষেত্র ও তার বিকারসমূহ।

মানসিক বিশেষত্বগুলিও ক্ষেত্রের গুণ বলে বর্ণিত হয়েছে কেননা তারা জ্ঞাতব্য।

জ্ঞাতা বিষয়ী, তাঁকে বিষয় বা বস্তুতে রূপান্তরিত করা মানেই অজ্ঞতা অর্থাৎ অবিদ্যা। বিষয়ীকে বিষয়ের জগতে প্রক্ষিপ্ত করা মানে বিষয়ীভূত করা। বিষয়ীভূত জগতের কিছুই খাঁটি সত্য নয়। বিষয়ীকে উপলব্ধি করতে হলে বৈষয়িক জগতের বন্ধনকারী শক্তিকে পরাভূত করতে হবে, তাতে দ্রবীভূত হওয়া প্রতিরোধ করতে হবে। তার মানেই বিরোধ ও যন্ত্রণা। পারিপার্শ্বিক জগৎ ও তার প্রচলনগুলিকে মেনে নিতে পারলে যন্ত্রণা কমে,

অস্বীকার করলে যন্ত্রণা বাড়ে। সন্তাপের মধ্য দিয়েই আমাদের আসল প্রকৃতির জন্য সংগ্রাম করতে হয়।

প্রজ্ঞা

৭। অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥

(৭) নম্রতা (দম্ভের অভাব), সাধুতা (প্রতারণা না করা), অহিংসা, ধৈর্য, সরলতা, গুরুসেবা, শুচিতা (দেহের ও মনের), স্থৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ—

৮। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥

(৮) ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখ ইত্যাদির দোষ অনুধাবন।

৯। আসক্তিরণভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥

(৯) অনাসক্তি, পুত্র, দারা, গৃহ ইত্যাদিতে অত্যধিক মায়া না থাকা, ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়তেই সর্বদা সমভাব—

১০। ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥

(১০) আমাতে ঐকান্তিক ও অচলাভক্তি, নির্জন স্থানে বাস ও জনতা সমাগমে বিতৃষ্ণা—

১১। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

(১১) অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি—এদেরই (প্রকৃত) জ্ঞান বলে, এ ছাড়া বাকী সব অজ্ঞান।

যে গুণাবলীর বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে জ্ঞানের মধ্যে নৈতিক আচরণও পড়ে। শুধু তাত্ত্বিক বিদ্যা যথেষ্ট নয়।[১] নৈতিক গুণ সকলের উন্মেষ দ্বারাই নিত্য অব্যয় সর্বদ্রষ্টা কিন্তু সর্ব

১। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন। কঠোপনিষদ, দ্বিতীয় ২২; মুণ্ডক উপনিষদ, তৃতীয়, ২-৩।

সম্পর্করহিত পুরুষ থেকে অনিত্য আকারকে পৃথক করা যায়, এবং তাদের দ্বারা বিমূঢ় হবার সম্ভাবনা থাকে না।

১২। জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥

(১২) আমি যা জ্ঞাতব্য তাই তোমাকে বলব, তা জেনে অমরত্ব প্রাপ্তি হয়। পরম ব্রহ্মই অনাদি ও তিনি সৎ (স্থিত)-ও নন, অসৎ (অস্থিত)-ও নন, এইরূপ বলা হয়।

অনাদিমৎ পরম্—যে পরমের আদি নেই। ইতি শঙ্করাচার্য।

অনাদি মৎপরম্—যাঁর আদি নেই এবং যিনি আমা দ্বারা শাসিত। ইতি রামানুজাচার্য।

অস্তিত্ব ও বিলুপ্তির প্রয়োগজ দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে যে শাশ্বত, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত এবং সে কথা উপলব্ধি করলে জীবন মৃত্যু বাহ্য ঘটনামাত্র বলে বোঝা যাবে, আত্মের নিত্যতার উপর তার কোন প্রভাব নেই।

ক্ষেত্রজ্ঞ

১৩। সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

(১৩) হাত পা সর্বত্র বিরাজিত, সর্বদিকে চোখ, মুখ ও মাথা, সমস্ত দিকে কান রেখে, তিনি সকলকে আবৃত করে জগতে বিরাজমান।

সমস্ত অভিজ্ঞতার বিষয়ের একমাত্র বিষয়ীরূপে তিনি সকলকে আচ্ছন্ন করে আছেন এবং তাঁর হাত পা চোখ কান সর্বত্র আছে, এই ভাবে বলা হচ্ছে। ব্রহ্মের দুই ভাব আছে, এক অতীন্দ্রিয় ও বিচ্ছিন্ন এবং আর অন্য ভাব সর্বব্যাপী, প্রত্যেক অনাত্মের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, কাজেই তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর অসঙ্গত শব্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তিনি অন্তরে আবার বাহিরে, অচল আবার সচল, নিকট আবার দূর, অবিভক্ত আবার বিভক্ত। মহাভারতে বলা হয়েছে যে আত্ম যখন প্রকৃতির গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়, আর যখন সে এই সব থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে পরমাত্মা বলে।[১]

১। আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত॥ শান্তিপর্ব, ১৮৭, ২৪।

১৪। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

(১৪) সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ তাতে বিদ্যমান বলে মনে হয় কিন্তু তাঁর (কোন) ইন্দ্রিয় নেই, কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই অথচ সকলকে ধারণ করে আছেন, গুণ (প্রকৃতির ভাব) বর্জিত অথচ তাদের ফলভোগ করেন।

এই শ্লোকে যা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে মনে হয় ব্রহ্ম বিকারী আবার নির্বিকার, সর্ব অথচ অদ্বিতীয়। তিনি সবই দেখেন কিন্তু ভৌত চক্ষু দিয়ে নয়। সবই শোনেন কিন্তু ভৌত কান দিয়ে নয়। সবই জানেন কিন্তু সসীম মন দিয়ে নয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় ১৯ সংখ্যক শ্লোকে আছে: "তিনি চোখের সাহায্য না নিয়ে দেখেন, কানের সাহায্য না নিয়ে শোনেন"। গুণভূষিত (অধ্যারোপ) করে ও তা বর্জিত বলে (অপবাদ) ব্রহ্মের বিরাটত্বের আভাস দেওয়া হয়েছে।

১৫। বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

(১৫) তিনি সর্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে। তিনি সচল ও অচল এত সূক্ষ্ম যে অজ্ঞেয়। তিনি দূর অথচ নিকটে।

১৬। অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

(১৬) তিনি অবিভক্ত (অবিভাজ্য) অথচ তাকে জীবের মধ্যে বিভক্ত রূপে দেখা যায়। তাঁকে সৃষ্টির পালনকারী, বিনাশকারী আর পুনঃ সৃজনকারী বলে জানতে হবে।

দায়োনিসিয়ুস (Dionysius)-এর উক্তি তুলনীয় "সমস্ত বিভক্ত বস্তুতে অবিভক্ত"। সকল বস্তু তাঁর থেকে উদ্ভূত এবং সকলই তাঁর দ্বারা পালিত আবার তাঁতেই লুপ্ত।

১৭। জ্যোতিষামপি তজ্‌জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

(১৭) তিনি আলোকের আলোক, তাঁকে অন্ধকারের অতীত বলে বর্ণনা করা হয়। তিনিই জ্ঞান আবার জ্ঞানের বিষয় ও লক্ষ্য। তিনি সকলের অন্তরে বাস করেন।

সকলের অন্তরেই আলো আছে। এই বাক্যগুলির অনেকগুলি উপনিষদ

থেকে উদ্ধৃত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয়, ৮ ও ১৬, ঈশোপনিষদের ৫, মুণ্ডক উপনিষদের ত্রয়োদশ, ১, ৭, বৃহদারণ্যকের চতুর্থ, ৪, ১৬ দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানের ফল

১৮। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

(১৮) ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের কথা এই ভাবে সংক্ষেপে বলা হল। আমার যে ভক্ত এই সব উপলব্ধি করবে সে আমার ভাব লাভ করার যোগ্য হবে।

ভক্ত যখন শাশ্বত অন্তর্দেবতার দর্শন লাভ করে তখন সে মোক্ষ, প্রেম ও সাম্য লক্ষণ বিশিষ্ট দিব্য প্রকৃতির অধিকারী হয়। "সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।"

পুরুষ ও প্রকৃতি

১৯। প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

(১৯) প্রকৃতি (স্বভাব) ও পুরুষ (আত্মা) উভয়কেই অনাদি বলে জেনো এবং এও জেনো যে বিভিন্ন রূপ ও গুণ প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত।

[ব্রহ্ম শাশ্বত বলে তাঁর প্রকৃতিও শাশ্বত।[১]

স্বভাব ও আত্মা এই দুই প্রকৃতির মাধ্যমেই ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ঘটান। এই অনুচ্ছেদে যে পুরুষের কথা বলা হয়েছে, তা সাংখ্যের বহুধা পুরুষ নয়, এ হল সকল ক্ষেত্রের অদ্বিতীয় ক্ষেত্রজ্ঞ। সাংখ্যের মত গীতা প্রকৃতি ও পুরুষকে দুই স্বাধীন উপাদান বলে মনে করে না, তাদের এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উত্তম ও অধম আকার বলে ধরেছে।

২০। কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥

(২০) প্রকৃতিকে কার্য, করণ ও কর্তৃত্বের কারণ বলে উল্লেখ করা হয় এবং পুরুষকে সুখ দুঃখ উপলব্ধির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়।

কার্য করণ কর্তৃত্বের পাঠান্তর কার্য কারণ কর্তৃত্বে। এই প্রসঙ্গে ক্রাক্লিন

১। নিত্যেশ্বরত্বাদীশ্বরস্য, তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুম্। ইতি শঙ্করাচার্য।

এড্‌গার্টনের (Franklin Edgerton) ভগবদ্গীতা প্রথম খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠার উপর টীকা দ্রষ্টব্য।

দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতি থেকে জাত এবং সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা পুরুষের জন্য, কতক শর্তাধীনে। আত্মের আনন্দময় স্বভাবের সুখদুঃখ কলঙ্ক স্বরূপ, কেননা সেখানে সে প্রকৃতির বিষয়ের সঙ্গে অভিন্ন।

২১। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥

(২১) আত্মারূপ পুরুষ প্রকৃতিস্থিত হয়ে প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করে এবং এই প্রকৃতিজাত গুণ সংস্রবের জন্য সৎ বা অসৎ গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

২২। উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

(২২) দেহস্থ পরমাত্মাকে সাক্ষী, অনুমোদনকর্তা, পালনকর্তা, ভোগ-কর্তা, মহেশ্বর ও পরম পুরুষ বলা হয়।

এখানে যে পরমাত্মার কথা বলা হচ্ছে, তা মানসদৈহিক ব্যক্তি থেকে ভিন্ন। শেষোক্ত প্রকৃতি প্রক্রিয়া জড়িত থাকায় যে ভেদবোধ আসে তাকে অতিক্রম করতে পারলে সে অমরাত্মায় পরিণত হয়। গীতায় ক্ষেত্রজ্ঞ ও সর্বেশ্বরের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।[১]

২৩। য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥

(২৩) যে পুরুষ ও প্রকৃতির ও তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর কথা জানে, সে যে অবস্থায় থাকুক, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

সর্বথা বর্তমানোঽপি—যে রকম কার্যেই প্রবৃত্ত থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক। ইতি রামানুজাচার্য।

মুক্তির বিভিন্ন মার্গ

২৪। ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥

(২৪) কেউ পরমাত্মাকে আত্মাদ্বারা ধ্যানযোগে আত্মার মধ্যেই উপলব্ধি করে, কেউ জ্ঞানযোগ দ্বারা, কেউ কর্মযোগ দ্বারা।

১। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োঃ ভেদানভ্যুপগমাদ্ গীতা শাস্ত্রে। ইতি শঙ্কর।

এখানে সাংখ্য অর্থে জ্ঞান বোঝাচ্ছে।

২৫। অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

(২৫) যারা এই সব (যোগমার্গ) জানে না, তারাও অন্যদের কাছে শুনে উপাসনা করে। তারা অন্যের মুখে যা শুনেছে, তাই যদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা'হলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে।

যারা গুরুর[১] উপদেশের উপর নির্ভর করে এবং উপদেশানুযায়ী পূজার্চনাদি করে, তাদের অন্তর ঈশ্বরপ্রসাদ লাভের জন্য উন্মুক্ত হয়, এবং এইভাবে তারা নিত্যজীবন লাভ করে।

২৬। যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥

(২৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), স্থাবর জঙ্গম যা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে, তা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই (জাত) হয়েছে।

আত্ম ও অনাত্মের আদান প্রদানেই সকল প্রকার জীবন। শঙ্করাচার্যের মতে এই দুয়ের মিলন অধ্যাসকল্প, এককে অন্য ভাবার বিভ্রান্তি। ভ্রান্তি ঘুচে গেলে, বন্ধনও ঘুচে যায়।

২৭। সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং য পশ্যতি স পশ্যতি॥

(২৭) যে সর্বভূতে পরমেশ্বরের সমান অস্তিত্ব অনুভব করে, তাদের বিনাশ দেখেও অবিনাশীর বিনাশ নাই, একথা বুঝতে পারে, সেই সত্যদ্রষ্টা।

যে বিশ্বাত্মাকে সকল বস্তুতে দেখতে পায়, সে নিজেও বিশ্বজনীন হয়ে যায়। "বিনষ্ট হলেও যে কখনও বিনষ্ট হয় না।" যদি সকল বস্তুই অবিরাম অভিব্যক্তির বিবর্তনের অবস্থায় থাকে, তাহলে নির্বিকার ঈশ্বর থাকেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বেয়ার্গসঁ ঈশ্বরকে পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত ধরেছেন, কাজেই পৃথিবীর বিকারের সঙ্গে তাঁর বিকার অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বের বিবর্তনের অংশ রূপে অভিব্যক্ত ঈশ্বরের ধারণা করলে বিশ্ব যখন অচল হবে, ঈশ্বরেরও বিলুপ্তি ঘটবে। তাপগতি বিজ্ঞানের (Thermodynamics) দ্বিতীয়

১। শ্রুতিপরায়ণাঃ, কেবল পরোপদেশ প্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতাঃ।
—ইতি শঙ্করাচার্য।

সূত্র থেকে একটা পরিপূর্ণ অচলতা ও ঘটনাবর্জিত স্তব্ধতার অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ঈশ্বর যদি উন্মেষশালী বা অভিব্যক্তির পর্যায়ের আয়ত্তে হন, তাহলে তাঁকে জগতের স্রষ্টা বা ত্রাণকর্তা বলে ধরা যায় না। তাঁকে আর ধর্মীয় ভাবের যথোপযুক্ত পাত্র বলেও মনে করা যায় না। গীতায় এই শ্লোকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থায়ী হয়।

২৮। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(২৮) সমভাবে সর্বত্র ঈশ্বরকে বিরাজমান দেখে বলে, তার আত্মা দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মার ক্ষতি হয় না এবং সে পরমাগতি লাভ করে।

২৯। প্রকৃত্যৈব চ কর্মানি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
য পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥

(২৯) সব কার্য প্রকৃতি দ্বারাই সাধিত হয়, এবং আত্ম (পুরুষ) কর্তা নয়, এ যে বুঝতে পারে, সেই সত্য দৃষ্টি লাভ করেছে।

আসল আত্ম কর্তা নয়, সাক্ষী মাত্র। দর্শকমাত্র, অভিনেতা নয়। শঙ্করের মতে অকর্তা, অনপেক্ষ এবং সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জিত ব্রহ্মের যে কোন বৈচিত্র্য আছে তার কোন প্রমাণ নেই। আকাশের মতই তিনি বৈচিত্র্য বিহীন।[১] মন ও বুদ্ধির উপর কর্মের প্রভাব পড়ে, আত্ম সে প্রভাব মুক্ত।

৩০। যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

(৩০) বহুবিধ ভূতেদের একেই কেন্দ্রীভূত বলে যখন সে বুঝতে পারে, এবং তাই থেকেই সব বিস্তৃত হয়েছে এই উপলব্ধি করে তখন তার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়।

যখন স্বভাবের বৈচিত্র্য ও তার বিবিধ বিস্তারের উৎস নিত্য ও অদ্বিতীয়ের মধ্যে বুঝতে পারি তখন আমরা অনন্তে পর্যবসিত হই। "সে পরমাত্মার সর্বব্যাপী প্রকৃতি বুঝতে পারে কেননা সকল প্রকার সীমার কারণ পরমাত্মার অনন্যতায় বিলীন হয়েছে।" ইতি আনন্দগিরি।

১। ক্ষেত্রজ্ঞমকর্তারং সর্বোপাধিবিবর্জিতম্ নির্গুণত্বাকর্তৃ নির্বিশেষত্বাকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিঃ।

৩১। অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥

(৩১) হে কৌন্তেয় (অর্জুন), পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ ও অবিনশ্বর বলে, দেহে থেকেও কর্মও করেন না, লিপ্তও থাকেন না।

৩২। যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥

(৩২) সর্বব্যাপী আকাশ যেমন সূক্ষ্মতা হেতু কিছু দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, তেমনি পরমাত্মা সর্বদেহে থেকেও কোন প্রকারে লিপ্ত হন না।

৩৩। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥

(৩৩) হে ভারত (অর্জুন), এক সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, তেমনি ক্ষেত্রী সমস্ত ক্ষেত্রকে আলোকিত করে।

পরিণামী জগৎ সম্বলিত সমগ্র ক্ষেত্রের উপর ক্ষেত্রজ্ঞ আলোকসম্পাত করেন।

৩৪। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥

(৩৪) যে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং ভূতপ্রকৃতি থেকে কি প্রকারে মুক্তি পাওয়া যায় তা জানতে পারে, সে পরমকে লাভ করে।

ভূতপ্রকৃতি—জীবদের জড়প্রকৃতি।

ইতি ··ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই-
খানেই সমাপ্তি।

চতুর্দশ অধ্যায়

সর্বভূতের অতীন্দ্রিয় পিতা

সর্বোত্তম জ্ঞান

শ্রীভগবান উবাচ।

১। পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥

শ্রীভগবান বললেন।

(১) আমি সর্বোত্তম জ্ঞান, পরম জ্ঞানের কথা আবার বলব। তা জেনেই মুনিরা ইহজগতে থেকে পরম সিদ্ধিলাভ করেছেন।

২। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥

(২) সেই জ্ঞানকে আশ্রয় করে তারা আমার সদৃশ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টির সময়ও জন্মগ্রহণ করে না, প্রলয়েও বিচলিত হয় না।

নিত্য জীবন অনির্দেশ্য পরমের মধ্যে বিলুপ্তি নয়। প্রায়োগজ সচলতার ঊর্ধ্বে উঠে মুক্ত ও সার্বিক হওয়াই নিত্য জীবন পাওয়া। তখন তার অবস্থা সর্বপ্রকার অভিব্যক্তির অতীত বলে সৃষ্টি ও প্রলয়ের চক্রাবর্তনের প্রভাবমুক্ত হয়। এই প্রকার উদ্ধারপ্রাপ্ত আত্মা বিবর্ধিত হয়ে ঈশ্বরের সাদৃশ্যপ্রাপ্ত হয় ও অচ্যুত অস্তিত্ব গ্রহণ করে এবং যে সর্বেশ্বর নানা ব্রহ্মাণ্ডীয় রূপ ধারণ করেন তাঁর সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকে। সে অবস্থা ঈশ্বরের স্বরূপতা বা অভিন্নতা নয়, সমানধর্মতা বা গুণ ও ধর্মে সমান। যাঁর সাধনা করছে, তাঁর সহিত অভিন্নপ্রকৃতি হয়ে সাদৃশ্য মুক্তি লাভ করে। বাহ্যচৈতন্যে ও জীবনে সে দিব্যকে উপলব্ধি করে। বাইবেলের ম্যাথিউ ; পঞ্চম, ৪৮ সংখ্যক শ্লোকের "তুমি পরিপূর্ণাঙ্গ হও, যেমন তোমার স্বর্গস্থ পিতা পরিপূর্ণ," এই উক্তি তুলনীয়। শঙ্করাচার্যের মত কিন্তু অন্যরূপ। তিনি সাধর্ম্য মানে অভিন্নপ্রকৃতি ধরেছেন, গুণের সমতা নয়।[১]

১। মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্যং মৎ স্বরূপতাং ন তু সমানধর্মতাং সাধর্ম্যং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদা-নভ্যুপগমাদ্ গীতা শাস্ত্রে। ইতি শঙ্করাচার্য। মম ঈশ্বরস্য সাধর্ম্যং সর্বাত্মত্বং, সর্বনিয়ন্তৃত্বম্, ইত্যাদি ধর্মসাম্যং সাধর্ম্যম্। ইতি নীলকণ্ঠ। মম সাধর্ম্যং মদ্রূপত্বম্। ইতি শ্রীধরাচার্য।

৩। মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

(৩) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার গর্ভাধানের ক্ষেত্র, তাতে আমি বীজ নিক্ষেপ করেছি, যা থেকে, হে ভারত (অর্জুন) সর্বভূত জন্মলাভ করেছে।

আমরা যদি শুধু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত হয়ে থাকি, তাহলে শাশ্বত জীবনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। এই শ্লোকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে সমস্ত অস্তিত্বই দিব্য বিভূতি। ব্রহ্মাণ্ডের বীজ তিনি। এই জগৎ সম্বন্ধে তিনি হিরণ্যগর্ভ হন, ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। শঙ্কর বলেন, "আমি ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গে ক্ষেত্রের মিলন ঘটিয়ে হিরণ্যগর্ভের জন্ম দিই, তাই থেকে সর্বভূতের উৎপত্তি।" ঈশ্বরই পিতা, তিনি অনাত্মরূপ গর্ভে জীবনসারের বীজ নিষেক করেন, তা থেকেই প্রত্যেকের জন্ম। জগৎ হল সান্তের উপর অনন্তের লীলা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকের উপর টীকা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। গীতা রচয়িতা এখানে যে সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করেছেন, তার অনুযায়ী অসৎ, নৈরাজ্য বা রাত্রি থেকে রূপের বিবর্তন হয়েছে। অতল শূন্য থেকে যে সকল বস্তু আকার গ্রহণ করেছে তারা ঈশ্বর থেকেই উদ্ভূত। তারাই অসতের মধ্যে ঈশ্বর নিক্ষিপ্ত বীজ।

৪। সর্বযোনিষু কৌন্তেয়। মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহম্ বীজপ্রদঃ পিতা ॥

(৪) হে কৌন্তেয় (অর্জুন), যে গর্ভে যে কোন আকৃতি সম্ভব হয়েছে, তা মহদ্ ব্রহ্মের যোনিতে আমার দ্বারা পিতা রূপে বীজ নিষেকের ফলে হয়েছে।

সকল সজীব আকৃতির মাতা প্রকৃতি ও পিতা ঈশ্বর। আবার প্রকৃতি যখন ঈশ্বরেরই স্বভাব, তখন ঈশ্বরই বিশ্বের পিতা ও মাতা। তিনি বিশ্বের বীজ ও গর্ভ। কয়েক প্রকার অর্চনা পদ্ধতিতে এই ধারণা ব্যবহার করা হয়। সেই পদ্ধতি যে বাহ্য রূপ নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে তাকে অনেক আধুনিক শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকেরা অশ্লীল লৈঙ্গিক বলে উপহাস করে। ঐশী ভাব আমাদের জীবনকে উর্বর করে এবং ঈশ্বর যা চান আমাদের দিয়ে তাই করিয়ে নেয়।

ব্রহ্ম জগতের বীজ কারণ। জড়কে প্রাণময় আত্মা দ্বারা (গ্রীকেরা যাকে logoi spermatikoi বলত) নিষেকের ফলে সকল ভূতের উৎপত্তি।

তাদের মাধ্যমে ঈশ্বর জগতে নিজের কাজ করে যায়। স্থূল জড় জগতের ছাঁচকে জীবে পরিণত করার আদর্শ রূপ হল শব্দব্রহ্মের এই বীজগুলি। ভূত বস্তুর ভাব ও পাঁচ ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত। অভিব্যক্তের প্রত্যেক সম্ভাব্যতার মূল অব্যক্তের তৎসঙ্গত সম্ভাব্যতার মধ্যে থাকে। সেই অব্যক্তের মধ্যেই তার শাশ্বত কারণ, অভিব্যক্তিতে যার প্রকাশ্য স্বীকৃতি। সৃষ্টির সমস্ত খুঁটিনাটির এক চিরন্তন দৃশ্যপট ঈশ্বরের সামনে থাকে। সক্রেটিস ও প্লেটো ভাব ও জড়কে দ্বৈতরূপে ধারণা করেছিলেন, তাতে ভাবের সূক্ষ্ম জগৎ ও জড়ের স্থূল জগতের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা কঠিন। গীতাতে দুইই ভগবানের। ঈশ্বর নিজেই স্থূল জগতের নানা রূপে ভাবের বীজ নিষেক করেন। দিব্যোৎপন্ন ও মূল কারণ শব্দব্রহ্মের এই বীজী ভাবই আমাদের ভগবৎ প্রেমের হেতু। একদিকে ঈশ্বর মনুষ্য প্রকৃতির অতীত, অন্যদিকে জীবাত্মার মধ্যে দিব্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল কারণ ও অন্তিম পরিপূর্ণতা মিলে যায় ততক্ষণ ব্রহ্মাণ্ড প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

সত্ত্ব রজ তম

৫। সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

(৫) হে মহাবাহো (অর্জুন), প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব, রজ, তম আদি গুণগুলি অব্যয় দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে রাখে।

মৃত্যুহীন আত্মা যে জীবনমৃত্যু চক্রাবর্তনে অংশ নেয় সে গুণ শক্তির জন্য। তারা "প্রকৃতির মৌলিক উপাদান ও সমস্ত বস্তুর ভিত্তি। অতএব সেগুলিকে বস্তুসমূহের সহজাত প্রকৃতি বলা যায় না।" ইতি আনন্দগিরি। তাদের গুণ বলা হয় কেননা তাদের উদ্ভব সাংখ্যর পুরুষ বা গীতার ক্ষেত্রজ্ঞের উপর নির্ভর করে। গুণেরা প্রকৃতির তিন প্রকার প্রবণতা বা স্বভাব রজ্জুর তিন তার। সত্ত্ব সংবিতের জ্যোতিকে প্রতিফলিত করে আর তার দ্বারা উদ্ভাসিত, কাজেই বিকীরণের গুণ তাতে বর্তমান (প্রকাশ)। রজসের বহির্মুখী গতি (প্রবৃত্তি) ও তমসের লক্ষণ জাড্য (অপ্রবৃত্তি) ও লক্ষ্যহীন ঔদাসীন্য (প্রমাদ)।[১] সত্ত্ব, রজ, তম কে সাধারণ বোধ্য ভাবে এক কথায়

১। ১১ ও ২০, ১২ ও ২২, ১৩।

বর্ণনা করা শক্ত। সত্ত্ব পরিপূর্ণ পবিত্রতা এবং উজ্জ্বলতা, আর অশুদ্ধি রূপ রজ গুণের লক্ষণ সক্রিয়তা ও তমের লক্ষণ অন্ধকার ও জাড্য। যেহেতু গীতার গুণের মুখ্য প্রয়োগ নৈতিক, তাই সত্ত্বের বদলে সাধুতা, রজঃর বদলে প্রবৃত্তি ও অত্যাসক্তি, আর তমের বদলে স্থূলবুদ্ধি এই আলোচনায় ব্যবহার করা হবে।

বিশ্ব প্রকল্পের দিব্যত্রয়ীতে এই গুণগুলির এক একটি প্রতিফলিত হয়েছে, পালক বিষ্ণুর মধ্যে সত্ত্ব, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মধ্যে রজঃ, ও লয়কারী শিবের মধ্যে তম। সত্ত্ব দ্বারা বিশ্বের স্থিতি, রজঃ দ্বারা সৃজনী বেগ, আর তমের মধ্যে বস্তুদের ক্ষয় ও মৃত্যুর প্রবণতা। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জন্য ত্রিগুণই দায়ী। সগুণ ঈশ্বরের তিন ভাবের উপর ত্রিগুণের আরোপ করলে দেখা যায় তিনি বস্তুময় বা ব্যক্ত জগতের। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বর তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন এবং দেবোপম আত্মারা তাঁর এই ত্রাণকার্যে সহযোগিতা করেন।[১]

আত্মা যখন প্রকৃতিজ গুণের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয়, তখন সে তার নিজের চিরন্তনতা ভুলে যায় এবং মন, প্রাণ ও দেহকে অহমিকার তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করে। এই বন্ধন ছাড়াতে হলে আমাদের প্রকৃতির গুণত্রয়কে অতিক্রম করতে হবে, ত্রিগুণাতীত হতে হবে। তখন আমরা আত্মার মুক্ত ও অচ্যুত ভাবের অধিকারী হই, সত্ত্ব চেতনার জ্যোতিতে, রজঃ তপস্যায়, ও তম স্তব্ধতা বা শান্তিতে উদ্গত হয়।

৬। তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥

(৬) এর মধ্যে সাধুতা (সত্ত্ব) নির্মলতার জন্য দীপ্তি ও স্বাস্থ্যের কারণ হয়। হে নিষ্পাপ, এই গুণ সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা বন্ধন করে।

এখানে জ্ঞান অর্থে বুদ্ধি সঞ্জাত অধম বিদ্যা।

সত্ত্ব অহংবোধকে বিনষ্ট করে না। এ থেকেও বাসনা জন্মায়, যদিও সে বাসনা মহৎ বিষয়ের জন্য। সর্ব আসক্তি মুক্ত আত্মা এক্ষেত্রে সুখ ও বিদ্যার

১। বাইবেলে মেশিয়া সম্বন্ধে ইসাইয়ার উক্তি তুলনীয় : "তিনি আমাদের শোক দুঃখ বহন করেন। তিনি আমাদের বিচ্যুতির জন্য ক্ষত হয়েছিলেন। আমাদের শান্তির বিঘ্ন তাঁর উপর ছিল এবং তাঁর উপর যে চাবুক পড়েছিল, তাই দিয়ে আমরা নিরাময় হয়েছি।

(ত্রিপঞ্চাশৎ, ৪৫)

কামনায় জড়িয়ে পড়ে। অহংবোধ চালিত চিন্তা ও সংকল্প যতদিন না আমরা বর্জন করতে পারব, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই। জ্ঞান বা বিদ্যার সম্পর্ক বুদ্ধির সঙ্গে এবং বুদ্ধি প্রকৃতিসঞ্জাত। আত্মের ভাব যে শুদ্ধ চৈতন্য তার থেকে এর পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে।

৭। রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তান্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥

(৭) প্রবৃত্তি (রজঃ)কে আকর্ষণ স্বভাবের বলে জেনো, তৃষ্ণা ও আসক্তি থেকে তার উৎপত্তি। হে কৌন্তেয় (অর্জুন), দেহীকে কর্মাসক্তি দ্বারা রজঃ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে।

জীবাত্মা কর্তা নয় তবুও রজগুণে তার মনে হয় "আমি কাজ করছি"। ইতি আনন্দগিরি।

৮। তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

(৮) কিন্তু জাড্য (তমঃ) অজ্ঞতাজাত বলে জেনো এবং সমস্ত দেহ ধারীদের মোহের কারণ। হে ভারত (অর্জুন), তমোগুণ, অবহেলা, আলস্য ও নিদ্রা (প্রভৃতির বৃদ্ধিব) দ্বারা বন্ধন করে।

৯। সত্ত্বঃ সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥

(৯) সাধুতা লোককে সুখে আসক্ত করে, প্রবৃত্তি কর্মে আসক্ত করে কিন্তু হে ভারত (অর্জুন), জাড্য জ্ঞানকে ঢেকে ফেলে অবহেলায় রত করে।

১০। রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

(১০) হে ভারত (অর্জুন), সাধুতা প্রবৃত্তি ও জড়তাকে অভিভূত করে, প্রবৃত্তি সাধুতা ও জড়তা (কে অভিভূত করে) ও জড়তা সাধুতা ও প্রবৃত্তিকে (অভিভূত করে) প্রাধান্য লাভ করে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনটি গুণই থাকে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে। কেউই তা থেকে মুক্ত নয়, এবং প্রত্যেকের মধ্যে ওর একটির প্রাধান্য থাকে। যে গুণের প্রাধান্য, সেই অনুসারে মানুষকে সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস বলে। শারীরবৃত্তে যখন "রস"বাদ প্রচলিত ছিল তখন মানুষকে চারিটি রসের প্রাধান্য

অনুযায়ী রক্ত, পিত্ত, লসিকা ও স্নায়ু ধাতুর বলা হত। হিন্দু শ্রেণীবিভাগ মানসিক লক্ষণের উপর করা হয়। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক আলোক ও জ্ঞান পিপাসু, রাজসিক প্রকৃতির লোক সদা চঞ্চল বহির্মুখী বাসনায় পূর্ণ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির কার্য স্বাধীন, শান্ত ও নিঃস্বার্থ, রাজস প্রকৃতির সর্বদা সক্রিয় থাকার ইচ্ছা, সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, এবং তার কার্য স্বার্থবোধ দ্বারা দূষিত। তামস প্রকৃতির লোক নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয়, তার মন অন্ধকার ও বিভ্রান্ত, তার সমস্ত জীবন পরিপার্শ্বের কাছে নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-সমর্পণ।

১১। সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

(১১) যখন দেহের সকল দ্বার দিয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয় তখন বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ বেড়েছে।

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন—দেহের সর্বদ্বার। জ্ঞানালোকের সম্পূর্ণ ভৌতিক প্রকাশ হতে পারে। চিৎ সত্যের সঙ্গে বাস্তব প্রকাশের অসঙ্গতি নেই। ভৌত স্তরেও দিব্যোপলব্ধি হতে পারে। মানবচৈতন্যতে দিব্যভাবের বিকাশ করানো, ভৌত প্রকৃতিকে প্রতিভাত করা, আমাদের সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করাই যোগের লক্ষ্য।

আমাদের মন যখন প্রদীপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম সতেজ হয়, তখন সত্ত্বের প্রাধান্য হয়।

১২। লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

(১২) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), যখন রজঃ গুণের বৃদ্ধি হয়, তখন লোভ, সক্রিয়তা, কর্মপ্রবৃত্তি, চঞ্চলতা ও আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

জীবন ও তার সম্ভোগে অত্যাসক্তি রজোগুণের প্রাধান্য থেকে হয়।

১৩। অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

(১৩) হে কুরুনন্দন (অর্জুন), তমোগুণের বৃদ্ধি হলে, অজ্ঞতা নিষ্ক্রিয়তা অবহেলা ও শুধু মোহ জন্মায়।

সত্ত্বের ফল যেমন প্রকাশ বা দীপ্তি, অপ্রকাশ বা অন্ধকার তমোগুণের ফল। ভ্রম, বুদ্ধিভ্রংশ, অবহেলা, ও নিষ্ক্রিয়তা তামস প্রকৃতির লক্ষণ।

১৪।　যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥

(১৪) সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে দেহী আত্মা যদি প্রলুপ্ত হয়, তাহলে সে তত্ত্বজ্ঞানীদের পূতলোক প্রাপ্ত হয়।

তারা মোক্ষলাভ করে না, ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে। মোক্ষলাভের জন্য নিস্ত্রৈগুণ্য বা ত্রিগুণাতীত হওয়া প্রয়োজন।

১৫।　রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥

(১৫) রজোগুণের প্রাবল্যের সময় বিলুপ্ত হলে কর্মবীরদের মধ্যে জন্মলাভ করে আর তমোগুণের প্রাবল্যের সময় লুপ্ত হলে মূঢ়যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে।

১৬।　কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥

(১৬) সুকৃতির ফলকে সাত্ত্বিক ও নির্মল বলে বলা হয়, প্রবৃত্তির ফল দুঃখ আর জাড্যের ফল অজ্ঞতা।

১৭।　সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥

(১৭) সত্ত্ব গুণ থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি, রজ গুণ থেকে লোভের আর তমো গুণ থেকে অবহেলা, ভ্রম ও অজ্ঞতা জন্মায়।

তিন গুণের মানসিক প্রভাব এখানে বর্ণিত হয়েছে।

১৮।　ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

(১৮) সৎপ্রকৃতির লোক উচ্চে ওঠে, রাজসপ্রকৃতির লোক মধ্য (লোকে) থাকে, আর অধম গুণযুক্ত তামস প্রকৃতির লোক নীচে নেমে যায়।

আত্মা এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। নিষ্প্রভ জাড্য ও অজ্ঞান অবস্থা থেকে ঐহিক সম্ভোগের মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও সুখান্বেষণে পৌঁছায়। কিন্তু যতদিন আমাদের আসক্তি আছে, হোক না কেন সে খুব মহৎ লক্ষ্যের উপর, আমরা ততদিন বদ্ধ এবং ততদিন আমাদের নিরাপত্তা বোধের অভাব কেননা তমঃ ও রজঃ আমাদের মধ্যেকার সত্ত্বকে বশীভূত করে ফেলতে পারে। নৈতিক স্তরকে অতিক্রম করে, আধ্যাত্মিক স্তরে ওঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

সাত্ত্বিক লোককে ঋষি (ত্রিগুণাতীত) হতে হবে। যতদিন না সেই স্তরে পৌঁছচ্ছি, ততদিন আমরা গঠমান, আমাদের বিবর্তন অসম্পূর্ণ।

১৯। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥

(১৯) দ্রষ্টা যখন গুণ ছাড়া আর কোন কর্তা দেখে না এবং গুণের ওপারে কি আছে তা জানতে পারে তখন সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।

"তখন ব্রহ্মের সহিত তার অভিন্নতা স্পষ্ট হয়।" ইতি আনন্দগিরি।

২০। গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥

(২০) যখন দেহী আত্মা দেহসম্ভূত এই তিন গুণের উর্ধ্বে ওঠে, তখন সে জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জীবনের অধিকারী হয়।

দেহসমুদ্ভবান্—এই কথা থেকে এই বোঝায় যে ত্রিগুণের কারণ দেহ। "যে বীজ থেকে দেহের বিবর্তন" ইতি শঙ্করাচার্য।[১] সাত্ত্বিক সততাও অসম্পূর্ণ কেননা এই সততার শর্তই হল প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। যে মুহূর্তে সেই দ্বন্দ্বের শেষ হবে এবং সততা অবাধ হবে তখন আর সে সততা থাকবে না, সকল প্রকার নৈতিক দায়কে সে অতিক্রম করে যাবে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারাই তাকে আমরা অতিক্রম করে যাই ও তুরীয় জ্ঞান লাভ করি।[২]

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ

অর্জুন উবাচ

২১। কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥

অর্জুন বললেন,

(২১) হে প্রভো, যারা ত্রিগুণাতীত, তাদের কি কি লক্ষণ, তাদের আচরণই বা কিরূপ? তারা কি করেই বা তিন গুণকে অতিক্রম করে?

১। দেহোৎপত্তিবীজভূতান্।

২। আমরা যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলি, তেমনি পার্থিব বস্তুকে ত্যাগ করেই আমাদের ত্যাগকে বর্জন করতে হবে, কণ্টকং কণ্টকেনৈব যেন ত্যজসি তং ত্যজ। সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমঃ গুণকে জয় করে তারপর সত্ত্বকেই অতিক্রম করতে হয়।

ইহলোকেই যারা মোক্ষলাভে সিদ্ধ হয়েছে সেই জীবন্মুক্তদের কি কি লক্ষণ? লক্ষণগুলি স্থিতপ্রজ্ঞদের (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ সংখ্যক ও তৎপরবর্তী শ্লোকসমূহ) এবং ভক্তিমানদের (দ্বাদশ অধ্যায় ১৩ সংখ্যক ও পরবর্তী শ্লোকসমূহ) লক্ষণের সঙ্গে মোটামুটি মেলে। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে সিদ্ধির লক্ষণ একই, যেভাবেই তা প্রাপ্ত হয়ে থাকুক।

শ্রীভগবান উবাচ

২২। প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

শ্রীভগবান বললেন,

(২২) হে পাণ্ডব (অর্জুন), আলোক, প্রবৃত্তি ও মোহ এলে যে তাতে বিমুখ হয় না, আবার না পেলেও যে তার আকাঙ্ক্ষা করে না—

২৩। উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

(২৩) যে গুণসকল দ্বারা অবিচলিত হয়ে উদাসীনের মত বসে থাকে, যে গুণেরাই কর্ম করছে এই জেনে নিজে স্বতন্ত্র থাকে ও বিচলিত হয় না—

যে প্রকৃতির বিকার দেখে কিন্তু তাতে জড়িত হয় না। গুণেরা শুদ্ধ জ্যোতি, দিব্য প্রবৃত্তি ও পূর্ণ স্তব্ধতায় উন্নীত হয়—

২৪। সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি॥

(২৪) যে আত্মস্থ থেকে সুখদুঃখকে সমান বিবেচনা করে, যে মাটির ঢেলা, পাথর, সোনার টুকরাকে সমমূল্য মনে করে, যে প্রিয় বা অপ্রিয় অবস্থার একই ভাবে সম্মুখীন হয়, যে স্থিরচিত্ত ও নিন্দা ও স্তুতিকে সমান বলে বিবেচনা করে—

২৫। মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

(২৫) যে মান ও অপমানে সমান এবং শত্রু ও মিত্রের পক্ষে সমান এবং যে সর্বপ্রকার নবপ্রবর্তন ত্যাগ করেছে, তাকেই ত্রিগুণাতীত বলে।

২৬। মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(২৬) যে অনন্যা ভক্তি দ্বারা আমার সেবা করে ত্রিগুণকে অতিক্রম করে, সেও ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য হয়েছে।

সে মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য।

২৭। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ

(২৭) কেননা আমিই অমর অব্যয় ব্রহ্মের, শাশ্বত ধর্মের ও ঐকান্তিক সুখের আবাস।

এখানে সগুণ ঈশ্বরকে পরম ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছে। শঙ্করের ব্যাখ্যা হল যে সর্বেশ্বর ব্রহ্ম এই অর্থে যে তিনি ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। ব্রহ্ম তাঁর ভক্তদের ঈশ্বর শক্তি দ্বারা প্রসাদ দেন এবং তিনি সেই প্রকট করার শক্তি অতএব স্বয়ং ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যান্তরও দিয়েছেন। ব্রহ্মই সগুণ ঈশ্বর এবং এই শ্লোকের অর্থ হল "অবর্ণনীয় ও নিরপেক্ষ আমি অমর ও অবিনশ্বর কিন্তু সাপেক্ষ ব্রহ্মের আবাসস্থল।" নীলকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম অর্থে বেদ। রামানুজাচার্য ব্রহ্মকে মুক্ত আত্মা বলে ব্যাখ্যা করেছেন ও মধ্বাচার্য মায়া বলেছেন। মধুসূদন ব্রহ্মকে সগুণ ঈশ্বর বলেছেন। কৃষ্ণ নিজেকে পরম নিরপেক্ষ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণা করছেন।

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।
গুণত্রয় বিভাগ যোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের এইখানেই শেষ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জীবন-বৃক্ষ

সংসার-বৃক্ষ

শ্রীভগবান উবাচ

১। ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

শ্রীভগবান বললেন,

(১) উঁচু দিকে শিকড় আর নীচু দিকে শাখা এই রকম অবিনশ্বর অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা প্রচলিত আছে। তার পাতাগুলি বেদ এবং যে তা জানে সেই বেদজ্ঞ।

কঠ উপনিষদে আছে: "উঁচুতে মূল, নীচুতে শাখা, এই জগৎ-বৃক্ষ শাশ্বত।"[১] একেই সংসার-বৃক্ষ বলে। মহাভারত সাংসারিক প্রক্রিয়াকে গাছের সঙ্গে তুলনা করেছে, যাকে জ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা ছিন্ন করা যায়, জ্ঞানেন পরমাসিনা।[২] এই বৃক্ষের মূল ঈশ্বরে বলে এর মূল "ঊর্ধ্বে"। আর এ জগতের দিকে বিস্তৃত বলে এর শাখা "নীচে"। জগৎ ব্রহ্মের সহিত যুক্ত সজীব অঙ্গ।

প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড দ্বারা সংসার পালিত, তাই বৈদিক মন্ত্রগুলিকে পত্র বলা হচ্ছে, যাদের দ্বারা কাণ্ড ও শাখাগুলি সজীব থাকে।

১। পঞ্চম, ১। ঋগ্বেদের প্রথম, ২৪, ৭ ও দ্রষ্টব্য।

আমিই সংসার-বৃক্ষের মূল। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, প্রথম, ১০।

পাতেলিয়া অর্ফিক লিপি দৃষ্টে মনে হয় যে আমাদের দেহ পৃথিবী থেকে আর আত্মা স্বর্গ থেকে আসে। "আমি পৃথিবী ও নক্ষত্রখচিত আকাশের সন্তান কিন্তু আমার কুল শুধু স্বর্গীয়।" প্লেটোর উক্তি: "আমাদের আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশের কথা ভাবলে এইরকম ধারণা করতে হয়, আমরা ঘোষণা করি যে তাঁর অসুর রূপে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সেই রকম আত্মা দিয়েছেন, যা আমাদের দেহের শীর্ষে থাকে এবং যা আমাদের পৃথিবী থেকে আমাদের স্বর্গীয় আত্মীয়দের দিকে তোলে, কেননা আমরা পার্থিব পাদপ নই, স্বর্গীয় পাদপ।

২। অশ্বমেধপর্ব, ৪৭, ১২-১৫।

২। অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥

(২) এই বৃক্ষের শাখাবৃন্দ ঊর্ধ্বে ও নীচের দিকে বিস্তৃত এবং তারা গুণ দ্বারা পুষ্ট, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি তার প্রশাখা আর নীচে মনুষ্যলোকে তার মূলসকল প্রসারিত, যা থেকে কর্ম উদ্ভূত হয়।

শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন অধোপ্রসারিত মূলগুলি শাখামূল (বাসনা), যা আত্মা পূর্বজন্মের কর্মফল রূপে বহন করে।

৩। ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥

(৩) কাজেই এর আসল রূপ, তার আদি, অন্ত বা প্রতিষ্ঠা কিছুই ইহলোকে উপলব্ধি করা যায় না। এই দৃঢ়মূল অশ্বত্থকে অনাসক্তি রূপ কঠিন অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করে—

৪। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥

(৪) তারপর সেই পথের খোঁজ করতে হবে যা ধরলে আর কখনও ফিরে আসতে হয় না, তখন বলতে হয়: "এই প্রাচীন জগৎপ্রবাহ (ব্রহ্মাণ্ডীয় প্রক্রিয়া) যা থেকে জন্মেছে সেই আদি পুরুষের আমি শরণ নিই।"

শিষ্য বিষয়বস্তু থেকে নিজেকে তফাৎ করে, যে আদি চৈতন্য থেকে বিশ্বশক্তি নিঃসৃত হয় তারই আশ্রয় নেয়।

৫। নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥

(৫) যারা অহঙ্কার ও মোহমুক্ত হয়ে আসক্তি-দোষ জয় করতে পেরেছে, যারা বাসনাকে নিরুদ্ধ করে পরমাত্মায় অনুরক্ত, যারা সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত এবং মূঢ়তারহিত, তারা শাশ্বতাবস্থা লাভ করে।

প্রকট জীবন অংশমাত্র

৬। ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

(৬) সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি তাকে প্রদীপ্ত করে না। সেই আমার পরম ধাম, যেখানে পৌঁছলে আর কেউ ফিরে আসে না।

কঠ উপনিষদ পঞ্চম, ১৫ মুণ্ডক উপনিষদ্ দ্বিতীয়, ২-১০ তুলনীয়।

এই শ্লোকে অব্যয় ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে, যাঁকে তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায়।

বিশ্বজীবনস্বরূপ ঈশ্বর

৭। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

(৭) আমার নিজস্ব এক টুকরো, জীবলোকে সনাতন জীবাত্মা রূপে স্বপ্রকৃতিতে থেকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন সমেত ইন্দ্রিয়দের আকর্ষণ করে।

মমৈবাংশঃ—আমার এক টুকরো। এর অর্থ এ নয় যে পরম ব্রহ্ম বিভাজ্য বা তাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়। ব্যক্তি ব্রহ্মেরই এক সচলতা, এক মহা জীবনের অধিশ্রয়ণ বিন্দু। আত্মারূপ কেন্দ্র নিজেকে পরিবর্ধিত করে সমগ্র জগৎকে হৃদয় ও মন দিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আলিঙ্গন করতে পারে। যেটুকু প্রকট হয় তা হয়ত আংশিক, কিন্তু প্রাতিস্বিক আত্মা আসলে দিব্য, যা মানব অভিব্যক্তিতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না। (মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিকৃতিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সেতু স্বরূপ।) ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক প্রাতিস্বিকের চিরন্তন সার্থকতা আছে। যখন সে তার ব্যক্তিগত সীমাকে অতিক্রম করে তখন গুণাতীত পরমে সে দ্রবীভূত হয় না, ব্রহ্মে বাস করে[১] এবং ব্রহ্মাণ্ড প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের অংশীদার হয়।

শঙ্করের মতে জীবাত্মা ব্রহ্মেরই এক অংশ, যেমন মাটির কলসীর ভিতরের আকাশ বা গৃহমধ্যস্থ আকাশ সর্বময় আকাশেরই এক অংশ। রামানুজের মতে আত্মা ঈশ্বরের সত্যকার অংশবিশেষ। জগতে তা বাস্তব প্রাতিস্বিক আত্মায় পরিণত হয় এবং ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের সেবায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়।

জীবভূতঃ—সজীব আত্মা হয়ে। শঙ্করানন্দ বলেন, শাশ্বত অংশ ক্ষেত্রজ্ঞের অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে নাম ও রূপ প্রকাশ করার জন্য জ্ঞাতা হন।[২] ব্রহ্ম এক প্রকারে জীব হন (প্রকারান্তরেণ)। আসলে তিনি জীব নন, শুধু জীবাকার গ্রহণ করেন। কাজেই জীবভূত, জীবাত্মক নন।

জীবাত্মা বহুবিধ দিব্যের এক কেন্দ্রবিন্দু মাত্র এবং দিব্য চেতনার এক

১। নিবসিষ্যসি ময্যেব। দ্বাদশ, ৮।

২। নামরূপ ব্যাকরণায় ক্ষেত্রজ্ঞতাং গতঃ প্রমাতা ভূত্বা তিষ্ঠতি।

ভাবের প্রকাশক। জীব ব্যক্ত জগতের অংশ ও সেই নির্বিকল্পের উপর নির্ভরশীল। আত্মাই সেই অভিব্যক্তির ধারক। জীব তার বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রকাশ করেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। সে যদি ঈশ্বরের প্রতি যথোপযুক্ত ভঙ্গী গ্রহণ করে, তা হলে যে সমস্ত প্রভাব তার প্রকৃতিকে বিকৃত ও ক্ষীণ করে তা থেকে পরিশোধিত হবে এবং তার অস্মিতায় সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আসলে জীবাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে এক হলেও, প্রকট জগতে সে ঈশ্বরের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের প্রত্যেকেই দিব্য সংবিতের এক রশ্মি, আমরা যদি শুধু অনুকূল হই, তাহলে আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব সেই রশ্মিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রকৃতিস্থানি—তাদের স্বাভাবিক স্থানে, ইতি শঙ্করাচার্য, প্রকৃতিজ দেহস্থিত, ইতি রামানুজাচার্য।

৮। শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

(৮) ঈশ্বর যখন শরীর পরিগ্রহ করেন ও যখন তা ছেড়ে যান, তখন তিনি এদেরও (ইন্দ্রিয় ও মন) নিয়ে যান, যেমন বায়ু সুগন্ধী বস্তু থেকে গন্ধ বহন করে নিয়ে যায়।

জাগতিক অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণকালে সূক্ষ্মদেহ আত্মার সঙ্গী হয়।

৯। শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥

(৯) তিনি চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক ও নাসিকা দ্বারা রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ রূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ও মনকে ভোগ করেন।

১০। উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢা নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

(১০) যখন তিনি থাকেন বা চলে যান অথবা সম্ভোগ করেন বা গুণান্বিত হন, তখন মূঢেরা (অন্তরাত্মাকে) দেখতে পায় না, কিন্তু যাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে (বা জ্ঞান রূপ চক্ষু আছে) তারা দেখতে পায়।

১১। যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥

(১১) যোগীরা প্রযত্ন করে তাঁকে আত্মাবস্থিত রূপে দেখে কিন্তু যত্ন করেও অসংযত আত্মা নির্বোধরা তাঁকে দেখতে পায় না।

১২। যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

(১২) সূর্যের যে জ্যোতি সারা বিশ্বকে আলোকিত করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে দীপ্তি আছে, তা সবই আমার তেজ বলে জেনো।

১৩। গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥

(১৩) পৃথিবীতে এসে সর্বভূতকে আমার জীবনীশক্তি দ্বারা পালন করে থাকি ও রসাত্মক সোম (চন্দ্র) রূপে সমস্ত ওষধি (উদ্ভিদ)-কে পুষ্ট করি।

১৪। অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

(১৪) জীবদেহে জীবনাগ্নি রূপে প্রাণ ও অপান বায়ু (গৃহীত ও ত্যক্ত শ্বাস) সংযোগে আমি চার রকমের খাদ্য হজম করি।

পচামি শব্দার্থে রন্ধন করি।

১৫। সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥

(১৫) এবং আমি সকলের হৃদয়ে বাস করি, আমা থেকেই স্মৃতি ও জ্ঞানের উৎপত্তি, আবার তাদের লোপ। সকল বেদের আমিই জ্ঞাতব্য, আমি বেদান্তপ্রণেতা এবং আমিই আবার বেদজ্ঞ।[১]

অপোহনম্—ক্ষতি, বিনাশ, বর্জন।

পরম পুরুষ

১৬। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

(১৬) জগতে দুই ব্যক্তি আছে, নশ্বর ও অবিনশ্বর, এই সমস্ত ভূত নশ্বর আর বিকারহীন যিনি (কূটস্থ) তাঁকেই অবিনশ্বর বলা হয়।

১৭। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

(১৭) কিন্তু এ ছাড়া যিনি পরমাত্মা ও উত্তম পুরুষ রূপে জ্ঞাত, তিনি অমর ঈশ্বর রূপে ত্রিজগতে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের ধারণ করে থাকেন।

১। মহাভারতে ভীষ্ম কৃষ্ণের প্রসঙ্গে বলছেন: বেদবেদাঙ্গ বিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।

সর্বদা পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডে আত্মা ক্ষর বা নশ্বর। শাশ্বত আত্মা অক্ষর বা অবিনশ্বর, তিনি নির্বিকার ও অবিচল, চ্যুতির মধ্যে অচ্যুত।[১] আত্মা যখন অচ্যুতাভিমুখী হয়, তখন জাগতিক চঞ্চলতা খসে যায় এবং সে নির্বিকার নিত্য অস্তিত্ব লাভ করে। এ দুই একেবারে বিসংবাদী বিপরীত নয়, কেননা ব্রহ্ম এক আবার বহু, চির অজ আবার ব্রহ্মাণ্ডের প্রস্রবণ।

গীতার মতে এই জঙ্গম জগৎ ভগবানের সৃষ্টি। ঈশ্বর জগৎকে গ্রহণ করেন এবং তার উপর ক্রিয়া করেন, "বর্ত এব চ কর্মণি।" সংসারের দিক থেকে ব্রহ্ম ঈশ্বর, পুরুষোত্তম, জগৎবল্লভ যিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বাস করেন।[২]

পরমাত্মা—আত্মাস্থ ভগবান। গীতা এখানে অজ্ঞাত অতলান্ত ঐশী শক্তির কথা বলছে না, যে অন্তর্যামী সৃষ্টিকে সচল করছেন, তাঁর কথাই বলছে।

যে সগুণ ঈশ্বর নশ্বর ও অবিনশ্বরকে নিজের মধ্যে মিলিত করেছেন, গীতা তাঁকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

শঙ্করের ব্যাখ্যায় বিকারী বিশ্বই নশ্বর, আর ঈশ্বরের মায়াশক্তি অবিনশ্বর আর ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ ও বুদ্ধ এবং ক্ষর ও অক্ষরের সীমা থেকে মুক্ত।

রামানুজের ব্যাখ্যায় অক্ষর অর্থে মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা। বিশ্বজগৎ দুই ভাব দ্বারা গঠিত, আত্মা ও জড়, অর্থাৎ অক্ষর ও ক্ষর (অবিনশ্বর ও নশ্বর)। এদের উভয়ের ঊর্ধ্বে ব্রহ্ম জগতের অতীত আবার জগতে ব্যাপ্ত। এই দুই পুরুষকে দুই প্রকারের প্রকৃতি বলে ব্যাখ্যা করা যায়, এক উত্তম, তাঁর নিজস্ব সত্য প্রকৃতি, অধ্যাত্ম, আর এক অধম, তাকে শুধু প্রকৃতি বলা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের, প্রথম, ১০ তুলনীয়।

১৮। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

(১৮) আমি নশ্বরকে অতিক্রম করি এবং অবিনশ্বরের চেয়েও উচ্চ, আমি জগতে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।

মুণ্ডক উপনিষদে দ্বিতীয়, প্রথম, ১-২তে আছে।

অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ পুরুষঃ।

১। এক রূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থ। ইতি অমরকোষ।

২। অব্যয়ঃ, সর্বজ্ঞাত্বেন ঈশ্বর ধর্মেণ, অল্প জ্ঞাত্বেন জীবধর্মেন বা, ন ব্যেতি বর্দ্ধতে ক্ষীয়তে বেত্যর্থঃ। ইতি নীলকণ্ঠ।

১৯। যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥

(১৯) হে ভারত (অর্জুন), যে মোহবিমুক্ত হয়ে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানে সে সর্বজ্ঞ এবং আমাকে সর্বভাবে (নিজের সমস্ত আত্মা দিয়ে) পূজা করে।

জ্ঞান থেকে ভক্তির উদয় হয়।

২০। ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥

(২০) হে নিষ্পাপ, এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলা হল। হে ভারত (অর্জুন), এই শাস্ত্র জানলে লোকে বুদ্ধিমান হবে এবং তার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতে সমর্থ হবে।

ইতি······পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষোত্তমযোগ নামের পঞ্চদশ অধ্যায়ের এখানেই শেষ।

ষোড়শ অধ্যায়

মনের দৈব ও আসুরিক প্রকৃতি

দৈব প্রকৃতি

শ্রীভগবান উবাচ

১। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥

শ্রীভগবান বললেন,

(১) নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা, দান, আত্মসংযম এবং যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা ও ন্যায়নিষ্ঠা—

ভারতীয় ধর্মে ব্যবহৃত প্রতীকদের মধ্যে জ্যোতির্ময় দেবতা ও তমসাসঞ্জাত অসুরদের মধ্যে পার্থক্য প্রাচীন কাল থেকে করা হয়ে আসছে। ঋগ্বেদে দেবতা ও তাদের কৃষ্ণ প্রতিপক্ষদের মধ্যে সংঘর্ষের কথা আছে। রামায়ণেও উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিযুক্ত লোকেদের সঙ্গে অসংযত দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তিদের অনুরূপ সংঘর্ষের কথা আছে। মহাভারতে ন্যায়, ধর্ম ও নীতির আশ্রয়ী পাণ্ডবদের সঙ্গে শক্তিমত্ত কৌরবদের দ্বন্দ্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচার করলে মানুষের জাতিরূপ একই রকম চলে আসছে, মহাভারতের যুগের মত এখনও এমন কিছু লোক আছেন যাদের সাধুতা দেবোপম, আবার এমন কিছু আছে যারা অসুরের ন্যায় পতিত, আবার কেউ ঔদাসীন্য দ্বারা অভিশপ্ত। যে সব লোক মোটামুটি আমাদের মত তাদের এই সম্ভাব্য উদ্বর্তন। দেব ও অসুর উভয়ই প্রজাপতি থেকে উদ্ভূত। ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রথম, ২, ১।

২। অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥

(২) অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, ছিদ্রান্বেষণে বিতৃষ্ণা, জীবে দয়া, লোভহীনতা, শিষ্টতা, শালীনতা ও স্থিরচিত্ততা (চাপল্যহীনতা)।

৩। তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহ নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

(৩) তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শুদ্ধি, দ্বেষ ও অতি গর্বহীনতা,—হে ভারত (অর্জুন), এইগুলি দৈবী প্রকৃতিযুক্ত লোকের গুণ।

মনুষ্যলোকে অরমাজ্‌দ ও আহ্‌রিমানের স্বতন্ত্র এলাকা চিহ্নিত করা নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের ক্ষেত্র আছে।

এখানে গীতা উপদেষ্টা যে বিশিষ্ট গুণগুলির উল্লেখ করলেন, তা যাঁরা দিব্যসিদ্ধি অভিলাষী তাঁদের ধর্ম। এর পরে যাদের শক্তি, যশ ও আরামের জীবন লক্ষ্য তাদের গুণের কথা বলছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্য সামগ্রিকও নয়, পরস্পর নিরপেক্ষও নয়। অনেকের মধ্যে দুই শ্রেণীর কোন কোন গুণ যুগপৎ বিরাজমান দেখা যায়। মহাভারতের মতে "কিছুই একেবারে সৎ বা একেবারে অসৎ নয়।"[১]

আসুরিকতা

৪। দম্ভোদর্পোঽতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥

(৪) দম্ভ, দর্প, অতিগর্বিতা, ক্রোধ, কর্কশতা ও অজ্ঞতা, হে পার্থ (অর্জুন), যারা আসুরী প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে তাদের এই সকল দোষ।

তৎসংক্রান্ত ফলসমূহ

৫। দৈবী সম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥

(৫) কথিত আছে, দৈবী গুণ থাকলে মোক্ষলাভে সহায়ক হয় আর আসুরিক দোষে বন্ধন হয়। হে পাণ্ডব (অর্জুন), তুমি চিন্তা কোরো না, তুমি দৈবী গুণসম্পন্ন (দৈবী নিয়তিযুক্ত) হয়ে জন্মেছ।

হিন্দু ধর্মনিষ্ঠদের যে সমস্ত গুণ পরম্পরাক্রমে প্রচলিত, সেইগুলিই এখানে "দৈবী" জীবনের সূচক বলে একত্রিত করা হয়েছে। অসুরেরা ধূর্ত ও শক্তিমান, কিন্তু অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং তারা বিবেকহীন ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যবর্জিত।

১। নাত্যন্তং গুণবৎ কিঞ্চিন্নাত্যন্তং দোষবৎ তথা।

আসুরী প্রকৃতি

৬। দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈবাসুর এব চ।
দৈব বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥

(৬) সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই ধরনের লোক সৃষ্ট হয়েছে। দৈবী প্রকৃতির কথা সবিস্তারে বলেছি, এখন হে পার্থ (অর্জুন), আমি আসুরিক লোকেদের কথা বলছি, শোন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম, ৩, ১ দ্রষ্টব্য।

৭। প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥

(৭) তাদের প্রবৃত্তিও নেই, নিবৃত্তিও নেই। শুদ্ধি, সদাচার বা সত্যও তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

৮। অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥

(৮) তারা বলে জগৎ অসত্য, ভিত্তিহীন ও ঈশ্বরবর্জিত, বিধিমত কারণ পরম্পরায়ও জন্মায় নি, সংক্ষেপে জগৎ কামসঞ্জাত।

অপ্রতিষ্ঠম্—ভিত্তিহীন অর্থাৎ নৈতিক ভিত্তি বর্জিত। জড়বাদীদের এই অভিমত।

অপরস্পরসম্ভূতম্—বিধিমত ধারা বয়ে যে আসে নি। এর অন্যরকম ব্যাখ্যাও আছে। ঈশ্বরাধীন সংসারে একটা নির্দিষ্ট ধারা আছে, যেখানে এক বস্তু থেকে আর এক বস্তু বিধিমত উদ্ভূত হয় কিন্তু জড়বাদীরা জগতে কোন বিধি আছে একথা স্বীকার করে না, তারা বলে ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে। তাদের মতে কোন নিয়মগত পারম্পর্য থাকতে পারে না, এবং জগৎ শুধু সম্ভোগের জন্য সৃষ্ট।

"যৌন আবেগ সমস্ত জীবের সৃষ্টির একমাত্র কারণ এই হল লোকায়তিকদের মত।" ইতি শঙ্করাচার্য।

৯। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥

(৯) এই মতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হয়ে এই অল্পবুদ্ধি নষ্টাত্মা ও নিষ্ঠুর কর্মীরা জগতের শত্রুরূপে তার বিনাশের জন্য উদ্ভূত হয়।

১০। কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাহসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ॥

(১০) অতৃপ্ত কামনার আশ্রয় নিয়ে ভণ্ডামি, অভিমান ও দম্ভ সমন্বিত হয়ে, মোহবশতঃ ভ্রমাত্মক ধারণার বশে তারা অশুদ্ধ ব্রত নিয়ে কাজে লাগে।

বৃহস্পতি সূত্রের মতে কামই মানুষের পরম লক্ষ্য।[১]

১১। চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

(১১) যে সব অসংখ্য চিন্তার একমাত্র পরিণতি (তাদের) মৃত্যু, তাই দ্বারা জর্জরিত হয়, কামোপভোগ সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্থিরনিশ্চিত হয়—

এই হল জড়বাদ। খাও, দাও, ফুর্তি করো, কেননা মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং তার পরে আর কিছু নেই, এই হল তার শিক্ষা।[২]

১২। আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

(১২) শত শত আশাপাশ বদ্ধ হয়ে, কামক্রোধের বশ হয়ে, নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা অন্যায়ভাবে প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে।

১৩। ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥

(১৩) "আজ আমি এই পেয়েছি, এই বাসনা আমার চরিতার্থ হবে, এ আমার এবং এই ঐশ্বর্য আবার আমার হবে (ভবিষ্যতে)।"

১৪। অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী॥

(১৪) "এই শত্রুকে আমি বধ করেছি এবং অন্যদেরও আমি বধ করব। আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমি কৃতকার্য, বলবান ও সুখী।"

১। কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ।

২। যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

এই হল সব চেয়ে বড় পাপ, বাইবেলের লুসিফার যে পাপ করেছিল, যে, নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করা।

ক্ষমতা লাভ করা ও প্রভুত্ব খাটানোর লোভ বহুবিস্তৃত। অন্য লোকের উপর প্রাধান্য লাভ করার প্রবণতায় মানুষকে ক্রীতদাস করে ফেলেছে। যীশু যেমন এই লোভ জয় করেছিলেন তেমনি দৈবীভাবাপন্ন আত্মাও এই লোভে প্রলোভিত হন না। কিন্তু আসুরী প্রকৃতির লোকেরা এই লক্ষ্যগুলি স্বীকার করে এবং দর্প, আত্মাভিমান, লোভ, ঘৃণা ও পাশবিকতাকে গুণ বলে শ্লাঘা করে।

১৫। আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

(১৫) "আমি ধনবান ও অভিজাত, আমার মত কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, আমি দান করব, আমি আমোদ করব" এই সব তারা অজ্ঞতার দ্বারা মোহমুগ্ধ হয়ে বলে।

১৬। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

(১৬) নানা চিন্তা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, মোহজাল জড়িত হয়ে, বাসনা চরিতার্থে আসক্ত হয়ে তারা নোংরা নরকে পড়ে।

১৭। আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥

(১৭) আত্মাভিমানী, জিদী, ধন ও মানের গর্বে গর্বিত হয়ে তারা যে যজ্ঞ করে তাও নামমাত্র, তাতে আড়ম্বরই বেশী এবং বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য।

১৮। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

(১৮) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ ইত্যাদিতে আসক্ত, এই নিন্দুকেরা তাদের ও অন্যের দেহনিবাসী আমাকে হেয় জ্ঞান করে।

"ঈশ্বর তাদের অশুভ জীবনের সাক্ষী হয়ে বাস করেন।" ইতি শঙ্কর।

১৯। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

(১৯) এই সব ক্রূর, হিংসুক, নরাধম, অমঙ্গলকারীদের আমি ক্রমাগত জন্মমৃত্যু (চক্রে) অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করি।

২০। আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি-জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

(২০) আসুরী যোনিতে পড়ে, এই মূঢ়েরা জন্মে-জন্মেও আমাকে পায় না। হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), তাদের অত্যন্ত অধমাবস্থা হয়।

আমাদের আসুরী প্রকৃতি পরিত্যাগ করার জন্য বলা হচ্ছে। এর অর্থ পূর্ব নির্ধারণ নয় কেননা এও বলা হয়েছে যে আমরা সর্বদা ঈশ্বরাভিমুখী হবার সুযোগ পাই এবং সেই ভাবে সিদ্ধিলাভ করতে পারি। কোন অবস্থাতেই তা অসম্ভব নয়। সব আত্মাতেই অন্তর্ধামী আছেন, তার অর্থই এই যে অমরত্ব লাভের আশা সর্বদা আছে। সব চেয়ে পাপী যে সেও ঈশ্বরের দিকে ফিরলে মুক্তিলাভ করতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নরকের তিন দ্বার

২১। ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

(২১) যে নরকে গেলে আত্মার সর্বনাশ হয়, তার তিন দরজা,—কাম, ক্রোধ, লোভ। অতএব এই তিনটিকে বর্জন করা উচিত।

২২। এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(২২) এই অন্ধকারের তিনটি দ্বার থেকে মুক্ত হলে, হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), মানুষের আত্মার কল্যাণ হয় এবং সে পরমগতি লাভ করে।

কর্তব্যবিধিই শাস্ত্র

২৩। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

(২৩) কিন্তু যে শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করে, যথেচ্ছাচার করে, সে সিদ্ধিলাভও করে না, সুখও পায় না, পরমগতিও লাভ করে না।

২৪। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্মকর্তুমিহার্হসি॥

(২৪) অতএব কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করো। শাস্ত্রের বিধান কি তাই জেনে সংসারে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

শাস্ত্র—ধর্মশাস্ত্র।[১]

বাসনার আবেগের বদলে সদাচারের জ্ঞানকে স্থাপন করতে হবে কিন্তু যখন মোক্ষলাভ রূপ পরম সিদ্ধি পাওয়া হয়, তখন সাধক স্বজ্ঞা বা বিধি দ্বারা চালিত হন না, তখন তাঁর সমস্ত জীবনের ভাবের মধ্যে একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টি হয়। আমরা সাধারণতঃ আমাদের নিজস্ব বাসনা দ্বারা কাজে লাগি, তারপর আমাদের আচরণ নির্দিষ্ট সামাজিক বিধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করি এবং শেষকালে জীবনের গভীরতর অর্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মায় এবং আমরা তখন সেই জ্ঞান দ্বারা চালিত হই। কামনার প্রবর্তনা (অষ্টাদশ, ৫৯) শাস্ত্রের উপদেশ (ষোড়শ, ২৪) এবং আত্মার স্বতঃস্ফূর্তি (অষ্টাদশ, ৬৪, একাদশ, ৩৩) এই হল তিনটি ধাপ।

ইতি···দৈবাসুর সম্পদবিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈব ও আসুরী গুণ ও দোষ বিভাগ সম্বলিত

ষোড়শ অধ্যায়ের এইখানেই শেষ।

১। শাস্তি যৎ সাধনোপায়ং পুরুষার্থস্য নির্মলম্।
তথা এব বাধনোপায়ং তৎ শাস্ত্রমিতি কথ্যতে।

সপ্তদশ অধ্যায়

ধর্মব্যাপারে ত্রিগুণ

তিন প্রকারের শ্রদ্ধা

অর্জুন উবাচ

১। যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥

অর্জুন বললেন

(১) হে কৃষ্ণ, যারা শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ করে, তাদের অবস্থা কি? সত্ত্ব, রজ, তম, এর মধ্যে তাদের অবস্থা কোন্‌টা?

এরা যে ইচ্ছা করে শাস্ত্রবিধি অমান্য করে তা নয়, এরা শাস্ত্রবিধি ঠিক মত জানেই না।

শঙ্করের যুক্তি এই যে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলার উপর শ্রদ্ধার প্রকৃতি নির্ভর করে না। নিজ চরিত্র ও আচরিত উপাসনাপদ্ধতি দ্বারাই তা নির্ণীত হয়।

রামানুজের মত এতটা উদার নয়। তাঁর মতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ, তা ইচ্ছাপূর্বকই হোক বা অজ্ঞতাবশতঃই হোক, সশ্রদ্ধই হোক বা অশ্রদ্ধায়ই হোক নিন্দনীয়।

শ্রীভগবান উবাচ

২। ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃনু॥

শ্রীভগবান বললেন

(২) দেহীদের সত্ত্ব, রজ, তম শ্রেণীর প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের শ্রদ্ধাও তিন রকমের। এখন তাদের কথা শোন।

৩। সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥

(৩) হে ভারত (অর্জুন), প্রত্যেকের শ্রদ্ধা তার প্রকৃতি অনুযায়ী। **শ্রদ্ধার প্রকৃতি দিয়েই মানুষের প্রকৃতি গঠিত—যেমন তার শ্রদ্ধা, সেও তেমনই।**

গীতা রচয়িতা এখানে শ্রদ্ধা, খাদ্য, যজ্ঞ, তপস্যা, ভিক্ষা, ত্যাগ ও সন্ন্যাস সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের বিবেচনা করেছেন, সম্ভবত রচনাকালে এই সব প্রসঙ্গ সাধারণের আলোচনার বিষয় ছিল।

সত্ত্ব—স্বভাব।

শ্রদ্ধা মানে যে কোন বিশ্বাস মেনে নেওয়া নয়। বিশেষ আদর্শের উপর মানসশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে আত্মোপলব্ধির প্রয়াসই শ্রদ্ধা।

মানব সমাজের উপর পরমাত্মার চাপ থেকেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এই শক্তি মানুষকে শ্রেয়ের দিকে ঠেলে দেয়, শুধু জ্ঞানময় রাজ্যেই নয়, অধ্যাত্ম জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে। সত্যের আন্তরিক ভাব রূপে শ্রদ্ধা সেই দিকে নির্দেশ দেয়, যার উপর পূর্ণতর আলোকসম্পাত পরে হবে।

শেষ পর্যন্ত যে-কোন ধর্মীয় শ্রদ্ধার চরম ও অবিসংবাদী প্রমাণ হল সাধকের অন্তরের প্রমাণ।

এক জনপ্রিয় শ্লোকে বলে, ধর্মে যে সকল লক্ষ্যের দিকে নির্দেশ আছে, তার সার্থকতা নির্ভর করে সাধকের শ্রদ্ধার উপর।[১] ভাগবতে বলে যে পূজার ফল পূজকের শ্রদ্ধানুসারে পাওয়া যায়।[২] আমাদের অতীত দিয়ে আমরা সংগঠিত কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারি। প্লেটোর উক্তি তুলনীয়: "আমাদের কামনার যে প্রবণতা এবং আমাদের আত্মার যে প্রকৃতি, সেইভাবেই আমরা গড়ে উঠি।"[৩] গ্যয়টে বলেছেন: "নিষ্ঠাই জীবনকে অমরত্ব দান করে।"

৪। যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

(৪) সৎ লোকে দেবতাদের অর্চনা করে, প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত (রাজসিক) লোকে যক্ষরক্ষদের পূজা করে এবং অন্যেরা (যারা জড়বুদ্ধি) তামসিক তারা ভূতপ্রেতের পূজা করে।

ভূতপ্রেতের অর্চনাকে ধর্মবিশ্বাসে যারা পরিণত করে তারা তমোভাবাপন্ন।

১। মন্ত্রে, তীর্থে, দ্বিজে, দেবে, দৈবজ্ঞে, ভেষজে, গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

২। শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ। অষ্টম, ১৭।

৩। Laws, 904-c

৫। অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥

(৫) সেই সমস্ত দর্পিত ও অহঙ্কারী লোক, যারা কাম ও আবেগ দ্বারা শক্তিমান, তারা শাস্ত্রবহির্ভূত কঠোর তপস্যায় রত হয়।

৬। কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

(৬) নির্বোধ বলে শরীরের উপাদানদের ক্লিষ্ট করে, আর দেহান্তর্বাসী আমাকেও পীড়া দেয়। এদের সংকল্প আসুরিক বলে জেনো।

কেউ কেউ লোক-দেখানোর জন্য যে সব আত্মনিগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বন করে, যেমন কেশ-নির্মিত জামা পড়া, তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়ে দেহ বিদ্ধ করা প্রভৃতি, এখানে তার নিন্দা করা হচ্ছে। দৈহিক দুর্বলতার জন্য অনেক সময় অমূল দৃশ্য লোকের মানসপটে প্রতিফলিত হয়, তাকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলে ভুল করা হয়। আত্মসংযম ও কৃচ্ছ্রসাধন এক জিনিস নয়। এই প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধের উপদেশ বিবেচ্য: "অবিরাম তপস্যা বা যন্ত্রণাদায়ক, মূল্যহীন ও নিরর্থক আত্মনিগ্রহ অনুসরণীয় নয়।"[১] শুচিতা প্রভৃতি দ্বারা দেহকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা ১৪ সংখ্যক শ্লোকে বিবৃত করা হয়েছে।

ত্রিবিধ খাদ্য

৭। আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধোভবতি প্রিয়ঃ॥
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥

(৭) সকলের প্রিয় যে খাদ্য তাও তিন রকমের। যজ্ঞ, তপ ও দানও তাই। এদের বিভেদ শোন।

৮। আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

(৮) যে সব খাদ্য আয়ু, তেজ, বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও প্রীতিবর্ধক এবং মিষ্ট, কোমল, পুষ্টিবর্ধক ও রুচিকারক তাই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।

৯। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

১। ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র।

(৯) যে সব খাদ্য কটু, অম্ল, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, ঝাঁজালো, রুক্ষ ও প্রদাহকারী, এবং দুঃখ শোক ও রোগের আকর, তাই রাজসিক লোকেদের প্রিয়।

১০। যাতযামং গতরসং পূতিপর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

(১০) যে সব খাদ্য বিকৃত হয়েছে, যার রস শুকিয়ে গেছে এবং যা পচা, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও অশুদ্ধ, সেগুলি তামস প্রকৃতির লোকের প্রিয়।

দেহ আহার দ্বারা পুষ্ট, কাজেই খাদ্যের গুণাগুণ বিবেচনা প্রয়োজনীয়।[১]

ত্রিবিধ যজ্ঞ।

১১। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥

(১১) যারা ফলের প্রত্যাশা না রেখে, যজ্ঞ করা নিজেদের কর্তব্য এই রকম কথা মনে নিশ্চিত হয়ে শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুযায়ী যজ্ঞ করে তাদের যজ্ঞই সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

গীতার যজ্ঞ আর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান এক নয়। গীতার যজ্ঞ যে সাধারণ উৎসর্গীকরণ দ্বারা মানুষ তার ঐশ্বর্য ও কর্ম সকলের মধ্যে যে অনন্য জীবন আছেন তাঁর সেবায় নিবেদন করে তাই। যে লোকেব মনে উৎসর্গের ভাব আছে, তারা অন্যায় মৃত্যুদণ্ডও স্বীকার করে যাতে তাদের আত্মনিবেদনে জগৎ উন্নীত হয়। সাবিত্রী যমকে বলেছিলেন যে সাধুরা তাঁদের তপস্যা ও ত্যাগ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেন "সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।"

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—যারা ফলের প্রত্যাশা করে না। তারা সৎ কার্য করে কিন্তু তার ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন। সক্রেটিস বা গান্ধী তাদের কাজ

১। ছান্দোগ্য উপনিষদের্‌ সপ্তম, ২৬, ২। আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ। এখানে অবশ্য সত্ত্ব মানে অন্তঃকরণ।

আমাদের আত্মসংযম করার ক্ষমতার উপর আহারের প্রভাব আছে।

বিশ্বামিত্র-পরাসর-প্রভৃতয়ঃ বাতাম্বু পর্ণাশনাঃ
তেপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ
শাল্যান্নং দধি দুগ্ধ গোঘৃত যুতং যে ভুঞ্জতে মানবাঃ
তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবেৎ, বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরম্॥

ভাল কি মন্দ, তাদের ভূমিকা সৎ বা অসৎ লোকের এই কথাই শুধু বিবেচনা করেন। তার দ্বারা তাদের বাঁচা বা মরা, কোন্‌টার সম্ভাবনা বেশী তা নিয়ে মাথা ঘামান না।

১২। অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌॥

(১২) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), ফললাভের ইচ্ছায় বা লোক দেখানোর জন্য জাঁকজমক করে যে যজ্ঞ, তাকে রাজসিক বলে জেনো।

১৩। বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥

(১৩) যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত নয়, যাতে অন্ন বিতরণ করা হয় না, মন্ত্রপাঠ হয় না, দক্ষিণা দেওয়া হয় না যা শ্রদ্ধাবিহীন তাই তামস বলে পরিচিত।

অন্ন বিতরণ ও দক্ষিণা দেওয়া অন্যকে সাহায্য করার সূচক, তা না করলে সর্বকর্মই শুধু স্বার্থসিদ্ধি করা।

ত্রিবিধ তপস্যা।

১৪। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্‌।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

(১৪) দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ লোকেদের পূজা, শুদ্ধাচার, ন্যায়নিষ্ঠা, সংযম ও অহিংসা এই সবকে শরীরের তপস্যা বলে।

১৫। অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চযৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥

(১৫) যে বাক্যের কথন কারুর ক্ষোভের কারণ হয় না, যে বাক্য সত্য, প্রিয় ও হিতকারী, আর নিয়মিত বেদপাঠ এইগুলিকে বাঙ্ময় তপস্যা বলে।

"যা অপ্রিয় ও হিতকারী-এরকম কথার বক্তা ও শ্রোতা দুইই দুর্লভ।"[১]

১। অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা হি দুর্লভঃ। মহাভারতে শান্তিপর্ব, ৬৩,১৭।

যদি তোমার ঠোঁটকে আলগা না রাখতে চাও তবে পাঁচটা বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে; কি বলছ কাকে বলছ এবং কেমন করে, কখন এবং কোথায়।

"Uncensored Recollection" (W. E. Norris-এর Thirlby Hall, Vol. 1, p 35 দ্রষ্টব্য।

১৬। মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥

(১৬) মানসিক প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌনতা, আত্মসংযম, ভাবশুদ্ধি, এদের মানস তপস্যা বলে।

১৭। শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥

(১৭) ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত সমাহিতচিত্ত লোকের দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত উপরোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা সাত্ত্বিক বলে পরিচিত।

১৮। সৎকারমান পূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহপ্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥

(১৮) যশ, সম্মান ও ভক্তিভাজন হবার জন্য দম্ভের সহিত যে তপস্যা করা হয় তাকে রাজসিক বলে, তাহা অনিশ্চিত ও অস্থায়ী।

১৯। মূঢ়গ্রাহেনাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥

(১৯) যে তপস্যা নির্বোধ জিদের সঙ্গে আত্মপীড়ন দ্বারা করা হয় বা অন্যের ক্ষতি করার জন্য করা হয়, তাকে তামস তপস্যার উদাহরণ বলা হয়।

এইবার তিন রকম দানের কথা বলা হচ্ছে।

ত্রিবিধ দান।

২০। দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

(২০) যে দান কর্তব্য মনে করে প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে দেওয়া হয় এবং দেশ কাল ও পাত্রের উপযুক্ততা নির্ণয় করে দেওয়া হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।

এইপ্রকার দান থেকেই ক্রমশঃ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া সহজ হবে, "আত্মসমর্পণ"।

দরিদ্রকে দান করলে শুধু যে তাদের উপকার করা হয় তাই নয়, দাতারও উপকার হয়। যিনি দেন তিনি নিজেও কিছু পান।

২১।   যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥

(২১) কিন্তু যে দান প্রতিদানের প্রত্যাশা রেখে করা হয় কিম্বা ভবিষ্যতে লাভের আশায় বা যা দিয়ে মনোকষ্ট হয়, তাকে রাজসিক দান বলে।

২২।   অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥

(২২) এবং যে দান অনুপযুক্ত দেশ-কাল-পাত্রে অর্পিত হয়, অথবা অবজ্ঞার সহিত বা উপযুক্ত অনুষ্ঠান না করে, তাকে তামসিক দান বলে।

গুহ্য ধ্বনি "ওম্ তৎ সৎ"

২৩।   ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥

(২৩) "ওঁ তৎ সৎ" এই কথা তিনটিকে ব্রহ্মের ত্রিবিধ প্রতীক বলে বিবেচনা করা হয়। এই তিনটি দিয়ে পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞকে নির্দেশ দেওয়া হত।

' তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ সংখ্যক শ্লোক এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

"ওঁ" ব্রহ্মের পরম প্রাধান্য, তৎ তাঁর সার্বিকতা ও সৎ তাঁর বিদ্যমানতার নির্দেশক। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে "সচ্চতচ্চাভবৎ"।[১] সৎ (যা-আছে) এবং তৎ (যা তার পারে) হল। এ হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তাকে অতিক্রম করে যা তারই প্রতীক। সংবিতের তিনটি স্তরেরও এই শব্দগুলি সূচক। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি স্তর পেরিয়ে তুরীয় অবস্থায় পৌঁছাতে হয়। মাণ্ডূক্য উপনিষদ দ্রষ্টব্য। সপ্তম অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক শ্লোক ও অষ্টম অধ্যায়ের ১৩ সংখ্যক শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

২৪।   তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥

(২৪) সেইজন্য ব্রহ্মবাদীরা সর্বদা শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যার শুরুতে "ওঁ" শব্দ উচ্চারণ করেন।

১। দ্বিতীয়, ৬।

২৫। তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥

(২৫) এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরা ফলের প্রত্যাশা না রেখে যজ্ঞ, বহুবিধ দান ও তপস্যা অনুষ্ঠান "তৎ" শব্দ উচ্চারণ করে সম্পাদন করে।

২৬। সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥

(২৬) "সৎ" শব্দ বিদ্যমানতা ও সাধুভাবের অর্থে লাগানো হয়, কাজেই হে পার্থ (অর্জুন), প্রশস্ত কার্যের স্থলে "সৎ" কথাটি ব্যবহৃত হয়।

২৭। যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥

(২৭) যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে নিষ্ঠাকেও "সৎ" বলে এবং সেই উদ্দেশ্যে যে কোন কাজকেও "সৎ" বলে।

২৮। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥

(২৮) যে যজ্ঞ, দান বা তপস্যা অশ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পাদিত হয় তাকে "অসৎ" বলে। হে পার্থ (অর্জুন), তাতে ইহকালে বা পরকালে কোন কাজই হয় না।

ইতি······শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়।
ত্রিবিধ শ্রদ্ধা যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের এইখানেই শেষ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নিষ্পত্তি

কর্মত্যাগ নয়, কর্মফল ত্যাগই সন্ন্যাস।

অর্জুন উবাচ

১। সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক কেশিনিসূদন ॥

অর্জুন বললেন,

(১) হে মহাবাহো (কৃষ্ণ), হে হৃষীকেশ, কেশিনিসূদন (কৃষ্ণ), আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের আসল প্রকৃতি পৃথক পৃথক ভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

কর্মত্যাগ নয়, কর্মফলের বাসনা-বর্জিত কর্মের উপরই গীতার ঝোঁক। সে-ই আসল সন্ন্যাস। এই শ্লোকে সন্ন্যাস শব্দটি সকলপ্রকার কর্মত্যাগ বোঝাচ্ছে, আর ত্যাগ মানে সকলপ্রকার কর্মের ফলত্যাগ। কর্ম, কুল বা ঐশ্বর্য দ্বারা মোক্ষ পাওয়া যায় না, একমাত্র ত্যাগই মোক্ষের মার্গ।[১]

গীতার মতে মুক্ত আত্মা মোক্ষলাভের পরও সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারেন। সমস্ত কর্ম অবিদ্যাজাত এবং তত্ত্বজ্ঞান হলে কর্ম শেষ হয়, এই ধরনের মতে গীতার সমর্থন নেই। কর্মী মাত্রই বদ্ধ এবং মুক্ত ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন না, গীতার উপদেষ্টা এ মতকে ভ্রান্ত মনে করেন।

শ্রীভগবান উবাচ

২। কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

শ্রীভগবান বললেন,

(২) কাম্য বস্তুলাভের জন্য কর্মত্যাগকে প্রাজ্ঞরা সন্ন্যাস বলে জানেন। বিচক্ষণরা সর্ব কর্মফল বর্জনকে ত্যাগ বলেন।

১। ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, দশম, ১০, ৩।

জাড্য বা নিষ্ক্রিয়তা আদর্শ নয়। স্বার্থবুদ্ধিবিহীন, লাভপ্রত্যাশা-রহিত এবং "আমি কর্তা নই, আমি বিশ্বাত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করছি" এই ভাব সম্বলিত কর্মকেই আমাদের সামনে আদর্শ রূপে স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ কর্মবর্জন গীতার উপদেশ নয়, সকল কর্মকে নিষ্কাম কর্মে পরিবর্তিত করাই তার শিক্ষা।

শঙ্করাচার্য কিন্তু মনে করেন যে এখানে যে ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে সে শুধু কর্মযোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তত্ত্বজ্ঞানীদের পক্ষে কর্মত্যাগ একান্ত প্রয়োজন। তাঁর মতে কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গতি নেই।

৩। ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥

(৩) কোন কোন মনীষী বলেন: "কর্মকে দোষজ্ঞানে পরিত্যাগ করতে হবে; অন্যেরা বলেন: যজ্ঞ, দান, তপস্যা-রূপ কর্মকে পরিত্যাগ করা চলবে না।"

৪। নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥

(৪) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), ত্যাগের আসল কথা আমার কাছে শোন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), ত্যাগ তিন রকমের বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

রামানুজাচার্য ত্যাগকে তিন রকমে ভাগ করেছেন (১) ফলত্যাগ (২) "আত্মই কর্তা" এই ভাব ও তজ্জনিত আসক্তি ত্যাগ (৩) ঈশ্বরই সকল কর্মের কর্তা—এই উপলব্ধি করে সকলপ্রকার কর্তৃত্ব ভাব ত্যাগ।

৫। যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

(৫) যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকে ত্যাগ করতে হবে না, ওগুলি কর্তব্য, কেননা ঐ কর্মগুলি দ্বারা জ্ঞানীরা আত্মশুদ্ধি করেন।

"সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে, কেননা কর্মই বন্ধনের কারণ" এই মতের প্রতিকূলে গীতা স্পষ্টভাবে বলছে যজ্ঞ, তপ ও দান পরিত্যাজ্য নয়।[১]

১। ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞস্তপোদানমিতি।

৬। এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥

(৬) কিন্তু এই কর্মগুলিকেও নিরাসক্তভাবে ফলের প্রত্যাশা না রেখে করতে হবে। হে পার্থ (অর্জুন), এই হল আমার চরম ও দৃঢ় মত।

উপদেষ্টা স্পষ্টই কর্মযোগাভ্যাসের পক্ষপাতী। কর্মকে সরিয়ে দিলে চলবে না ; শুধু স্বার্থপ্রণোদিত আসক্তি বা ফলপ্রত্যাশা বাদ দিয়ে করতে হবে। মোক্ষ বাহ্য সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপার নয়। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ ও আন্তরিক অহমিকা ত্যাগের উপর তার প্রতিষ্ঠা।

শঙ্কর যে বলেছেন, সর্বকর্মত্যাগী জ্ঞানমার্গের সাধক সন্ন্যাসীর পক্ষে এ শ্লোক খাটে না, (জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সর্বকর্মসন্ন্যাসিনঃ), তা কিন্তু শ্লোকের ভাষা দ্বারা সমর্থিত হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪, ২২ সংখ্যক শ্লোকে আছে "ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা জানতে চায় এবং নিরাসক্ত ভাবে যজ্ঞ, দান ও তপশ্চর্যা সম্পাদন দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান হয়।"

৭। নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

(৭) আসলে কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ ঠিক নয়। যা করা উচিত অজ্ঞতাবশতঃ তা না করাকে তামসিক বলা হয়।

৮। দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥

(৮) দুঃখজনক বা শারীরিক ক্লেশদায়ক বলে কর্ম থেকে যে বিমুখতা তাকে রাজসিক ত্যাগ বলে। তাতে ত্যাগের কোন ফল পাওয়া যায় না।

৯। কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥

(৯) কর্তব্য-বোধে যে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা হয়, তাতে আসক্তি ও ফল প্রত্যাশা বর্জন করাকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে।

ব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে কার্য তাই কর্তব্য।

১০। ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্মকুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥

(১০) যে প্রাজ্ঞ ত্যাগী, সংশয়মুক্ত ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির, সে অপ্রিয় কর্তব্যে বিমুখ হয় না এবং প্রিয় কর্তব্যেও আসক্ত নয়।

১১। ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥

(১১) কোন দেহধারীর পক্ষে সম্পূর্ণ কর্মবিরত হয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু যে কর্মফল ত্যাগ করে, তাকেই ত্যাগী বলা হয়।

১২। অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥

(১২) যারা ত্যাগী নয়, পরলোকে তাদের কর্মফল তিন রকম হয়, প্রিয় অপ্রিয় বা উভয়েব মিশ্রণ, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কোন ফলই হয় না।

শঙ্করের মতে অত্যাগী অর্থে কর্মযোগী আর সন্ন্যাসী অর্থে যারা দেহ-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য ক্রিয়া ছাড়া সকল কর্মত্যাগ করেছে।

কর্ম-প্রকৃতির ক্রিয়া।

১৩। পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥

(১৩) হে মহাবাহো (অর্জুন), সর্বকর্মসিদ্ধির সাংখ্যবাদোক্ত পাঁচটি কারণের কথা আমার কাছে শেখো।

সাংখ্য অর্থ এখানে বেদান্ত। ইতি শঙ্করাচার্য।

কৃতান্তের ব্যাখ্যা হল কৃত যুগের শেষে, অর্থাৎ আদি সাংখ্যে যেমন শিক্ষা দেওয়া হত।

১৪। অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥

(১৪) কর্মক্ষেত্র, কর্তা, নানাবিধ উপকরণ, বিবিধ প্রয়াস এবং পঞ্চম দৈব।

অধিষ্ঠান বা আসন অর্থ এখানে আধিভৌতিক দেহ।

কর্তা—প্রয়োগকারী। শঙ্করাচার্যের মতে সে হল প্রাপঞ্চিক অহং, "উপাধি লক্ষণো অবিদ্যা কল্পিতো ভোক্তা", যে মানস-ভৌতিক আত্ম অঙ্গীকে আসল আত্ম বলে ভুল করে। রামানুজাচার্যের মতে কর্তা অর্থে জীবাত্মা, মধ্বাচার্যের মতে কর্তা—পরমেশ্বর বিষ্ণু।

কর্তা কর্মের পাঁচ কারণের একটি। সাংখ্যবাদ অনুসারে আত্ম বা পুরুষ দর্শক মাত্র। যদিও যথার্থভাবে বলতে গেলে পুরুষ অকর্তা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়,

কিন্তু তাঁর দর্শন থেকেই প্রকৃতির ক্রিয়া শুরু হয়, অতএব তাঁকেও কারণ স্বরূপ বলে ধরা হয়েছে।

চেষ্টা—প্রয়াস অর্থে দেহস্থ প্রাণশক্তির ক্রিয়া।

দৈবম্—বিধাতা। যে অমানুষী কারণ মানুষের প্রয়াসকে প্রভাবান্বিত করে, যে সর্বদ্রষ্টা প্রাজ্ঞ সংকল্প জগতে সর্বদা সক্রিয়। মানুষের সমস্ত কাজে একটা বেহিসাবী উপাদান সহায়তা করে বা বিঘ্ন ঘটায়, যাকে ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট বা পূর্বজন্মের কর্মফল বলা হয়। এখানে তাকেই দৈব বলা হয়েছে।[১] মানুষ শুধু কালের পুকুরে ঢেলা ফেলতে পারে, তা থেকে যে ছোট ছোট ঢেউ উঠবে তা কোন্ সুদূর কূলে আঘাত করবে, তা হয়ত সে দেখতেও পাবে না। আমরা বীজ পুঁততে পারি কিন্তু তার ফল নাও ভোগ করতে পারি, সেটা আমাদের চেয়ে উচ্চতর কর্তার হাতে। দৈব বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নিয়তি ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে সাধারণ প্রয়োজন, অতীতে যা-কিছু ঘটেছে, যা অগোচরে সব নিয়ন্ত্রণ করছে, তারই সমষ্টি। ব্যক্তির মধ্যে তার কাজ, তার নিজের হিসাব-বহির্ভূত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য।

দৈবকে বিশ্বাস করি বলে সব জিনিস মেনে নিতে হবে, তার কোন মানে নেই। মানুষ বিবর্তনের পাত্র। সে তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন। সে লক্ষ্য হল তার পশুজন্ম থেকে ঐশীভাবে উন্নয়ন। মানুষ সংকল্প দিয়ে প্রকৃতি, বংশগতি ও প্রতিবেশকে জয় করতে পারে।

১৫। শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥

(১৫) মানুষ কায়মনোবাক্যে যে কাজ আরম্ভ করে, তা ভালই হোক বা মন্দই হোক, এই পাঁচটি তার কারণ।

১৬। তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥

(১৬) অতএব যে দুর্মতিরা অমার্জিত বুদ্ধি হেতু নিজেকে একমাত্র কর্মসম্পাদক ভাবে, সে (সত্য) দেখতে পায় না।

কর্তা পাঁচ কারণের একটি মাত্র, কাজেই সে যখন তাকেই একমাত্র হেতু ভাবে তখন সে তথ্যগুলিকে ভুল বোঝে।

১। পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে। হিতোপদেশ।

শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা শুদ্ধ আত্মকে কর্তা ভাবে। সে যদি শুদ্ধ আত্মতে কর্তৃত্ব আরোপ করে, তাহলে ভুল করছে। অহংকে কর্তা বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু সে মানুষের কাজের মুখ্য নিয়ামকদের অন্যতম মাত্র। এই মুখ্য নিয়ামকগুলি সবই প্রকৃতিজ। অহংকে অহং বলে বুঝতে পাবলে তার বন্ধনকারী প্রভাব কেটে যায় এবং আমরা বিশ্বাত্মার মহত্তর জ্ঞানের আলোকে জীবন কাটাই এবং সেই আত্মদর্শনের কাছে সমস্ত কর্মই প্রকৃতিজ বলে বোঝা যায়।

১৭। যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্নহন্তি ন নিবধ্যতে ॥

(১৭) যে অহং ভাব-মুক্ত এবং যার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় নি, সে এই সব লোককে হত্যা করলেও সে হন্তা নয় এবং (তার কর্ম দ্বারা) আবদ্ধও হয় না।

মুক্তপুরুষ সার্বভৌম আত্মাব যন্ত্ররূপে ও বিশ্ববিন্যাস রক্ষা করার জন্য কাজে লিপ্ত হয়। সে যদি ভয়ঙ্কর কার্যও করে তো তার মধ্যে কোন স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্য বা বাসনা থাকে না, সে সেটা নির্দিষ্ট কর্তব্য বলেই মনে করে। কি কাজ সেটা বড় কথা নয়, কিভাবে করা হচ্ছে সেইটাই কথা। "ঐহিক দিক থেকে সে হন্তা হলেও, সে সত্য সত্য হন্তা নয়।" ইতি শঙ্কর।[১]

এ শ্লোকের এ অর্থ নয় যে আমরা বিনা দ্বিধায় অপরাধে লিপ্ত হতে পারি। যিনি মহান্ আধ্যাত্মিক বুদ্ধি নিয়ে জীবন কাটাবেন, তাঁর কোন অন্যায় করার প্রয়োজন হবে না। মন্দ কাজ মূঢ়তা থেকে এবং ভেদবুদ্ধি থেকে জন্মায়। পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব বোধ থেকে কল্যাণময় কাজই উদ্ভূত হতে পারে।

জ্ঞান ও কর্ম।

১৮। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥

(১৮) জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতা, কর্মপ্রেরণার এই তিন প্রকার হেতু। উপকরণ, কর্ম ও কর্তা কার্যের এই ত্রিবিধ উপাদান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২০ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১। লৌকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য হত্বাপি……পারমার্থিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য ন হন্তি।

কর্মচোদনা অর্থে মানসিক পরিকল্পনা এবং কর্মসংগ্রহ মানে আসল কর্ম সম্পাদন। এই দুইয়েরই তিন দিক আছে।

১৯। জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥

(১৯) জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা গুণসাংখ্যমতে গুণভেদে তিন প্রকার। তাদের কথা এইবার শোন।

সাংখ্য পদ্ধতির কথা এখানে বলা হচ্ছে, কেননা এসব ব্যাপারে তা প্রামাণ্য যদিও পরম সত্য সম্বন্ধে নয়।

ত্রিবিধ জ্ঞান।

২০। সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

(২০) যে জ্ঞান দ্বারা অবিনশ্বরকে সর্বভূতে দেখা যায়, বিচ্ছিন্নের মধ্যে অবিচ্ছিন্নকে দেখা যায়, তাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

২১। পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান পৃথগ্ বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥

(২১) যে জ্ঞানে বহুবিধ বস্তুকে পৃথক বলে, ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি বলে মনে হয়, তাকে রাজসিক জ্ঞান বলে।

২২। যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥

(২২) যাতে কারণের কথা বিবেচনা না করে, তত্ত্বার্থ না বুঝতে পেরে এক সঙ্কীর্ণ পরিণতিকে সমগ্র বলে মনে হয়, সেই জ্ঞানকে তামসিক বলা হয়।

ত্রিবিধ কর্ম।

২৩। নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥

(২৩) যে নির্দিষ্ট কর্তব্য নিরাসক্তভাবে অনুরাগ-বিরাগ নিরপেক্ষ হয়ে, ফলপ্রত্যাশা না রেখে করা হয় তাকে সাত্ত্বিক কার্য বলে।

২৪। যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্॥

(২৪) বহুআয়াসে নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বা অহঙ্কার-প্রণোদিত হয়ে যে কাজ করা হয়, তাকে রাজসিক কর্ম বলা হয়।

বহুলায়াসম্—খুব কষ্ট করে।

পীড়ার চেতনা, একটা অপ্রিয় কার্য করছি এই ভাব, যেন আমরা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও কষ্টসাধ্য কার্য করছি এইরূপ উপলব্ধি কর্মের মূল্য হ্রাস করে। আমরা একটা মহৎ কার্য করছি এ সম্বন্ধে সচেতনতা, আমরা একটা বড় রকম আত্মোৎসর্গ করছি এইরকম মনোভাব, উৎসর্গের ব্যর্থতা থেকেই আসে। কিন্তু মহদুদ্দেশ্যে কর্মগ্রহণ করলে যে প্রেয় কাজ, তার জন্য আত্মত্যাগকে ত্যাগ বলে মনেই হয় না। কর্তব্য-বোধ থেকে অপ্রিয় কার্য করা এবং সর্বক্ষণ তার অপ্রিয়তা বোধ করাকেই রাজসিক ভাব বলে, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতনারহিত হয়ে হাসিমুখে, যেমন করে সক্রেতিস বিষপান করেছিলেন, সেইভাবে কাজ করাকেই সাত্ত্বিক বলে। এ হল প্রেয় কার্য ও বিহিত কার্য, প্রসাদজাত কার্য ও বাধ্যতামূলক কার্যের তফাৎ।

২৫। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥

(২৫) অজ্ঞতা বশতঃ যে কর্মের প্রারম্ভ, যে কার্যের কি ফল হবে, ক্ষতি হবে কি হানি হবে, চিন্তা না করেই কাজ করা হয়, সে কাজ করার ক্ষমতা আছে কিনা তাও বিবেচনা করা হয় না, তাকে তামসিক কর্ম বলে।

অন্যের উপর আরব্ধ কর্মের কি প্রভাব পড়বে সেকথা সর্বদা ভাবতে হবে, কেবল স্বার্থচিন্তাই বর্জন করতে হবে।

ত্রিবিধ কর্তা।

২৬। মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতেঃ ॥

(২৬) যে কর্মী আসক্তিবর্জিত, আত্মাভিমানহীন, দৃঢ়সংকল্প ও উদ্যমী, সফলতা বা বিফলতায় যাকে বিচলিত করতে পারে না, তাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলে।

২৭। রাগী কর্মফল প্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

(২৭) যে কর্মী আবেগপ্রবণ, কর্মফল লাভে উৎসুক, লুব্ধ, হানিকর প্রকৃতির, অশুচি ও সুখ-দুঃখে উদ্বেজিত, তাকে রাজসিক কর্তা বলে।

২৮। অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥

(২৮) অসমাহিত, অমার্জিত, জেদী, প্রতারক, দ্বেষী, অলস, বিষণ্ণ ও দীর্ঘসূত্রী লোককে তামস প্রকৃতির কর্তা বলে।

প্রাকৃত—"বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ সংস্কৃতিহীন ও শিশুপ্রকৃতির" ; ইতি শঙ্করাচার্য।

ত্রিবিধ বুদ্ধি।

২৯। বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥

(২৯) হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), এখন বুদ্ধি ও দৃঢ়চিত্ততার গুণানুযায়ী তিন রকমের সম্পূর্ণ ও পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা শোন।

৩০। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

(৩০) হে পার্থ (অর্জুন), যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির রহস্য জানে, কি কর্তব্য আর কি অকর্তব্য, কাকে ভয় করতে হবে এবং কাকে ভয় নেই, কিসে আত্মার বন্ধন হয় আর কিসে তার মুক্তি হয় তা বিনিশ্চয় করতে পারে, তাকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে।

৩১। যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যং চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥

(৩১) হে পার্থ, যার দ্বারা ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে অযথা ভাবে জ্ঞান জন্মায়, তাকে রাজসিক বুদ্ধি বলা যায়।

৩২। অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

(৩২) হে পার্থ, যে তমসাবৃত বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম বলে বোঝে এবং সমস্ত বস্তুকে বিপরীত ভাবে (অসত্য রূপে) ধারণা করে, তাকে তামসিক বলে।

ত্রিবিধ ধৃতি।

৩৩। ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

(৩৩) হে পার্থ, যে অবিচলিত স্থৈর্য দ্বারা যোগাভ্যাস পূর্বক মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাকেই সাত্ত্বিক দৃঢ়চিত্ততা বলে।

ধৃতি—যে স্থির মনসংযোগ দ্বারা আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যা বুঝতে বা ধরতে পারি না, তারও উপলব্ধি হয়। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ থেকে বিচ্ছিন্নতা যত বেশী হয়, ধৃতির শক্তি ততই বাড়ে।

৩৪। যয়া তু ধর্মকামার্থান ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥

(৩৪) হে পার্থ, যার দ্বারা ধর্ম অর্থ কামের ব্যাপারে অভিনিবেশ সহকারে লিপ্ত থাকা যায় এবং তাদের ফলাকাঙ্ক্ষী করা হয়, সেই রকম দৃঢ়চিত্ততাকে রাজসিক বলে।

৩৫। যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেবচ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥

(৩৫) হে পার্থ, যার দ্বারা নির্বোধ ব্যক্তিরা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ না করে তাদেরই আশ্রয় করে থাকে, সেই রকম অভিনিবেশকে তামসিক বলে।

ত্রিবিধ সুখ।

৩৬। সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥

(৩৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), এইবার আমার কাছে তিন রকমের সুখের কথা শোন। বহুদিনের অভ্যাসে যে সুখের তাৎপর্য বোঝা যায় এবং যার মধ্যে দুঃখের অবসান হয়—

৩৭। যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥

(৩৭) যে সুখ প্রথমে বিষবৎ মনে হলেও পরিণামে অমৃততুল্য হয় এবং যা নির্মল আত্মবুদ্ধি থেকে জন্মায়, তাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে।

৩৮। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥

(৩৮) ইন্দ্রিয়সমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের সংযোগে যে সুখ উদ্ভূত হয় এবং যা প্রথমে অমৃততুল্য মনে হলেও পরে বিষবৎ হয়, তাকে রাজসিক সুখ বলে।

৩৯। যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎতামসমুদাহৃতম্॥

(৩৯) যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে উভয় সময়েই আত্মাকে বিমোহিত করে এবং নিদ্রা আলস্য অনবধান যার উৎস, তাকে তামসিক সুখ বলা হয়।

সুখ জীবনের সার্বিক উদ্দেশ্য। আমাদের প্রকৃতিতে যে গুণের আধিক্য সেই অনুযায়ী সুখের প্রভেদ হয়। আমাদের স্বভাব যদি তমপ্রধান হয়, তবে আমরা হিংসা, জাড্য, অন্ধতা ও ভ্রান্তিতেই সন্তুষ্ট থাকব। আমাদের স্বভাব রজপ্রধান হলে ধন, শক্তি, গর্ব ও গৌরব থেকে আমরা সুখ পাই। কিন্তু বাহ্য বস্তু আয়ত্তে আনার মধ্যে মানুষের সত্যকার সুখ নেই। আমাদের আন্তরিক উন্নয়ন দ্বারা উচ্চতর মন ও ভাবের সিদ্ধির মধ্যেই সত্য সুখ। তাতে হয়ত যন্ত্রণা পেতে হবে বা সংযমের প্রয়োজন হবে, কিন্তু পরিণতিতে আনন্দ ও মুক্তি পাওয়া যাবে। যখন আমরা পরমাত্মার সঙ্গে ও সর্বভূতের সঙ্গে একাত্মবোধ উপলব্ধি করি, তখন জ্ঞান ও সদাচারজনিত সুখ চিরন্তন শান্তি ও আনন্দে পর্যবসিত হয়।

স্বভাব ও স্বধর্ম দ্বারা কর্তব্য নির্ধারণ।

৪০। ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগুণৈঃ॥

(৪০) পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে, এমন কেউ নেই যে প্রকৃতিজ তিন গুণ বর্জিত।

৪১। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগুণৈঃ॥

(৪১) হে শত্রুজয়ী (অর্জুন), ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের কার্যাবলী, তাদের স্বভাবজ গুণ দ্বারা বিভিন্ন হয়।

চতুর্বিধ বর্ণ-ব্যবস্থা হিন্দুদের নিজস্ব বিশেষত্ব নয়। এর প্রয়োগ সর্বত্র।

এই শ্রেণীবিভাগ মানবপ্রকৃতির বিভেদের উপর স্থাপিত। চারি বর্ণের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও এক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অন্য শ্রেণীতে থাকতে পারে না এমন কোন কথা নেই এবং সে বৈশিষ্ট্য সব সময় বংশগতি মেনেও চলে না।

বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় অনড়তা ও জটিলতার সমর্থনে গীতায় প্রমাণ ব্যবহার করা যায় না। গীতায় চাতুর্বর্ণ্যবাদকে স্বীকার করে তার অর্থ ও ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা হয়েছে। মানুষের বাহ্যজীবনে তার অন্তর্লোকের প্রকাশ থাকা চাই, উপরতলে গভীরতার প্রতিফলন হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব অন্তর্লীন প্রকৃতি (স্বভাব) আছে এবং তাকে তার জীবনে সার্থক করে তোলা তার কর্তব্য (স্বধর্ম)। প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রহ্মের এক অধিশ্রয়ণ বিন্দু ও দিব্যের এক খণ্ড। তার জীবনের এই দিব্য সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করাই তার নিয়তি। বিশ্বের অনন্য আত্মা জগতের বহুল আত্মার উৎস, কিন্তু দিব্য ভাব আমাদের প্রকৃতির অপরিহার্য উপাদান, আমাদের সত্যকার সত্তা, স্বভাব। আমাদের আত্মা গুণসমূহ প্রয়োগের যন্ত্রমাত্র নয়, গুণসকল শুধু প্রকাশের মাধ্যম। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার উপযুক্ত কার্য করে, তার স্বধর্মের বিধান মেনে চলে, তাহলে ভগবান মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যেই নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেন। জগতের পক্ষে যা কিছু অপরিহার্য তা সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই ঘটতে পারে। কিন্তু মানুষের যা করা উচিত তা সে খুব বিরল ক্ষেত্রেই করে থাকে। যখন সে সমগ্রের নক্শা জানে এই অভিমানে ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, তখনই পৃথিবীতে উপদ্রবের সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ আমরা আমাদের স্বভাবানুযায়ী কার্য করে যাই, ততক্ষণ আমরা ন্যায়পথে চলি এবং আমরা যদি আমাদের কর্ম ঈশ্বরে নিবেদন করি তা হলে আমাদের কর্মই আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার উপায় হয়ে ওঠে। প্রাতিস্বিকের মধ্যে দিব্য বিকাশ যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় তখন সে চিরন্তন অবিনশ্বর অবস্থা লাভ করে, "শাশ্বতং পদমব্যয়ম্"।[১] মনুষ্যজীবনের সমস্যা হল আমাদের সত্যকার সত্তা আবিষ্কার করা এবং সেই সত্যের আলোকে জীবনকে চালিত করা, তা যদি না করি তো আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের অপরাধ হবে। মানুষের স্বভাবানুযায়ী চলবার দিকে ঝোঁক

১। অষ্টাদশ, ৫৬।

দেওয়ার মানেই হল তাকে প্রাতিস্বিক বলে স্বীকার করা, সে শুধু একটা বিশেষ ধরনের নিদর্শন নয়। অর্জুনকে বলা হচ্ছে, যে যোদ্ধা বীরের মত যুদ্ধ করে, সে জ্ঞান-উদ্ভূত শান্তির উপযুক্ত হয়।

প্রকৃতির মোটামুটি চার ধরনের আদর্শ আছে এবং তার উপযুক্ত চার ধরনের সামাজিক জীবন আছে। কুল বা গাত্রচর্মের বর্ণ দ্বারা এই শ্রেণী-বিভাগ নির্ধারিত হয় না। সমাজে বিশিষ্ট ভূমিকার উপযুক্ত করার জন্য যে মানসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাই এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি।

৪২। শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥

(৪২) শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমাশীলতা এবং ঋজুতা, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান ও ধর্মনিষ্ঠা এইগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজ কর্তব্য।

ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেদের মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী প্রত্যাশা করা যায়। ধর্মপদের ৩৯৩ তুলনীয়: "জটা, কুল বা বংশ দিয়ে ব্রাহ্মণ হয় না। যার মধ্যে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ।" ক্ষমতা অন্তর্দৃষ্টিকে ভ্রষ্ট ও অন্ধ করে। অসংযত ক্ষমতা মানসিক ভারসাম্যের পক্ষে মারাত্মক। এইজন্য ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ ক্ষমতালাভের চেষ্টা না করে প্রীতির মাধ্যমে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্ষমতাধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ন্যায়পথ থেকে বিচলিত হওয়া নিবারণ করে।

৪৩। শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥

(৪৩) শৌর্য, তেজ, দৃঢ়চিত্ততা, কর্মদক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন প্রবৃত্তির অভাব, উদারতা ও নেতৃত্ব ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজ কর্তব্য।

ক্ষত্রিয়েরা আধ্যাত্মিক জগতে নেতৃত্বের দাবী করতে সক্ষম না হলেও তাদের যা গুণ আছে তার দ্বারা তারা আধ্যাত্মিক সত্যকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী করে তুলতে পারে।

৪৪। কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

(৪৪) কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য বৈশ্যদের এবং পরিচর্যা শূদ্রদের স্বভাবজ কর্তব্য।

সকল লোককে সামাজিক জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় ওঠার জন্য অভিন্ন সুযোগ দেওয়াটা যথার্থ প্রশ্ন নয়, কেননা মানুষের ক্ষমতা বিভিন্ন। তাদের

সমান সুযোগ দেওয়াই প্রয়োজন, যাতে তারা তাদের নিজস্ব স্বভাবকে সার্থক করে তুলতে পারে। প্রত্যেকের মানবিক পরিপূর্ণতা লাভ করার, তাদের অবস্থা ও প্রয়াস অনুযায়ী জ্ঞান ও ধর্মের ফললাভে সিদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাওয়া উচিত। আমরা মাটি খুঁড়ছি, কি ব্যবসা করছি, রাজত্ব করছি বা গুহায় বসে ধ্যান করছি এতে সামান্যই তফাৎ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম স্বীকার করে যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সাধারণ কল্যাণের জন্য অবদান যোগায়, সকলেই যে সমস্ত জরুরী অভাব সম্বন্ধে সচেতন তারা সেইগুলিই সরাসরি পূরণ করে এবং এইভাবে নিজের জীবনে ও কর্মে সত্য ও সুন্দরের সাক্ষ্য দেয়। মানবসমাজ বৃত্তিমূলক সংগঠন এবং সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য যে যে বৃত্তি অপরিহার্য তাদের সকলকেই সমাজে সমান স্থান দেওয়া উচিত। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সজীব অঙ্গীভূত সমাজে গ্রথিত থাকে। গণতন্ত্রে অসম্ভব সাম্যের প্রয়াস নেই, তার সাধনা আঙ্গিক বৈচিত্র্যের। ক্ষমতানুযায়ী সকল মানুষ সমান নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই সমাজের পক্ষে সমান ভাবে প্রয়োজন এবং তাদের বিভিন্ন অবস্থা থেকে সামাজিক অবদানের মূল্য সমান।[১]

১। মিঃ জেরাল্‌ড হার্ড (Gerald Heard) তাঁর Man the Master (1942) নামক গ্রন্থে "সামাজিক সংগঠনে চতুর্বিধ বিভাগে"র প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি লিখছেন: "বেশ দেখা যাচ্ছে যে মনুষ্যসমাজে চিরকালই চেতনার চার ধরন বা স্তর আছে। প্রথম স্তরের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারা চক্ষু বা গুরু, অনাগত দ্রষ্টা বা সুবেদী…চোখের নীচে হাত দুটি, মস্তিষ্কের পুরোভাগের পশ্চাতে চালন-কেন্দ্রগুলি। দ্রষ্টাদের নীচের মানসিক দুই শ্রেণী: উচ্চ ও নিম্নমধ্যবিত্ত, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ এবং যন্ত্রকুশলী—তাদের জন্যই আমাদের বর্তমান সঙ্কটের সৃষ্টি। প্রথম শ্রেণী প্রশাসন পদ্ধতির প্রগতি ও সামাজিক সংগঠনের উন্নয়ন দ্বারা আজকালকার বিরাট রাষ্ট্রীয় উৎপত্তি সম্ভব করেছে। এবং তার জন্যই তাদের আন্তরিক অমীমাংসিত চাপ তীব্র হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়েরা যন্ত্রে, শক্তি উৎপাদক কারখানায়, বাস্তব কৌশলের আরও বেশী প্রায়োগিক উন্নতি দ্বারা আমাদের সমাজকে এমন স্ফীত করে তুলেছে যে তারা অসম আন্তরিক গঠনের এবং পরস্পরের প্রতি মারাত্মক অঙ্গে পরিণত হয়েছে। দুই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রাতিস্বিকীতে সিদ্ধ হওয়াতে অস্থির ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের বাদ দিলে রইল বৈশিষ্ট্য-বর্জিত, সংশয়রহিত মৌলিক শ্রেণী বা জনতা, যাদের ভূমিকা সংলগ্নকারীর। এদের যে শুধু শ্রদ্ধা করার ক্ষমতা আছে তাই নয়, তারা শ্রদ্ধা ছাড়া থাকতে পারে না। কারুর উপর বিশ্বাস না থাকলে তারা একত্র থাকতে পারে না।" (১৩৬-৭ পৃষ্ঠা) লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: "যে আর্য সংস্কৃত চিন্তাধারা সমাজের চতুর্বিধ বিভাগের সংজ্ঞা ও বর্ণনা দিয়েছে, তা যতখানি ভারতীয় ততখানিই আমাদের।" (১৪৫ পৃঃ)

৪৫। স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥

(৪৫) নিজ নিজ কর্তব্যের উপর নিষ্ঠা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়। নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে লোকে কিভাবে সিদ্ধিলাভ করে তা শোন।

স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ—নিজ নিজ কর্তব্যে নিষ্ঠার সহিত রত। আমাদের প্রত্যেকের নিজের স্তরে আমাদের অনুভূতি ও স্বভাবের আবেগের প্রতি অনুরক্ত থাকা উচিত। আমাদের স্বভাবের স্তরের অতীত কর্ম করতে যাওয়া বিপজ্জনক। আমাদের স্বভাবের শক্তির আয়ত্তের মধ্যে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ লিপ্ত থাকা প্রয়োজন।

৪৬। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

(৪৬) সর্বভূতের উৎপত্তির যিনি কারণ এবং যিনি সর্বব্যাপী তাঁকে স্বকর্তব্য সম্পাদন দ্বারা অর্চনা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।

কর্মই সর্বেশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন।

গীতার মতে বৃত্তিমূলক বিভাগের ভিত্তি গুণ ও ক্ষমতা। জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে গীতায় বলা হয়েছে যে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি তার অতীত জন্মের কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। সিদ্ধির সকল আকার একই দিকে পাওয়া যায় না। নিজের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভের প্রয়াসই করুক বা কারুকলার জন্যই উৎসর্গীকৃত হোক বা সতীর্থের সেবায়ই নিয়োজিত হোক, প্রত্যেকেই নিজের উর্ধ্বে লক্ষ্য স্থির করে নিজেকে অতিক্রম করে যেতে চায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৮ ও ৬০ সংখ্যক শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

৪৭। শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

(৪৭) অন্যের ধর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করার চেয়ে নিজের ধর্মানুযায়ী কর্ম ত্রুটিপূর্ণভাবে করাও ভাল। নিজ স্বভাবনির্দিষ্ট কার্যে পাপ হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ কার্যে মনোসংযোগ করায় সুফল হয় না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা পরিণামিতার ভাব আছে, যাকে দিব্য আত্মপ্রকাশের ভাব বলা যায়। আমাদের সত্যকার প্রকৃতি, স্বভাবই—আমাদের বিবিধ কর্মে আংশিকভাবে ব্যক্ত হয়। আমাদের চিন্তায় উচ্চাভিলাষে ও প্রয়াসে তার নিয়ন্ত্রণ মেনে

চললেই আমরা ক্রমশঃ আমাদের অন্তরাত্মার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারি। যে সামাজিক পদ্ধতিকে আমরা গণতন্ত্র বলি, তাতে প্রত্যেক মানুষের অনন্য ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে তাকে শ্রদ্ধা করার প্রয়োজনীয়তা শেখায়। আমাদের কোন লোককেই অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়, কেননা সে এমন কিছু করতে পারে যা অপরে পারবে না।

৪৮। সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥

(৪৮) হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম দুষ্য হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা সকল প্রকার কর্মোদ্যমই ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির মত দোষাবৃত থাকে।

কর্মযোগ ও পরমসিদ্ধি।

৪৯। অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥

(৪৯) যার বুদ্ধি সর্বত্র অনাসক্ত, যে আত্মজয়ী ও বিগতস্পৃহ, সে সন্ন্যাস দ্বারা সকল কর্মাতীত পরমসিদ্ধি লাভ করেন।

গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে সংযম ও বাসনাহীনতা আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের পক্ষে অপরিহার্য। বিষয়াসক্তি ও অহমিকা আমাদের অধম প্রকৃতির লক্ষণ। আমাদের আত্মস্থ ও আত্মদীপ্ত সত্যকার আত্মাকে যদি জানার মত অবস্থায় উন্নীত হতে হয় তাহলে আমাদের অধম প্রকৃতির মূঢ়তা, জাড্য ও পার্থিব বিষয়বাসনা ইত্যাদিকে জয় করতে হবে।

নৈষ্কর্ম্য—সকল কর্মের অতীত অবস্থা। সকল কাজ থেকে বিমুখ হওয়ার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। আমরা যতদিন দেহ ধারণ করে আছি ততদিন তা সম্ভব নয়। গীতা আন্তরিক ত্যাগের কথা বলছে। অহং ও প্রকৃতি এক রকমের বলে মুক্ত আত্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করে; যাকে নিঃশব্দ, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধাত্মা বলা হয়। তিনি প্রকৃতি কি তা জেনে প্রাকৃতিক জগতে কর্মে লিপ্ত হন। এখানে চরমাবস্থাকে ব্রহ্মে লীন হওয়া রূপে না বর্ণনা করে কাম থেকে মোক্ষরূপে নেতিভাবে দেখানো হয়েছে।

সিদ্ধি ও ব্রহ্ম।

৫০। সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥

(৫০) হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), সিদ্ধপুরুষ কিভাবে সকল জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, ব্রহ্মত্ব, লাভ করে তা আমার কাছে সংক্ষেপে শোন।

শঙ্কর বলছেন: "যদিও ব্রহ্মকে এইভাবে স্বয়ংসিদ্ধ সহজবোধ্য, অতি নিকট ও অহংভূত রূপে দেখা যায়, যারা মূঢ়, যাদের বুদ্ধি অজ্ঞতাজনিত নামরূপ নির্ণীত পার্থক্য দ্বারা বিপথগামী হয়, তারা তাঁকে অজ্ঞাত, দুর্জ্ঞেয়, অতিদূর, যেন এক অপর বস্তু বলে মনে করে।"[১] যেমন নিজের দেহকে জানবার জন্য কোন প্রমাণ প্রয়োগের দরকার হয় না, তেমনি দেহের থেকে আপন যে আত্মা তাকে জানবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগের দরকার হয় না। বাহ্য জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের বুদ্ধিকে যদি যথোচিত মার্জিত করতে পারি, তাহলেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারব। নবম অধ্যায়ের ২ সংখ্যক শ্লোক এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৫১। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥

(৫১) শুদ্ধ বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে, দৃঢ়ভাবে আত্মসংযম করে, শব্দাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বিমুখ হয়ে এবং অনুরাগ বিরাগ বর্জন করে—

৫২। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥

(৫২) নির্জনে বাস করে, লঘু আহার করে, কায়মনোবাক্যে সংযত হয়ে সর্বদা ধ্যান ও যোগমগ্ন হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে—

ধ্যানযোগ—এখানে দ্বন্দ্ব সমাস বলে ধরতে হবে, তার অর্থ "আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধ্যান ও মনকে তার উপর একাগ্র করা"—ইতি শঙ্করাচার্য।

৫৩। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(৫৩) অহঙ্কার, বল, দর্প, কামনা, ক্রোধ, সম্পদ ও নিজ দেহ

১। অবিদ্যাকল্পিত নামরূপবিশেষাকারাপহৃত বুদ্ধীনামত্যন্ত প্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্মভূতমপ্যপ্রসিদ্ধং দুর্বিজ্ঞেয়মতিদূরমন্যদিব চ প্রতিভাতি অবিবেকিনাম্।

ও মন প্রতি মমতা বর্জন করে শান্ত চিত্তে সে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির যোগ্য হয়।

আত্তার ইব্রাহিম অধমের এক উক্তি উদ্ধার করেছেন: "সুখের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার আগে তীর্থযাত্রীর অন্তর থেকে তিনটি আবরণকে অপসৃত করতে হবে। প্রথম, ইহলোক-পরলোকের উপর প্রভুত্ব যদি চিরকালের জন্যও তাকে দেওয়া হয়, তাহলেও তার আনন্দ হওয়া উচিত নয়, কেননা সৃষ্ট বস্তুর জন্য আনন্দের অর্থই লোভ এবং লোভীর কখনও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। দ্বিতীয় আবরণ এই যে যদিও উভয় জগৎই তার আয়ত্তে থাকে এবং পরে যদি তা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়, তা হলেও তার ক্ষতির জন্য তার দুঃখ হওয়া উচিত নয়। কেননা এ হল ক্ষোভের লক্ষণ এবং বিক্ষুব্ধ লোকেরা যন্ত্রণা পায়। তৃতীয় হল যে তার কোন স্তুতি বা অনুগ্রহ দ্বারা মুগ্ধ হওয়া উচিত হবে না, কেননা যে এর দ্বারা মুগ্ধ হয়, তার মন ছোট এবং (সত্য) তার কাছে আচ্ছন্ন। সাধককে উচ্চমনা হতে হবে।" Browne, *Literary History of Persia* Vol. I (1902), ৪২৫ পৃষ্ঠা।

পরমা ভক্তি।

৫৪। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

(৫৪) ব্রহ্মে লীন ও প্রসন্নাত্মা হয়ে সে শোকও করে না, কিছু কামনাও করে না। সর্বভূতকে সমদৃষ্টিতে দেখে যে আমার প্রতি পরমা ভক্তির অধিকারী হয়।

এই শ্লোকে আবার বোঝা যাচ্ছে যে গীতার শিক্ষায় নিরাকার পরমব্রহ্মে ব্যক্তির নির্বাণলাভ সর্বোচ্চ সিদ্ধি নয়, যে পরমেশ্বরের মধ্যে সমস্ত চরাচর বিদ্যমান তাঁর উপর ভক্তিই চরম লক্ষ্য।

৫৫। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

(৫৫) ভক্তি দ্বারা সে আমাকে জানতে পারে, আমি কতখানি এবং আমি সত্য সত্য কে তাও জানে। তার পর আমার সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সে আমাতে তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্ট হয়।

জ্ঞাতা বা ভক্ত পরমেশ্বর সম্পূর্ণাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে আত্মজ্ঞান ও আত্ম-

অভিজ্ঞতায় এক হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞান ও পরমাভক্তির একই লক্ষ্য। ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থই ঈশ্বরকে ভালবাসা, তাঁকে পরিপূর্ণরূপে জানা এবং তাঁর সত্তায় প্রবিষ্ট হওয়া।

অর্জুনের ক্ষেত্রে উপদেশের প্রয়োগ।

৫৬। সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥

(৫৬) যা কিছু করণীয়, তা আমাকে অবিশ্রান্তভাবে আশ্রয় করে করলে সাধক আমার প্রসাদে শাশ্বত অমর আশ্রয় লাভ করে।

কর্মযোগেরও এই লক্ষ্য। এই তিনটি শ্লোকে গীতা রচয়িতা দেখাচ্ছেন যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম একত্রেই থাকে। কেবল কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় মনে রাখতে হয় যে প্রকৃতি দিব্যের শক্তি এবং ব্যক্তি শুধু ঈশ্বরের যন্ত্র মাত্র। নিত্যের প্রতি অন্তরকে স্থিত করে ভগবৎ প্রসাদে সে যা করুক না কেন, সে চিরকাল মহান ধামে বাস করে।

৫৭। চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥

(৫৭) মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে, আমাকেই সর্বেশ্বর জেনে বুদ্ধিকে দৃঢ়নিবদ্ধ করে সর্বদা তোমার চিন্তা আমাতে স্থিত কর।

"সর্বদা অন্তরে, সংকল্পে, চেতনায় আমার সঙ্গে এক হও"। বিশ্বেশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করতে পারলে তিনিই আমাদের জীবনের সার হন।

৫৮। মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥

(৫৮) আমাতে স্থিতচিত্ত হয়ে তুমি আমার প্রসাদে সকল দুর্গমকে অতিক্রম করে যাবে, কিন্তু তুমি যদি অহঙ্কারবশতঃ (আমার) কথা না শোন তা হলে বিনষ্ট হবে।

মুক্তি বা উৎসাদন বেছে নেবার স্বাধীনতা মানুষের আছে। আমরা সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরোধিতা করতে পারি, এইরকম ধারণা যদি আমাদের প্রিয় হয় তো আমাদের অদৃষ্টে দুঃখ আছে। ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করার ভাবের উৎপত্তি অহঙ্কার থেকে এবং অহঙ্কার অন্তিমে শক্তিহীন।

৫৯। যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥

(৫৯) যদি অহঙ্কার অবলম্বন করে তুমি মনে কর "আমি যুদ্ধ করব না" তাহলে তোমার সে সংকল্প বৃথা। প্রকৃতি তোমাকে বাধ্য করবে।

যুদ্ধ না করার ইচ্ছা তার প্রকৃতির ভাসা-ভাসা অভিব্যক্তি, তার গভীর সত্তা তাকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। সন্তাপের ভয়ে যদি সে অস্ত্র পরিত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে এবং তাঁকে বাদ দিয়েই যদি যুদ্ধ চলতে থাকে এবং সে বুঝতে পারে যে তার নির্লিপ্তির ফল মানবসমাজের পক্ষে সর্বনাশা হবে, তাহলে বিশ্বাত্মার অমোঘ চাপে তাকে অস্ত্রগ্রহণ করতে বাধ্য করবে। কাজেই তার উচিত ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে তাকে এগিয়ে দেওয়া, তাকে অস্বীকার করে তার বিরোধিতা করে কোন লাভ নেই। সে যদি তা করে তা হলে মূলতঃ নিয়ত বস্তু থেকে নিয়ামকের ভূমিকায় রূপান্তরিত হবে। অর্জুনের অধম প্রকৃতিই সকল ভ্রান্তির কারণ এবং তাঁর সত্তার মহত্তর সত্তা থেকে পতনের মূল। এখন অর্জুন সত্য দেখতে পেয়েছেন এবং তিনি স্বার্থপ্রণোদিত লক্ষ্য বর্জন করে সচেতন দিব্য যন্ত্ররূপে কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন। শিষ্যকে তার স্বার্থপর ভীতি সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তার অন্তরালোক দ্বারা চালিত হতে হবে। এতে সে সকল বাধা ও বিপদ অতিক্রম করে যাবে।

ঈশ্বর শর্তগুলি ঘোষণা করছেন, স্বীকার করা-না-করা আমাদের উপর নির্ভর করে। স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের শক্তির অপচয় করা উচিত নয়। আমাদের অধিকাংশই প্রাকৃতিক মানুষ, ব্যগ্র, আবেগচালিত, নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতলব সম্বন্ধে নিশ্চিত, কিন্তু আমাদের বদলাতে হবে। ঈশ্বরের নির্বাচনের কাছে আত্মসমর্পণ করেই আমরা সব থেকে বেশী কাজের যোগ্য হই। এই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের ভাব সেই ফ্রান্সিস দ্য সেলের প্রিয় প্রার্থনায় সংক্ষিপ্ত হয়েছে: "হাঁ পিতঃ, হাঁ, সর্বদা হাঁ।"

৬০। স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥

(৬০) হে কুন্তীনন্দন (অর্জুন), মোহবশতঃ যা করতে তুমি অনিচ্ছুক, তা তোমার স্বভাবজ কর্ম দ্বারা নিবদ্ধ, তুমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করতে বাধ্য হবে। তোমার প্রকৃতির বাধ্যতামূলক শক্তি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে।

৬১। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

(৬১) হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আছেন এবং তাঁর শক্তি দ্বারা তাদের চালিত করছেন, যেন তারা কোন যন্ত্রে নিয়োজিত রয়েছে।

আমাদের অন্তর্যামীই আমাদের অজ্ঞাত প্রকৃতি ও তার বাধ্যতামূলক নিয়তির সম্পর্ক নিয়মিত করছেন এবং আমাদের বিকাশকে চালাচ্ছেন ও সংযত করছেন। আমরা যাকে "নিয়তি", "অদৃষ্ট" বা "দৈব"[১] বলতে অভ্যস্ত, হার্ডির লেখায় যাকে অন্ধ, অদরদী ও অবিবেচক বলে চিত্রিত করা হয়েছে, ঘটনাবলীর নিয়ামক শক্তি কিন্তু তা নন। ব্রহ্মাণ্ডের উপর যে ভাব বিরাজ করছেন, যে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের নক্শাকে উন্মেষিত করছেন, তিনি সকলের অন্তরে বাস করছেন এবং তাদের কাউকেই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে দেবেন না। "তোমা ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। সত্য স্বরূপে তুমি অন্তরে বাহিরে নিত্য বিরাজ করছ"।[২]

সর্বেশ্বর আমাদের অন্তরতম সত্তা। সকল জীবনই তাঁর জীবনছন্দের আলোড়ন এবং আমাদের শক্তি ও কর্ম তাঁর থেকেই উদ্ভূত। আমাদের অজ্ঞতা-বশতঃ যদিও এই গভীরতম সত্য বিস্মৃত হই, তা বলে সত্যের পরিবর্তন হয় না। আমরা যদি সচেতনভাবে তাঁর সত্য জীবনে গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের সব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে অহমিকা থেকে মুক্তি পাব। তা না করলেও সত্য যা তা সার্থক হবেই। একসময়ে না একসময়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের কাছে আমাদের হার মানতেই হবে কিন্তু ইতোমধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সর্বেশ্বর আমাদের স্বেচ্ছা সহযোগিতা চান, তাহলেই বিনাকষ্টে ও অনায়াসে শিব ও সুন্দর উদ্ভূত হয়। আমরা যখন দিব্যালোকের পক্ষে স্বচ্ছ হই, তখন তিনি আমাদের তাঁর কাজে লাগান।

১। ঝিমোতে ঝিমোতে যে বুনছে তার আঙ্গুলগুলি অমনোযোগী কুশলতায় ঠিকভাবে চলে, তেমনিভাবে অমনোযোগে সংকল্প আমাদের নিয়ে বুনে যাচ্ছে, জীবন যবে থেকে শুরু হয়েছে এবং চিরকাল সে বুনে যাবে।

২। ত্বাং বিহায় ন শক্নোমি জীবিতুং ক্ষণমেবহি
অন্তর্বহিশ্চ নিত্যং ত্বং সত্যরূপেন বর্তসে।

৬২। তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

(৬২) হে ভারত (অর্জুন), তুমি সর্বভাবে তাঁর শরণ নাও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত নিবাস লাভ করবে।

সর্বভাবেন—তোমার সর্বসত্তা দিয়ে। আমাদের সত্তার সমস্ত স্তরে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া চাই। আধ্যাত্মিক থেকে আধিভৌতিক সত্তার সমস্ত স্তরে সামগ্রিক প্রেমের প্রতীক হল কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম।

অর্জুনকে ঈশ্বরের সঙ্গে সহকারিতা করতে ও তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে আহ্বান করা হচ্ছে। তাঁর সত্তার সার্বিক দিক পবিবর্তন করার সময় এসেছে। তাঁকে সর্বেশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। তাতেই তাঁর মোহ দূর হবে, কার্যকারণের বন্ধন ছিন্ন হবে এবং তিনি অকলঙ্ক জ্যোতি, অনবদ্য সামঞ্জস্য ও পরমানন্দ লাভ কববেন।

৬৩। ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥

(৬৩) এখন গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা তোমার কাছে আমি বিবৃত করেছি। এখন তা পূর্ণভাবে বিবেচনা করে, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কর।

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ—পূর্ণভাবে বিবেচনা কর। আমাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে বিনিশ্চয় করতে হবে।[১]

যথা ইচ্ছসি তথা কুরু—ইচ্ছামত কাজ কর। আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরকে উদাসীন মনে হয়, কেননা মীমাংসার ভার অর্জুনের উপর দিচ্ছেন। এই আপাত ঔদাসীন্যের কারণ এই যে আমরা প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় তাঁর আশ্রয় নিই, এর জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। তিনি কারুকে বাধ্য করতে চান না, কেননা মুক্ত স্বতঃস্ফূর্তির মূল্য আছে। মানুষের সহযোগিতা বাধ্যতামূলক না করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। তাকে চালিত না করে আকৃষ্ট করতে হবে,

---

১। তস্মাৎ কৌন্তেয় বিদুষা ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়ে
বুদ্ধিমাস্থায় লোকেস্মিন্ বর্তিতব্যং কৃতাত্মনা।
মহাভারত, দ্বাদশ, ১৪১, ১০২।

জোর না করে সম্মত করতে হবে। পরমেশ্বর তাঁর আজ্ঞাপালনে জোর করেন না। তাঁর ডাক যে মুহূর্তেই আসুক না কেন, তাতে আমরা সাড়া দিতেও পারি নাও দিতে পারি। সাধককে স্বেচ্ছায় সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ করতে হবে। আমাদের হয়ে ঈশ্বর উপরে উঠবেন না, যদিও ওঠবার চেষ্টায় যদি হোঁচট খাই তিনি সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত, যদি বিফল হই তিনি সান্ত্বনা দিতে প্রস্তুত। যতদিন না আমরা তাঁর দিকে ফিরব ততদিন তিনি ধৈর্য ধরে থাকবেন।

মানুষের কর্মস্বাধীনতা আছে কিনা, অথবা তার সমস্তই পূর্ব-নির্ধারিত—এই নিয়ে ইউরোপে ও ভারতে অনেক তর্ক হয়েছে। টমাস আকুইনাস বলেন যে মানুষের ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য ও প্রয়াস তার মোক্ষলাভের প্রধান উপকরণ, যদিও তার সংকল্পকে ঈশ্বরের প্রসাদ দিয়ে বলবৎ করার প্রয়োজন হতে পারে। "অতএব পূর্ব নিয়মিতকে সুকৃতির প্রয়াস ও প্রার্থনা করতে হবে, কেননা এর মধ্য দিয়েই পূর্বনির্ধারণ নিশ্চিত সফল হয় এবং সেইজন্যই জীবেরা পূর্ব নির্দেশকে সফল করতে পারে কিন্তু তাতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না।"[১] ঈশ্বরের প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা মানুষের আছে। বোনাভেনটিউরা মনে করেন যে সকল মানুষকেই ঈশ্বর প্রসাদ দিতে চান, কিন্তু যারা তা পাবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তারাই তা পায়। ডানস্ স্কোটাস বলেছেন যে, ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য যখন ঈশ্বরেরই আজ্ঞা, তখন মানুষের মীমাংসার উপর তার কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। তাঁর প্রসাদের সঙ্গে সে সহযোগিতা করতেও পারে, নাও পারে।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আচার্যেরা দৈহিক বলপ্রয়োগ, অলৌকিক ঘটনা সংঘটন বা যাদুমন্ত্র দিয়ে আমাদের প্রভাবান্বিত করেন না। 'সত্যকারের গুরু মিথ্যা দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। শিষ্য যদি বিপথগামী হয়, তাহলে তিনি তাকে সদুপদেশই দেন, তাকে ফেরাবার জন্য জোর করেন না, যদি তাতে নির্বাচনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। ভ্রান্তিও বিবর্ধনের অন্যতম অবস্থা। পিতা যেমন শিশুর প্রথম চলার উদ্যমকে উৎসাহ দেন, গুরুও শিষ্যের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেন। যদি তার পদস্খলন হয়, তিনি

১। Summa Theologica। Fathers of the English Dominican Province কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২০) প্রথম খণ্ড, প্রশ্ন ২৩, ৮।

হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন, কিন্তু পথ নির্বাচনের ও পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা শিষ্যের পক্ষে অব্যাহত রাখেন।

কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি মাত্র, তাঁর নির্দেশে রথচালনা করবেন। তিনি নিরস্ত্র। তিনি যদি অর্জুনকে প্রভাবান্বিত করেন, সে শুধু তাঁর সর্বজয়ী অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে। অর্জুনকে নিজে চিন্তা করতে হবে, সন্মার্গ নিজেকে খুঁজে বার করতে হবে। অভ্যাস বা শাস্ত্রবাক্য থেকে আরব্ধ সরল ও অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়ে কাজ করা তাঁর উচিত নয়। অস্পষ্ট ও অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তসমূহকে ভাবাবেগে ও অমোঘভাবে গ্রহণ করা থেকেই উন্মত্ত গোঁড়ামির উৎপত্তি হয়েছে এবং তা মানুষের অকথ্য কষ্টের কারণ হয়েছে। এইজন্য মনকে তার বিশ্বাসের জন্য সুযৌক্তিক ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ সমর্থন পাবার চেষ্টা করতে হবে। তাঁর ধারণা যে তাঁর নিজস্ব, অর্জুনের এইরকম একটি বাস্তব ও সামগ্রিক অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। তাঁর প্রত্যয় গুরু তাঁর উপর চাপাচ্ছেন, এরকম চিন্তা যেন মনে স্থান না পায়। উপদেশ দেওয়া মানে গোঁড়া মতবাদে দীক্ষা দেওয়া নয়।

চরম আবাহন।

৬৪। সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

(৬৪) আবার তুমি আমার সকলের থেকে গুহ্যতম পরম বচন শোন। তুমি আমার অতি প্রিয়, কাজেই যা তোমার মঙ্গলদায়ক, তাই তোমাকে বলব।

৬৫। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

(৬৫) তোমার মন আমাতে স্থির কর, আমার ভক্ত হও, আমায় যজনা কর, আমাকেই প্রণাম কর, তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে এইভাবে তুমি আমার কাছেই আসবে।

গীতার উপদেষ্টা যে চরম রহস্য, পরম শিক্ষা দিয়ে নবম অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে উপসংহার করেছিলেন, তারই আবার পুনরাবৃত্তি করছেন।

ধ্যান, পূজা, যজ্ঞ এবং ভক্তি সবই ঈশ্বরের দিকে নিয়োজিত হওয়া চাই। আমাদের নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সরল, অবিচ্ছিন্ন ও সপ্রত্যয় সমর্পণ করতে

হবে, তাঁর কাছে নিজেদের উন্মোচিত করতে হবে। এই কথাই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-সঙ্গীতে বলা হয়েছে।

হে প্রিয়, আমি তোমার কাছে নিজেকে দিই
আমি চির তোমারই, শুধু তোমারই থাকতে চাই।

ঈশ্বর তাঁর প্রকৃতি, তাঁর প্রসাদ, তাঁর প্রীতি ও আমাদের তাঁর কাছে ফিরে পাবার ব্যগ্রতা ব্যক্ত করছেন। তিনি অপেক্ষা করে আছেন, আমরা যদি শুধু তাঁর কাছে আমাদের অন্তর উন্মুক্ত করি, তাহলেই তিনি আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আমাদের অধিকার করার জন্য প্রস্তুত। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অর্থ যতখানি তাঁর কাছে আমাদের যাওয়া ততটাই তাঁর আমাদের কাছে আসা। শুধু আমাদের ঈশ্বরত্বে উন্নয়ন নয়, ঈশ্বরেরও মানুষের মধ্যে নেমে আসা। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে কি বলছেন শুনুন—

তোরা শুনিস নি কি, শুনিস নি কি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।[১]

ঈশ্বরের প্রেম আমাদের আত্মার দোরে ধাক্কা দিচ্ছে, আমরা যদি তাঁর অবিরাম আগমনের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করি, তাহলেই তিনি আমাদের আত্মায় প্রবিষ্ট হবেন, আমাদের প্রকৃতিকে বিশুদ্ধ করবেন, উদ্ধার করবেন এবং আমাদের ভাস্বর দীপ্তিতে উজ্জ্বল করবেন। ঈশ্বর সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত, শুধু আমাদের সপ্রত্যয় আবাহনের অপেক্ষায় আছেন।

৬৬। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সবপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(৬৬) সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমারই আশ্রয়ে এস। শোক কোরো না, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্তি দেব।

তাঁর চাপের কাছে আমাদের স্বেচ্ছায় নত হওয়া উচিত, তাঁর সংকল্পের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা উচিত এবং তাঁর প্রেমে আশ্রয় নেওয়া উচিত। আমরা যদি আমাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র আত্মের উপর বিশ্বাস নষ্ট করে তার

১। গীতাঞ্জলি '৫২

জায়গায় ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ প্রত্যয়কে অধিষ্ঠিত করি তবে তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন। ঈশ্বর আমাদের কাছে সামগ্রিক আত্মনিবেদন চান, তার বদলে তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি দেবেন যার দ্বারা সকল পরিস্থিতিই বদলে যাবে।

অর্জুন বিবিধ আনুষ্ঠানিক ও নৈতিক কর্তব্যের আহ্বানে দিশাহারা হয়েছিলেন, তাঁর ভয় হয়েছিল যে যুদ্ধে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হবে, পিতৃপুরুষের প্রতি অবহেলা হবে এবং আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির বিঘ্ন ঘটবে ইত্যাদি। কৃষ্ণ তাঁকে বলছেন যে, ওসব বিধি ও আচারের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে তাঁর ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করতে। তিনি যদি তাঁর জীবন, কর্ম, অনুভূতি ও চিন্তাকে উৎসর্গ করে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করেন, তাহলে তিনিই তাঁকে জীবনযুদ্ধে পথ দেখাবেন এবং তাঁর কোন আশঙ্কার কারণ থাকবে না। আত্মকে অতিক্রম করার সহজতম পন্থা আত্ম-সমর্পণ। "সে-ই শুধু ঐশী জ্যোতির ধ্যান করার যোগ্য যে কিছুরই দাস নয়, এমন কি তার নিজের সদ্‌গুণেরও নয়।" Ruysbroeck।

আমরা যদি আমাদের নিয়তিকে পূর্ণ করতে চাই তো আমাদের সর্বেশ্বরের কাছে নগ্ন ও অকপট ভাবে দাঁড়াতে হবে। কখনও কখনও আমরা বৃথাই আমাদের আবরণ করার চেষ্টা করি এবং ঈশ্বরের কাছে সত্য গোপন করার চেষ্টা করি। ঐভাবেই গোপিনীরা তাদের নির্দিষ্ট পরিণতি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

আমরা যতটা ঈশ্বরের সন্ধান করি; তার থেকে বেশী তাঁর স্পর্শ চাই। আমরা যখন তাঁর দিকে ফিরে, তাঁকে আমাদের সমস্ত সত্তা ভরে দিতে দিই, তখন আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তিনি আমাদের ব্যবস্থা করেন ও সকল সন্তাপ পার করে নিয়ে চলেন। পরমের কাছে অসঙ্কোচ আত্মনিবেদন করলে তিনি আমাদের তুলে নেন ও আমাদের সম্ভাব্য পরোৎকর্ষে উন্নীত করেন। যদিও ঈশ্বর জগৎকে নির্দিষ্ট বিধি দ্বারা চালিত করেন এবং আমাদের প্রকৃতি ও সামাজিক পদানুযায়ী সদাচারসম্পন্ন হওয়া আশা করেন, তবু যদি তাঁর আশ্রয় নিই, তাহলে আমরা সে-সমস্ত অতিক্রম করে যাই। মানুষের আত্মা যে জালে জড়িয়ে পড়েছে, তা থেকে তার নিজ চেষ্টায় উদ্ধার পেতে পারে না, তাই আপাতদৃষ্টিতে বাহিরের সহায়তা তার দরকার। আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে নীরবে অপেক্ষা করে থাকি এবং শুধু

তিনি আমাদের গ্রহণ করুন এই চাই, তখন সেই সহায়তা আসে। "যে আমার শিক্ষা সত্ত্বেও দোষগুণের অপেক্ষা করে না, সমস্ত কর্তব্য সরিয়ে রেখে আমারই সেবা করে, সেই মহত্তম।"[১]

রামানুজাচার্যের অনুগামীরা এই শ্লোককেই সারা বইয়ের চরম শ্লোক বলে মনে করেন।

ফলশ্রুতি

৬৭। ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।

(৬৭) যে তপস্বী নয় বা ভক্তিহীন, যে শুনতে চায় না বা যে আমায় নিন্দা করে, তার কাছে কদাচ এই সব কথা বলবে না।

যারা নিষ্ঠাবান, প্রেমী ও সেবাপরায়ণ, তারাই শুধু এই বাণী বোঝবার যোগ্য, অন্যেরা একথা শুনে তার অপব্যবহার করতে পারে।

৬৮। য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥

(৬৮) যে আমার প্রতি পরম ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমার ভক্তদের এই পরম গুহ্যতত্ত্ব শেখাবে সে নিঃসংশয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

যারা পূর্বে দীক্ষিত হয়েছে তাদের উচিত অদীক্ষিত ভ্রাতাগণকে দীক্ষা দেওয়া।[২]

৬৯। ন চ তস্মান্ মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥

(৬৯) কোন লোক তার চেয়ে আমার বেশী প্রিয়সেবা আর করতে

১। অজ্ঞাত্বৈবং গুণান্ দোষাণ ময়াদিষ্টান প স্বকান
ধর্মান সংত্যজ্য যঃ সর্বান ভজেৎ স হি সত্তমঃ॥

২। অসংস্কৃতস্তু সংস্কার্যাঃ ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব সংস্কৃতৈঃ॥

আবার দুর্জনঃ সজ্জনোঃ ভূয়াৎ সজ্জনঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ।
শান্তো মুচ্যেত বন্ধেভ্যো মুক্তশ্চান্যান বিমোচয়েৎ॥

দুর্জনেরা সজ্জন হোক, সজ্জনেরা শান্তি পাক, শান্তরা বন্ধনমুক্ত হোক, আর মুক্তেরা অন্যদের মুক্ত করুক।

২৩

পারে না, আর পৃথিবীতে তার চেয়ে প্রিয়তর আমার কাছে আর কেউ থাকবে না।

যে মহান্ ব্যক্তিরা সংসারসাগর পার হয়ে অন্যকে পার করতে সাহায্য করেন, তাঁরাই ঈশ্বরের প্রিয়তম।

৭০। অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥

(৭০) আমাদের এই পবিত্র কথাবার্তা যে পড়বে, আমার মতে তার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞ দিয়ে পূজিত হব।

৭১। শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥

(৭১) যে বিদ্বেষহীন হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে সেকথা শুনবে, সেও মুক্ত হয়ে পুণ্যকর্মীদের শুভলোকপ্রাপ্ত হবে।

৭২। কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥

(৭২) হে পার্থ, তুমি আমার কথাগুলি কি একাগ্রচিত্তে শুনেছ? হে ধনঞ্জয়, অজ্ঞতাবশতঃ তোমার (চিন্তায়) যে বিভ্রান্তি ঘটেছিল, তা কি দূর হয়েছে?

উপসংহার

অর্জুন উবাচ

৭৩। নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

অর্জুন বললেন

(৭৩) আমার মোহ দূর হয়েছে, তোমার প্রসাদে আমি প্রত্যভিজ্ঞা পেয়েছি। হে অচ্যুত (কৃষ্ণ), আমি সংশয়হীন হয়ে স্থিতধী হয়েছি। তোমার কথামতই আমি কাজ করে যাব।

অর্জুন তাঁর নির্দিষ্ট কর্মে ফিরে যাচ্ছেন, অহমিকায় ভাবে নয়, আত্মজ্ঞান

লাভ করে।[১] তাঁর মোহ বিনষ্ট হয়েছে, সন্দেহ ঘুচে গেছে। ঈশ্বর-নির্বাচিত যন্ত্র জগদীশ্বর-নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের কাজ শুরু করছেন। তিনি এখন ঈশ্বরের আদেশ মান্য করবেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ঈশ্বর আমাদের তাঁর উদ্দেশ্যেসিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করেছেন, আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নয়। সৎপথে চলার স্বাধীনতা নৈতিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে। আমরা সততার দ্বারাই শুধু ভাবমুক্তিতে উন্নত হই এবং তার দ্বারাই আমাদের দেহ স্থূল প্রবণতা থেকে ছাড়া পায়। প্রথমে অর্জুন প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পরে মোক্ষদায়ী জয়লাভ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করছেন যে, তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে পারবেন, কেননা ঈশ্বরই তাঁকে শক্তি যোগাবেন। নিম্নোক্ত শ্লোকের ভাবানুযায়ী আমাদের চলা কর্তব্য: "হে হৃষীকেশ, আমার হৃদয়ে বসে আমাকে যেমন ভাবে চালাবে, আমি তেমনি ভাবে চলব।"[২] যীশু বলেছেন, "আমি আমার নিজ সংকল্পের খোঁজ করি না, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর সংকল্পই চাই।" ঈশ্বর তাঁর নিত্যজীবনে আমাদের যে ভূমিকা দিতে চান, আমাদের তাই গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরের সংকল্পানুযায়ী নিজের সংকল্পকে গঠন করাই দিব্য জীবনের গুহ্য তত্ত্ব। যীশু যখন বলে উঠেছিলেন "এই বাটিটি আমার কাছ থেকে চলে যাক", তখনও তিনি তাঁর নিজ পছন্দের কথা ভাবছিলেন এবং নিজস্ব তৃপ্তি খুঁজছিলেন। তখন তাঁর তিক্ত হীনতা ও মৃত্যু থেকে নিস্তার পাবার ইচ্ছা, কিন্তু যখনই তিনি উচ্চারণ করলেন "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" "করিষ্যে বচনং তব", তখনই তিনি তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা বর্জন করলেন এবং যে পিতা তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাজের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিলেন।[৩] এই পরিবর্তনের অর্থ, সকল প্রকার ছলছুতার অবসান, সকলপ্রকার আবরণ উন্মোচন, একপ্রকার বস্ত্রাপহরণ, আত্মার আত্মবিলুপ্তি।

সঞ্জয় উবাচ

৭৪ ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥

১। অজ্ঞান সংমোহনাশ আত্মস্মৃতি লাভঃ। ইতি শঙ্করাচার্য।

২। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

৩। মার্ক, চতুর্দশ, ৩২-৪১। "পিতা আমার যা আজ্ঞা করেছেন, আমি তাই করছি" জন, চতুর্দশ, ৩১।

সঞ্জয় বললেন

(৭৪) এইভাবে আমি বাসুদেব (কৃষ্ণ) ও মহাত্মা পার্থের (অর্জুনের) মধ্যে লোমহর্ষণ অত্যদ্ভুত আলাপ শুনেছি।

৭৫। ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥

(৭৫) ব্যাসের প্রসাদে আমি স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্য যোগোপদেশ শুনতে পেয়েছি।

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধক্ষেত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যাতে দিতে পারেন সেই জন্য ব্যাস সঞ্জয়কে দূর থেকে সকল জিনিস দেখবার ও শোনবার ক্ষমতা বর দেন।

৭৬। রাজন্ সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥

(৭৬) হে রাজন, কেশব (কৃষ্ণ) ও অর্জুনের এই পবিত্র ও বিস্ময়কর কথাবার্তা যতবার স্মরণ করছি ততবার মুহুর্মুহু হৃষ্ট হচ্ছি।

৭৭। তচ্চ সংস্মৃত্য-সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥

(৭৭) যতবার আমি হরি (কৃষ্ণ)-র সেই অত্যদ্ভুত রূপ স্মরণ করছি, ততবারই, হে রাজন্, আমার খুব আশ্চর্য লাগছে এবং আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হচ্ছি।

সংস্মৃত্য-সংস্মৃত্য—যতবার স্মরণে আসছে। কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ ও ঈশ্বরের সত্যতা দার্শনিক প্রতিজ্ঞা নয়, আধ্যাত্মিক তথ্য। আমরা শুধু শুনে শুনে তার অর্থ ধরতে পারব না, তার জন্য প্রার্থনা ও ধ্যানসহযোগে বোঝবার চেষ্টা দরকার।

৭৮। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম॥

(৭৮) যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্ধর পার্থ (অর্জুন) আছেন, আমার মনে হয়, সেখানে শ্রী, জয়, কল্যাণ ও অবিচলিত নীতির অবস্থান নিশ্চিত।

গীতার উপদেশ যোগ এবং উপদেষ্টা যোগেশ্বর। মানবাত্মা প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে যখন দিব্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সৌভাগ্য বিজয় মঙ্গল ও নীতিনিষ্ঠা

নিশ্চিত। আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি, (যোগ) ও উদ্যম (ধনুঃ)-কে মিলিত করতে আহ্বান করা হচ্ছে। প্রথমোক্তকে মত্ততায় ও দ্বিতীয়োক্তকে বর্বরতায় যেন পর্যবসিত না করি। ব্যারণ ফন হুগেল যা বলতে ভালবাসতেন: "ধর্মের মহান মর্মকথা" দিব্যজীবনের দারুণ তথ্য হল যোগ, উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরোপলব্ধি এবং তাঁর সংকল্পের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ধনুঃ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যকে সম্পাদন করার মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তত্ত্বজ্ঞান ও সামাজিক সেবা যুগপৎ প্রয়োজন। মানবজীবনের দ্বৈত লক্ষ্য, ব্যক্তিগত সিদ্ধি ও সামাজিক শ্রেয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।[১] প্লেটো যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে জগতে সুশাসন হতে পারে না যতদিন না দার্শনিকরা রাজা হবেন, তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন যে মানবিক সিদ্ধি মহান্ চিন্তা ও ন্যায্য কর্মের মিলন থেকেই আসতে পারে। গীতার মতেও চিরকাল মানুষের এই লক্ষ্যই থাকা উচিত।

ইতি ··মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদঃ সমাপ্তাঃ।

সন্ন্যাস দ্বারা মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের
এইখানেই শেষ।

ভগবদ্গীতা উপনিষদের এইখানেই সমাপ্তি।

১। "আমার সেই পুণ্যভূমির কথা জানতে ইচ্ছা করে যেখানে পৌরোহিত্য ও রাজত্ব একমত হয়ে বিরাজ করে।" বাজসনেয়ী সংহিতা, বিংশ, ৫।